প্রাচীন
ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত

•

"…to construct a history of thought without profound study of the mathematical ideas of successive epochs is like omitting Hamlet from the play which is named after him."

—A. N. Whitehead

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত

(প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

নন্দলাল মাইতি

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৮৩

Prachin Bharatiya Ganiter Itibṛtta

—Nandalal Maiti

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮৩

মূল্য : ৩০·০০

মুদ্রাকর :
নায়ক প্রিন্টার্স
৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধণি স্থিতম্ ॥

—বেদাঙ্গ জ্যোতিষ

॥ ভূমিকা ॥

গণিতের ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের নামান্তর। সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে গণিতের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে-কারণে গণিতের ইতিহাসকে সভ্যতার দর্পণ বলা খুবই যুক্তিযুক্ত। বস্তুত, সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি-অবনতি, এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সামগ্রিক রূপ নিয়ে গণিতের ইতিহাসের মধ্যে এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য শাখার ইতিহাসে তেমনটি হয় কিনা সন্দেহ। কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সঙ্গীত-শিল্প-কলা সবের উন্নতি ও উৎকর্ষের মূলে গণিত,—গাণিতিক-চিন্তন ব্যতিরেকে কোন কিছুর উন্নতি সম্ভব নয়। কথাটি একটু হেঁয়ালির মতো শোনালেও এটি সত্য। যাঁরা আধুনিক গণিত ও তার প্রয়োগ ইত্যাদির সঙ্গে সামান্য পরিচিত, তাঁরা সহজেই কথাটি অনুধাবন করতে পারবেন। তা' ছাড়া প্রাচীন মনস্বীরা যে গণিতের এই সারবত্তা উপলব্ধি করেননি তা নয়। দার্শনিক প্লেটো তাঁর আকাদামীর তোরণ-দ্বারে উৎকীর্ণ করেছিলেন,—**"Let no man ignorant of geometry enter here."** আর দ্য ভিঞ্চি তো বলেছিলেন, গণিতে যাঁদের জ্ঞান নাই, তাঁরা যেন তাঁর শিল্পসৃষ্টি বিচার না করেন।

সবার জানা, অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। সেই ধারা নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এখনো অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে,—যদিও একটু ভিন্ন চেহারায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার স্বাক্ষর রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় ; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় পেতে হলে, তার একটি সামগ্রিক রূপের ধারণা পেতে হলে নানা ধর্মের যে বিশাল শাস্ত্ররাজি রয়েছে, ইতিহাস-পুরাণ-কাব্য-দর্শন রয়েছে, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি রয়েছে, তা সবই অধ্যয়ন করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে এই বিশাল সমুদ্র মন্থন এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। তা ছাড়া সবার সব বিষয়ে অধিকারও নাই, রুচি-প্রবণতাও নাই। তা হলে কিভাবে এই সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়? এ বিষয়ে গণিতের ইতিহাস আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। এই একটিমাত্র বিজ্ঞানের শাখার জানলা দিয়ে সব দেখা যায়,—এমনি এর আণুবীক্ষণিক চোখ।

গণিতের ইতিহাসের চোখে সব ধরা পড়ে, তা যত ছোট হোক আর বড়ই হোক, যত কাছের হোক, আর যত দূরেরই হোক।

গণিতের ইতিহাস লেখার নানা রকম পদ্ধতি থাকতে পারে: গণিতাশ্রয়ী, ইতিহাসাশ্রয়ী বা এ দুয়ের সংমিশ্রণ; আবার গণিতজ্ঞদের জীবনী ও তাঁদের সামগ্রিক ও বিশেষ বিশেষ অবদান নিয়েও ক্রমপরম্পরায় গণিতের ইতিহাস রচিত হতে পারে। অথবা সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে গণিতের উপাদানগুলি স্থাপন করে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক ইতিহাসও হতে পারে। বস্তুত গণিতের ইতিহাস রচনা করা যেমন জটিল তেমনি দুরূহ। গণিত ঐতিহাসিকের যেমন ইতিহাসে জ্ঞান থাকা দরকার,—ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যঞ্জনা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকা দরকার, তেমনি গণিতেও জ্ঞান থাকা দরকার। আর কেবল এতেই হবে না, সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করাও প্রয়োজন। সর্বোপরি সবার সমন্বয়ে গঠিত সামগ্রিক স্বচ্ছ ধারণা অপরিহার্য।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নানা পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব ও তথ্য আছে,— এ-নিয়ে পণ্ডিত মহলে তর্কের শেষ নাই। সেইসব বিতর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্য থেকে একটি সন্তোষজনক সমাধান ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে কত কঠিন, তা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝবেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই তর্কের মাঝে পড়ে সব সময় যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছি, তা জোর করে বলতে পারি না। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্বাচার্যদের মত ও পথই অবলম্বন করেছি, আর কখনো কখনো বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠে যে ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি, তার যথেষ্ট কোন প্রামাণিকতা না থাকলেও, না বলে পারিনি।

ইতিহাসের সুবিশাল পটভূমিতে তত্ত্ব ও তথ্যের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এই গ্রন্থের বৃত্তের বাইরে। সে-বিষয়ে লেখকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলে ভান করার দরকারও নাই। এই গ্রন্থে মূলত প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্মেষক্ষণ থেকে গণিতের উত্থান-পতনের সহজ ইতিবৃত্ত দেবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সে-কারণে আমাদের গাণিতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের বিশেষ বিশেষ দিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে,—বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে সংশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি মাত্র।

অনিবার্য কারণে মাঝে মাঝে আলোচনার সূত্র আনতে গিয়ে একই বিষয়ের

অবতারণা করতে হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গণিত সম্পর্কে যাঁরা সামান্য অবগত আছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন এ ছাড়া উপায় ছিল না। কোন কোন গাণিতিক তত্ত্ব একটি যুগে সম্পূর্ণতা লাভ করে না। একই ধারণা, একই তত্ত্ব বিভিন্ন যুগের গণিতাচার্যরা আলোচনা করেছেন। আর তাঁদের কথা বলতে গিয়ে পুনরুক্তি অপরিহার্য ও অনিবার্য হয়ে উঠে।

প্রাচীন ভারতে গণিত পৃথক বিষয় হিসাবে আলোচিত হতো না,—জ্যোতি-বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রয়োজনের তাগিদে আলোচিত হতো। তাই এই গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করতে হয়েছে। কিন্তু গণিত প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচিত হয়নি। কেবলমাত্র সোয়াই জয় সিং সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে।

বলা বাহুল্য, গ্রন্থটি পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ, বাংলা ভাষার মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আমাদের প্রাচীন গণিতের একটি রূপরেখা পান, সেই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি পরিকল্পিত। তাই,—এই গ্রন্থে এমন কোন গাণিতিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি য স্কুল গণিত-জ্ঞানের বাইরে, কেবলমাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে উচ্চ গণিতের উপাদানের উল্লেখ আছে। এতে গণিতাচার্যদের সূত্র নিয়মাদির মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাতে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ কারুর পক্ষে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হবে না। কারণ,—সর্বত্র বঙ্গানুবাদ, ভাবানুবাদ বা মর্মার্থ দেওয়া হয়েছে; এমন কি প্রায় সর্বত্র উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

লক্ষণীয়, এই গ্রন্থে পাদটীকা নাই বললেই চলে। গ্রন্থপঞ্জীও যে বিস্তারিত তা বলার স্পর্ধা রাখি না। যথাস্থানে উল্লিখিত হলেও এখানে কয়েকটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই যে গ্রন্থের নাম করতে হয়, তা হলো **Dr. B. B. Datta** ও **Dr. A. N. Singh**-এর **History of Hindu Mathematics ; Dr. B. B. Datta**-এর **Science of Sulba ; Dr. T. A. Saraswati Amma**-র **Geometry in Ancient and Medieval India ; Dr. C. N. Srinivasienger**-এর **History of Ancient Indian Mathematics ; A Concise History of Science in India**-এর অন্তর্গত **S. N. Sen** রচিত গণিতের ইতিহাস। প্রাচীন লিপি ও চিত্রগুলির অধিকাংশই উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ

থেকে গৃহীত। পাণ্ডুলিপির সামান্য পরিমার্জনাকালে ও প্রুফ দেখার সময় ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদারের 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' বইটির সাহায্য নিয়েছি। এবং গ্রন্থ মধ্যে প্রা. ভা. গ. চ. নামে উল্লেখ করেছি।

প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থে নতুন কোন তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবেশনা নাই, আর নতুন কোন তত্ত্বের উপস্থাপনাও নাই। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব অভিমত আছে। তা হলেও বলা যায়, এতে অতি পরিচিত তথ্যের সঙ্কলন আছে মাত্র। এ-বিষয়ে পূর্বাচার্যদের ও পূর্বসূরীদের প্রতি আমার ঋণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

আর একটি কথা : প্রাচীন ভারতীয় গণিতের কিছু কিছু মূলগ্রন্থ, অনুবাদ ও ইতিহাস পাঠে যে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব ও উপলব্ধি করেছি, এবং সাধারণ পাঠক ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তার যতটুকু উপযোগিতা আছে বলে মনে হয়েছে, তার সামান্য অংশ পরিবেশন করার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় গণিতের নানা তত্ত্ব ও তথ্য জটিল ও দুর্বোধ্য। তাই এই গ্রন্থে কোন ত্রুটি নাই, একথা বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নাই। যদি অনুরাগী পাঠক ও সুধীজন ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করে গ্রন্থটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে গঠনমূলক প্রস্তাব দেন, তা হলে অনুগৃহীত হবো।

গ্রন্থে কোথাও কোথাও একাধিক বানান আছে এবং ভুলও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে,—কিছু মুদ্রণ-ভুল, আর কিছু লেখকের অনবধানতার জন্য ভুল। লেখকের পক্ষে সব প্রুফ দেখা সম্ভব হয়নি, আবার লেখক প্রুফ দেখায় খুবই অদক্ষ। ভুল যে-কারুরই হোক, লেখক অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর ত্রুটি স্বীকার করেছেন। পরিশেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হলো। জানি, পাঠক-পাঠিকাদের পড়তে অসুবিধা হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনাপ্রার্থী।

এখানে দু-জন সরকারী কর্মচারীর নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁরা হচ্ছেন শ্রীঅনিলচন্দ্র দাস ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ অধিকারী। আমি এই গ্রন্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পাণ্ডুলিপিসমেত একটি ব্যাগ কলকাতা থেকে বাঁকুড়াগামী এক্সপ্রেস বাসে ফেলে আসি। কিন্তু ড্রাইভার শ্রীদাস ও কণ্ডাক্টর শ্রীঅধিকারী পরদিন সকালে আমার টাকাপয়সা, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য দরকারী কাগজপত্র সমেত ব্যাগটি ফেরৎ দেন। তাঁদের মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা আমায় আরো প্রেরণা দিয়েছে।

যাঁরা আমার গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন তাঁরা: সুব্রত কর, ডা: কালাচাঁদ রায়, ডাঃ গোপালচন্দ্র মাইতি, অনীতা কর, প্রণতি রায়, অশোক কুমার খামরুই, কিশোরী মোহন মান্না, ডঃ অসীম বর্ধন ও রবীন বল। এঁদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদার ডঃ অমূল্যকুমার বাগের মূল একটি প্রবন্ধ সরবরাহ করায় ও বইটিতে বিশেষ ঔৎসুক্য ও আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফার্মা কেএলএম-এর কর্ণধার কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশে সবিশেষ যত্ন ও আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, এবং অনুজপ্রতিম লেখককে সর্বদা সুপরামর্শ দিতেন। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে গভীর বেদনা অনুভব করছি এবং তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। স্বর্গত মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কেএলএম-এর প্রকাশন বিভাগের শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ ও সুখেন্দুবিকাশ পাল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই; তাঁরা নানাভাবে আমায় প্রভূত সাহায্য করেছেন।

ন. ম.

"The best of prophets of the future is past."

—Byron

সূচীপত্র

॥ অবতরণিকা ॥

"For out of olde feldes, as men seith, cometh al this newe corn fro yeer to yeer ; And out of olde bokes, in good feith, cometh al this newe science that men lere."

—Chaucer

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন প্রাচীন ভারতীয় ঋষি ও মনীষীরা নিত্য-নতুন আবিষ্কারে সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এমন অনির্বচনীয় মৌলিকতা বোধ হয় আর কোন দেশের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন সভ্য দেশ সমূহে,—মিশর, ব্যাবিলন, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি সূক্ষ্ম ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় এই স্বাভাবিক ধারাটি যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এই অস্বাভাবিকত্বের প্রধান কারণ বোধ হয় এই দেশের মাটিতে অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মুনি, ঋষি ও মনীষীদের আবির্ভাব। তাই তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি-স্বরূপ আজও আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ বেদ-কে শ্রীভগবানের রচনা বলে মনে করি। নিঃসন্দেহে অলৌকিক প্রতিভা ভগবানের ঐশ্বর্য-স্বরূপ।

শিক্ষিত মহলে দ্বিমত নাই, ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রাচীন ইতিহাস আমাদের বিস্মিত করে,—বিমূঢ় করে। আমরা হতবাক হয়ে সেই সব ভগবৎ ঐশ্বর্যের অধিকারী মুনি-ঋষিদের গবেষণা ও আবিষ্কারের অবলুপ্ত ধারাটি অনুসরণ করতে না পেরে অনেক সময় অর্থহীন মন্তব্য করি। আজও দেশে প্রতিভার অভাব নাই, আজও গবেষণা ও আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব যে ঐতিহাসিক ধারাটি অবলুপ্ত, তার পুনরুজ্জীবনে আমরা সচেষ্ট নই। ফলে, আমাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্বের যথার্থ মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি।

সর্বজন স্বীকৃত, কেবলমাত্র অনুকরণের দ্বারা কোন জাতি বড় হয় না,—চাই স্বীকরণ। স্বীকরণ অনায়াসসাধ্য হয়ে ওঠে যখন তা নিজস্ব ধারাটি প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেবল অনুকরণের আয়োজন। তাই, সর্বস্তরে আমরা শিক্ষার ফল থেকে বঞ্চিত। আমরা সবাই "তোতা কাহিনীর"

তোতাপাখী। শেখানো বুলি, মুখস্থ বিদ্যে ছাড়া আর আমাদের কি আছে! আমাদের নিজস্ব বলে কিছু নাই,—জ্ঞান ও বিদ্যার সর্বক্ষেত্রে। অথচ আমরা এক বিশাল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই আলোকবর্তিকা থেকে আমরা নির্ভুল পথের নিশানা পেতে পারি, চলার পথের গতি ত্বরান্বিত করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই আমাদের অতীত গৌরবের প্রায় কিছুই জানি না। যেটুকু জানি তা হচ্ছে গুটি কয়েক নাম। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিতের কাছে তো প্রাচীন ভারতের সব কিছুই অচল, মৃত। শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের কথা ভাবি, কিন্তু জাতির স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবি না,—আমাদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবি না।

বিশ্বগণিতের ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচার করলে প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাস এক পরম বিস্ময়। এই ইতিহাসে সন-তারিখ নাই, নাই কোন ব্যক্তি-পরিচয়, আর নাই গণিতের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির অন্তরালের কাহিনী। হায়, কৌপীনধারী ভারতীয় মুনি ঋষিগণ! তোমরা পার্থিব খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে কেন উদাসীন ছিলে? সন-তারিখ দিয়ে লেখার প্রচলন ছিল না। 326-27 খ্রীঃ পূঃ পরবর্তী রচনায় কিছু কিছু সন-তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার পূর্বের রচনার সময় নির্ণয় দুঃসাধ্য।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের প্রকৃত মূল্যায়ন করে ইতিহাস রচনা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, প্রাচীন ভারতের গাণিতিক উপাদান এই দেশের বিভিন্ন ধর্মের বিশাল শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষার পথ অতিক্রম করে অধ্যয়ন করা যে কি কঠিন, তা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝবেন। সার্থক ও সফল গণিতের ইতিহাস রচনা একমাত্র তখনই সম্ভব যদি বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র ও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন।

॥ আকর গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

(বৈদিক সাহিত্য)

বিষয়বস্তু ও রচনাকালের ভিত্তিতে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদ। এই বিভাগ সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এমন কি বিভিন্ন বিভাগে একই তথ্যের

পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। 'সংহিতা' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হলেও কোন কোন 'ব্রাহ্মণ' কোন কোন সংহিতার পূর্ববর্তী। তেমনি কোন কোন আরণ্যক-উপনিষদ আবার কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

ঋগ্বেদ সংহিতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সংহিতার রচনাকাল নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক আছে। ম্যাক্সমুলার 1500 খ্রীঃ পূঃ এর রচনাকাল বলেছেন, আবার ভিনটারনিজ (Winternitz) 2000—2500 খ্রীঃ পূঃ এই সংহিতার রচনাকাল বলে মনে করেন। তিলক ও জ্যাকোবি ঋগ্বেদ সংহিতাকে আরো প্রাচীন বলে মনে করেন। বর্তমানে অনেকেই ভিনটারনিজের সময়কাল নির্ণয়েই বেশী আস্থা স্থাপন করেন। প্রমাণের অভাবে তা-ই আমাদের মেনে নিতে হবে।

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। পণ্ডিতরা বলেন ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডল বিভিন্ন সময়ে রচিত। এই গ্রন্থে পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানা বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বের তিনটি বিভাগ, সূর্য, চন্দ্র,—এদের গতি, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, দিন, মাস ও বৎসরের সময়ের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন যজ্ঞবেদী ও সংখ্যার উল্লেখ থেকে গণিতের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

সামবেদ

এই সংহিতার তেমন গাণিতিক বৈশিষ্ট্য নাই। তবে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

যজুর্বেদ

এই সংহিতার দুটি বিভাগ—কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদে গদ্যে তাত্ত্বিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদের বিষয়বস্তুর আলোচনায় একটি শৃঙ্খলার ভাব আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদ দক্ষিণ ভারতে, কাশ্মীর, গুজরাট ও পাঞ্জাবে অধিক প্রচলিত ছিল। শুক্ল যজুর্বেদ উত্তর ও পূর্বভারতে প্রচলিত ছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সংহিতার গুরুত্ব অনেকখানি। প্রাচীন ভারতে গণিত পৃথক বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়নি। গণিত ছিল জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অঙ্গ। ফলে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় গণিতের বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়: দশের গুণিতকে বড় বড় সংখ্যার নাম, যোগ,

বিয়োগ, গুণ, ভগ্নাংশ ও প্রগতির বিষয় ঋগ্বেদে উল্লিখিত হলেও এখানে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

অথর্ববেদ

জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনা এই সংহিতায় না থাকলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সংহিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্রাহ্মণ

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে ব্রাহ্মণ অংশ। এই অংশে পূজার্চনা, ও নানা বৈদিক অনুষ্ঠানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন সংহিতার ব্রাহ্মণ অংশের বিস্তৃত আলোচনা থেকে জ্যোতিষ ও গণিতের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। গণিতের ইতিহাসে বৈদিক সাহিত্যের এ অংশের অবদান অপরিসীম।

আরণ্যক-উপনিষদ

বৈদিক সাহিত্য বিভাগের এই অংশের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনা আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু জ্যোতিষ ও গণিত বিষয়ে এখানে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা নাই। যেটুকু আছে, তা পূর্ববর্তী সংহিতার অনুরূপ।

বেদাঙ্গ

বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অঙ্গ। বিভিন্ন বেদ অধ্যয়নের জন্য বেদাঙ্গের জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। বেদাঙ্গে আছে বিশেষ জ্ঞানের আলোচনা। বেদাঙ্গ ছ'প্রকার—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। বেদাঙ্গে গণিত, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্য ছড়িয়ে আছে।

সূত্র

কালক্রমে বিপুলায়তন বেদ ও বেদাঙ্গ পড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সূত্রাকারে সব কিছু লেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সূত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :
স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখং। অস্তোভম্ অনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ॥
অর্থাৎ "স্বল্পাক্ষর, সারবান, সর্বত্র প্রযোজ্য, অসন্দিগ্ধার্থ, সূত্রাকারে গ্রথিত সুন্দর গদ্য রচনাকে সূত্র বলা হয়।" সূত্রগুলির সূক্ষ্মতা ও সংক্ষিপ্ততা বিষয়ে ভিনটারনিজ বলেন, "There is probably nothing like these sūtras of the Indians in the entire literature of the world." সীমিত শব্দের

প্রয়োগে সূত্রগ্রন্থগুলি প্রায় দুর্বোধ্য। ভাষ্য ব্যতিরেকে এদের মর্মার্থ গ্রহণ অসম্ভব বললেই চলে। তাই, বিভিন্ন সূত্রের অনেক ভাষ্য রচিত হয়েছে। পতঞ্জলি, বাৎস্যায়ন, শঙ্কর প্রভৃতি স্বনামধন্য ভাষ্যকার।

পূজাপদ্ধতি ও নানা অনুষ্ঠানের বিধি-নিয়ম কল্পসূত্রে আলোচিত হয়েছে। শুল্বসূত্র কল্পসূত্রের অন্তর্গত। শুল্বসূত্র সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

ছন্দ

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে ছন্দের গুরুত্ব অনেকখানি। বিশেষ করে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পিঙ্গলের ছন্দসূত্র গ্রন্থটি। কারণ, এখানেই আমরা প্রথম শূন্যের (0) ব্যবহার দেখতে পাই। এমন কি ভারতীয় গাণিতিকদের সমবায় ও বিন্যাস ও দ্বিপদ উপপাদ্যের ধারণা এই গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈনদের অবদান কম নয়। সন-তারিখ সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা করা যায়, তা এই সব ধর্মীয় শাস্ত্রের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে।

ধর্মীয় দিক থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হয়ে পালি ভাষায় এক বিশাল ধর্মীয় গ্রন্থরাজি সৃষ্টি করেছিল। তখনকার আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠিন নাগপাশ থেকে মানুষের মুক্তিসাধনের এক নতুন পথের আবিষ্কার করে এই ধর্ম বহির্ভারতে প্রসারলাভ করলেও জ্যোতিষ, গণিত ও বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে এই ধর্মের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অবদান নাই। তা বলে বৌদ্ধরা এই বিষয়গুলি চর্চা করেননি এমন নয়। প্রধানত ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিষ ও গণিতের চর্চার মধ্যেই তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। গণিত অধ্যয়ন এই ধর্মে স্বীকৃত হলেও জৈনদের মত গণিতে বৌদ্ধদের তেমন কোন অবদান নাই। বিশাল বিশাল সংখ্যার নামকরণ ও ব্যবহার বৌদ্ধদের গণিত-চর্চার একটি দৃষ্টান্ত। যথাস্থানে আমরা দু'একটি বৌদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ করব।

জৈনদের ধর্মশাস্ত্র 'আগম' বা 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। এই আগম গ্রন্থসমূহে জৈনধর্মের তত্ত্ব, ব্যাখ্যা, জিনচরিত ও মহাবীর বর্ধমানের প্রবচনসমূহ আলোচিত হয়েছে। আগম গ্রন্থের মোট সংখ্যা 45, কারো কারো মতে 84। এই

45 খানি বা 84 খানি গ্রন্থ অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছেদ-সূত্র ও মূল-সূত্রে বিভক্ত। নিম্নে গণিত ও জ্যোতিষ সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের নামসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

স্থানাঙ্গ সূত্র (ঠানাংগ): এই গ্রন্থে 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যার নানাবিধ তথ্যের আলোচনা আছে। স্থানাঙ্গ সূত্রের গাণিতিক মূল্য অপরিসীম।

সমবায়াঙ্গ (সমবায়ংগ): স্থানাঙ্গ সূত্রে যে সংখ্যাগত দিকের আলোচনা আছে তার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এটিকে স্থানাঙ্গ সূত্রের ভাষ্যরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

সূর্য-প্রজ্ঞপ্তি (সূর-পন্নত্তি): এই গ্রন্থটি জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। দ্বাদশ রাশি, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের বিবরণ থেকে জৈনদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার কথা জানতে পারা যায়।

চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি (চন্দ-পন্নত্তি): এই গ্রন্থটি সূর্য-প্রজ্ঞপ্তির ন্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।

জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি (জম্বুদ্দীপ-পন্নত্তি): এই গ্রন্থটি প্রধানত ভূগোল বিষয়ক। তা হলেও এখানে নানা গাণিতিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

গণিত-বিদ্যা (গণি বিজ্জা): জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় গণিত অপরিহার্য। তাই এই গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গণিতের আলোচনা আছে।

কল্প সূত্র ও উত্তরাধ্যায়ন সূত্র: প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থদ্বয় গণিত বিষয়ক নয়। তবুও এখানে ভদ্রবাহু নানা গণিত-তথ্যের উল্লেখ করেছেন। 'জৈনগণিত' অধ্যায়ে আমরা ভদ্রবাহু সম্পর্কে আলোচনা করব।

জৈনধর্মে গণিতের অনুশীলন ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য করা হতো। সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান ও বাইশতম তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা থেকে জানতে পারা যায় খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ও তারও পূর্ববর্তী সময়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রটি ইতিহাস ও ষষ্ঠস্থানীয় নিঘন্টু (বৈদিক কোষগ্রন্থ), এদের অঙ্গ উপাঙ্গ এবং রহস্য, এদের সার, সংখ্যা-শাস্ত্র (গণিত), ষড়ঙ্গশাস্ত্র (শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দ-নিরুক্ত-জ্যোতিষ), নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করে সর্ববিষয়ে

ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের হিতার্থে বাহাত্তর কলা, চৌষট্টি মহিলা-গুণ, শতপ্রকার শিল্প ও তিন প্রকার কর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ওই বাহাত্তর কলার প্রথমটি লেখা, প্রধানটি গণিত এবং সর্বশেষটি শকুনের ভাষার অর্থ-নির্ণয়। ঋষভদেবের সময়কাল নির্ণয় করা এক অসম্ভব ব্যাপার। পরপর দু'জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব শত বৎসর করে ধরলেও ঋষভদেবের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ 3000 বৎসর হয়। তাহলে কি তিনি মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পার যুগের নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? যাই হোক,—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকে গণিত-চর্চা চলে আসছে।

প্রথম অধ্যায়

"The history of mathematics is one of the large windows through which the philosphic eye looks into past ages and traces the line of intellectual development.

—F. Cajori

॥ সিন্ধু সভ্যতা ॥

ভারতীয় ইতিহাসে সিন্ধু-সভ্যতা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের। এই সভ্যতার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, কেবল কিছুটা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইতিহাস রচনার মশলার অভাব বেশী নাই। অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়নি। এখানকার শীলমোহর থেকে যদি কোনদিন লিপি পাঠ সম্ভব হয়, তা হলে হয়তো ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস আমরা জানতে পারব। আর মনে হয় তখন অনেক গবেষণা নিরর্থক হয়ে উঠবে। তখনই কেবল বেদ-বেদান্তের ক্রমবিকাশের ধারাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবুও সিন্ধু-নদের তীরে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এক সুসভ্য জাতি বাস করতো। আধুনিক সভ্যতার নগর-জীবন তাদের অলভ্য ছিল না। 180 ফুট দীর্ঘ 100 ফুট বিস্তৃত বিরাট স্নানাগারের মধ্য ভাগের প্রাঙ্গনে 39 ফুট দীর্ঘ, 23 ফুট বিস্তৃত ও 8 ফুট গভীর সন্তরণবাপীতে যে রাজা বা সর্দার অথবা দোর্দণ্ড প্রতাপ কোন পুরোহিত সখী বা দেবদাসীসহ জলক্রীড়া করত না কে বলতে পারে? এখানকার কূপের ধারে ক্ষয়ে যাওয়া ইটের চিহ্ন দেখে কোন স্বপ্নবিলাসী কবি যদি অপরাহ্ন বেলায় নানা ভূষণে সজ্জিত সিন্ধু ললনাদের কলহাস্য মুখরিত একটি অধ্যায়ের গীতিকাব্য রচনা করেন, তা হলে খুব দোষের হবে না। নগরের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন পল্লীর নরনারীর প্রেমের উপাখ্যান শিলাস্তরের কোথায় লুকিয়ে আছে, আজ তার সব সন্ধান মিলবে না। রক্ত মাংসের চিহ্ন আজ আর নাই, আছে কেবল কঙ্কাল আর ভগ্নস্তূপ। আমরা এর মধ্য থেকেই কিছু সন্ধান করার আয়োজন করছি।

নগর পরিকল্পনা, অট্টালিকা ও গৃহনির্মাণে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সিন্ধু-তীরবাসী কোন ইঞ্জিনিয়ার গ্রহণ করেছিলেন, আজ তার কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই।

যে বিশাল শস্যাগারে শাসনকর্তার রাজস্ব জমা হতো তার ওজন-পদ্ধতির কোন লিখিত রূপ আমাদের জানা নাই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন কালের করাল গ্রাস অতিক্রম করে আমাদের নয়নগোচর হয়েছে বটে, আজও কিন্তু সবই আনুমানিক, কাল্পনিক। সেজন্যেই বলছিলাম এই সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস আজও রচিত হয়নি।

॥ মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত ওজন, গণনা ও সংখ্যা ॥

বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও গৃহ-নির্মাণে যারা নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, তাঁরা যে পরিমাপ ও গণনায় নিপুণ ছিলেন, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত মন্তব্য করা যায়। কারণ, গণিত-বিদ্যার প্রাথমিক নিয়মগুলি ব্যতিরেকে এত বড় সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, এ-কথা ভাবা যায় না। চিত্র-সম্বলিত অসংখ্য শীলমোহর ও বিভিন্ন ওজনের পাথরের বাটখারার মধ্যেই এ-সবের প্রমাণ আছে।

শীলমোহরের পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিকরা মনে করেন বহির্বাণিজ্যে এই শীলমোহর ব্যবহৃত হতো এবং বস্তুর নাম ও ওজন লিপিবদ্ধ করা আছে। ওজন পাথরগুলি সাধারণত চকমকি পাথরের তৈরী, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় প্রায় সমান অর্থাৎ ঘনাকৃতি। বড় বড় পাথরগুলি মন্দিরাকৃতি, দড়ি দিয়ে ঝুলোবার জন্যে এতে ছিদ্রও থাকত। মি. হেমির মতে এই ওজন-গুলি এলাম ও মেসোপটেমিয়ার ওজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল। এই সব ওজন-পাথরের পরিমাপ পরীক্ষা করলে দেখা যায় সুসার ওজনের মত প্রথমত দ্বিগুণিত 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ; কিন্তু তারপর দশগুণোত্তর, 110, 200, 320, 640, 1600 প্রভৃতি। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় খনন করে 13·71 গ্রাম ওজনের বহু পাথর পাওয়া গেছে। সুতরাং মনে হয়, সিন্ধুবাসীরা 13·71 গ্রামকেই ওজনের একক হিসাবে ব্যবহার করত। কয়েকটি ধাতব তুলাদণ্ডের আবিষ্কার থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে ওজন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। মনে করা হয়, এ-সব তুলাদণ্ডের ছোট্ট হালকা ধরনের কোন কিছু মূল্যবান সামগ্রী ওজন করা হতো। যেমন আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিক্তি ও ব্যালেন্স ব্যবহার করি। ওজন বাটখারার একক ভগ্নাংশ ছিল বলে, মনে হয় সেই অতি প্রাচীন ভারতীয়রা ভগ্নাংশের ব্যবহার জানত।

মহেঞ্জো-দড়োর পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও পূর্ত-রহস্য বিস্ময়ের বস্তু। এই নগরীর

ইমারৎ নির্মাণে যেন বর্তমানের ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে $10\frac{1}{2}''$ বা $11'' \times 2\frac{3}{4}''$ মাপের ইট দেখতে পাওয়া যায়। স্থান ও কার্যবিশেষে কখনো কখনো কাঁচা ও পোড়া ইটের মাপ $10\frac{1}{4}'' \times 5'' \times 2\frac{1}{2}''$ থেকে $20\frac{1}{4}'' \times 8\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ পর্যন্ত দেখা যায়। কাশ্যপ-সংহিতায় $10\frac{1}{2}$ বা $11 \times 5\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ অঙ্গুলি মাপের ইটের সঙ্গে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

পরিমাপ : এই মৃত-স্তূপের মধ্য থেকে দু'ধরণের স্কেল আবিষ্কৃত হয়েছে। এক প্রকার শঙ্খের তৈরী বর্তমান ফুটের মত।

চিত্র—1 (সিন্ধু-সভ্যতা যুগের ব্যবহৃত স্কেল)

ভাঙ্গা এই স্কেলটি দৈর্ঘ্যে 6·62 সেমি এবং প্রস্থে 0·6 সেমি। এতে সূক্ষ্ম করাত দিয়ে ন'টি সমান্তরাল দাগ কাটা আছে। এই দাগের একটিতে বৃত্ত ও ষষ্ঠ দাগে একটি বিন্দু চিহ্নিত আছে। বিন্দু ও বৃত্তের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব 1·32 ইঞ্চি। আর পরপর দুটি দাগের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব 0·264 ইঞ্চি। 1·32 ইঞ্চিকে সিন্ধু-ইঞ্চি ধরিলে এই পরিমাপ 2 সুমেরীয় শুশির সমান। এই স্কেলের সঙ্গে সম্রাট আকবরের সময় উত্তর ভারতে গজের এক বিস্ময়কর মিল দেখতে পাওয়া যায়। আকবরের সময় উত্তর ভারতে 33 ইঞ্চিতে এক গজ ব্যবহৃত হতো। আর তা 25 সিন্ধু-ইঞ্চির সমান।

আগেই বলা হয়েছে উপরোক্ত স্কেলটি ভগ্ন। ম্যাকে মনে করেন সমগ্র স্কেলটির পরিমাপ 13·2 ইঞ্চি। এই মাপের একক দশমিকে বিভক্ত ছিল বলে তিনি মনে করেন। ফুটের মত মাপ প্রাচীন মিশর ও এলামে প্রচলিত ছিল। সিন্ধু-তীরবাসীরা মাপের উন্নততর পদ্ধতি, দশমিক পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য গর্ব করতে পারে।

তখন আর এক প্রকার মাপকাঠি প্রচলিত ছিল,—হাতের মত প্রায় 20·5 ইঞ্চি লম্বা। প্রাচীন সভ্যদেশ সমূহে প্রায় সর্বত্রই এই হাতের মাপ ব্যবহৃত হতো।

বৈদিকযুগের সময় থেকেই আমরা এই প্রকার মাপের বহু প্রমাণ পাই। কে বলতে পারে ভারতে এই মাপ হয় তো সিন্ধু-সভ্যতারই অনুবর্তন!

সংখ্যা : মি. রোস সিন্ধু-শীলমোহরে প্রাপ্ত সংখ্যা বিষয়ে আলোচনা করে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এবং 12 এই কয়েকটি সংখ্যা নির্দেশক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। সিন্ধুবাসীরা উল্লম্ব রেখার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করত। উল্লম্ব রেখাগুলি পাশাপাশি লেখা হতো, আবার দলগত ভাবেও লেখা হতো। এই ধরণের সংখ্যা বহু প্রাচীন সভ্য দেশে দেখতে পাওয়া যায়।

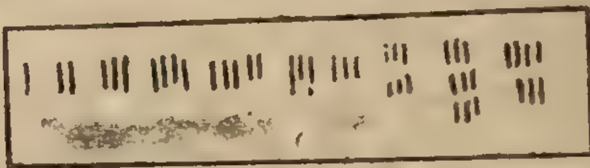

চিত্র—2 (সিন্ধু-সভ্যতা যুগের সংখ্যা)

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সিন্ধু-সংখ্যার সঙ্গে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী সংখ্যার কিছু কিছু মিল আছে। শুধু সংখ্যা নয়, শীলমোহরের কিছু কিছু লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী-লিপির সাদৃশ্যও আছে।

মহেঞ্জো-দড়োর আদি-স্তরের খনন সম্ভব হলে, হয়তো ভারতের এই পর্বের ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে। হয়তো তখন শীলমোহরের লিপি-পাঠ সম্ভব হবে,—অনেকের মত গণিতের ইতিহাসও নতুন করে লিখতে হবে।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

"This long period of nearly five thousand years show the rise and fall of many a civilization, each leaving behind it a heritage of literature, art, philosophy, and religion. But what was the net achievement in the field of reckoning, the earliest art practiced by man ?"

—Dantiz.

॥ বৈদিক যুগের গণিত ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের আলোচনায় সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবতরণিকায় সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থরাজিতে ছড়ানো গাণিতিক উপাদানসমূহ বৈদিক যুগে ভারতীয়দের গাণিতিক নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কল্পসূত্রের অন্তর্গত শুল্বসূত্রে ও জ্যোতিষে গাণিতিক উপাদানের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। শুল্বসূত্র বৈদিক যুগে রচিত হলেও পৃথকভাবে আমরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করব। বৈদিক যুগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়নে গণিতের একটি বিশেষ স্থান ছিল। সনৎকুমারের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে নারদ তাঁর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রগুলির যে বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ স্থান পেয়েছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে গণনা বা রাশি-বিদ্যাকে ময়ূরের মাথায় শিখা এবং সাপের মাথার মণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে গণিতের সারবত্তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

সংখ্যা : বৈদিক যুগে সংখ্যা-লিখনে দশগুণোত্তর পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার নামকরণে প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে ভারতীয়গণ অগ্রগণ্য। গ্রীকরা মিরিয়াড (10^4) পর্যন্ত নামকরণ করেছিল। যজুর্বেদ সংহিতায় 10^{12} পর্যন্ত সংখ্যার নামকরণ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক (1), দশ (10), শত (10^2), সহস্র (10^3), অযুত (10^4), নিযুত (10^5), প্রযুত (10^6), অর্বুদ (10^7), ন্যর্বুদ (10^8), সমুদ্র (10^9), মধ্য (10^{10}), অন্ত্য (10^{11}) এবং পরার্ধ (10^{12}) সংখ্যার নাম পাওয়া যায়। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও একইভাবে নামকরণ দেখা যায়, তবে সেখানে পরার্ধের পরও বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার নামকরণ আছে। বিশ্বগণিতের ইতিহাসে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার এই নামকরণ অনন্য। আর এটাই হচ্ছে ভারতীয়দের একটি বৈশিষ্ট্য।

কেবলমাত্র বৈদিক যুগেই যে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা দেখা যায়, তা নয়। বৌদ্ধ ও জৈন গাণিতিকরাও বিরাট বিরাট সংখ্যার কল্পনা করে নামকরণ করেছেন। বৌদ্ধরা দশগুণোত্তর পদ্ধতির পরিবর্তে শতোত্তর পদ্ধতি অবলম্বন করে 10^{53} সংখ্যাটির নাম দেয় "তল্লক্ষণ"। শীর্ষ-প্রহেলিকা অবলম্বন করে জৈনরাও আরো বিশাল সংখ্যাগঠন ও নামকরণ করে।

সংখ্যার নামকরণে বৈদিক গাণিতিকরা তিন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করে। বিজ্ঞান-সম্মত এই পদ্ধতিই আমাদের বিস্ময় উদ্রেগ করে। প্রথমত প্রথম ন'টি অঙ্কের নাম,—এক, দ্বি, ত্রি, চতুর, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, এবং নব। দ্বিতীয়ত আর ন'টি সংখ্যা উপরের অঙ্কগুলিকে 10 দ্বারা গুণ করে দশ, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চতুর্বিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, এবং নবতি নামকরণ করা হয়েছে। তৃতীয়ত শত থেকে শুরু করে পরার্ধ পর্যন্ত এই এগারোটি সংখ্যা 10 দ্বারা গুণ করে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারে গুণের নিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে। যে-সব সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সংখ্যা দ্বারা গঠিত, সেখানে যোগের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। যেমন, দ্বাদশ $=10+2$। যে-সব সংখ্যা গঠনে যোগ ও গুণ উভয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, সেখানে তৃতীয় ও প্রথম অথবা দ্বিতীয় প্রকারের সংখ্যার মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন,—সপ্ত শতানি বিংশতি $=720=7\times100+20$। বিয়োগ-নিয়মও সংখ্যার নামকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। শুল্বসূত্রে এর উদাহরণ আছে। যেমন, একান্ন-শত বলতে তখন একশ' অপেক্ষা 'এক' কম বোঝানো হতো। একান্ন-শত$=100-1=99$। ভাষার ক্রমবিকাশের পথে 'একান্ন'-ই পরবর্তীকালে 'একোন' হয়ে 'ঊন'-তে পরিণত হয়েছে। এখন 'ঊন' অর্থে আমরা 'এক কম' বুঝি। প্রাচীন ব্যাবিলন ও গ্রীসেও এই পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক চার নিয়ম: সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে প্রাথমিক চার নিয়মের স্পষ্ট কোন আলোচনা নাই। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে গণিত-শিক্ষণে এ-সব নিয়ম এমনই অপরিহার্য যে তাঁরা এ-সব নিয়মের আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি। ঠিক একই কারণে প্রথম আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তও এ-সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। দশম শতকে দ্বিতীয় আর্যভটের সময় যোগ ও বিয়োগের আলোচনা দেখা যায়। 'গুণ' শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে আছে। তখন 'গুণ' শব্দের অর্থে 'হনন', 'বধ' ও 'ক্ষয়' বোঝানো হতো। ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণে এক হাজারকে তিন দ্বারা ভাগের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদেও সুস্পষ্ট কোন প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাই। শতপথ

ব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে ইন্দ্র ও বিষ্ণু কর্তৃক এক হাজার গাভীকে ভাগ করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি এক হাজারকে তিন দ্বারা ভাগ করে, তা হলে সব সময় এক বেশী হবে অর্থাৎ ভাগশেষ থাকবে।

ভগ্নাংশ : প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে ভগ্নাংশের প্রচলন ছিল। মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত ওজন ও পরিমাপের একক থেকেই তা প্রমাণিত হয়। বৈদিক সাহিত্যেও ভগ্নাংশের উল্লেখ আছে,—অর্ধ ($\frac{1}{2}$), ত্রিপাদ ($\frac{3}{4}$), পাদ ($\frac{1}{4}$), কলা ($\frac{1}{16}$) প্রভৃতি কয়েকটি উদাহরণ। শুল্বসূত্র-যুগের পর ভগ্নাংশ বলতে 'অংশ', 'ভাগ' বোঝানো হতো। কয়েকটি উদাহরণ :—ত্রিভাগ $= \frac{1}{3}$, পঞ্চম ভাগ, পঞ্চম $= \frac{1}{5}$; দ্বাদশ-ভাগ, দ্বাদশ $= \frac{1}{12}$; পঞ্চদশ-ভাগ $= \frac{1}{15}$; ত্রি-অষ্টম, ত্র্যষ্ট $= \frac{3}{8}$; দ্বি-সপ্তম $= \frac{2}{7}$; পঞ্চমস্থ চতুর্বিংশ $= \frac{1}{24}$ এর $\frac{1}{5}$।

ভগ্নাংশ প্রকাশের আরো একটি রীতি ছিল। যেমন,—$7\frac{1}{2}$ বলতে অর্ধাষ্টম, $8\frac{1}{2}$ বলতে অর্ধনবম, $\frac{1}{2}$—দ্বিগুণ, $\frac{1}{3}$—ত্রিগুণ প্রভৃতি। 'অর্ধাষ্টম' বলতে এখানে আট থেকে অর্ধ কম বোঝাচ্ছে। এই রীতি ভারতীয় গণিতে নতুন নয়।

প্রাথমিক চার নিয়ম সহ ভগ্নাংশের বর্গীকরণ শুল্বসূত্রে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি $\frac{1}{25}$ বর্গ পুরুষ ইট দ্বারা $7\frac{1}{2}$ বর্গ পুরুষ স্থান আবৃত করতে মোট ইট লাগবে $7\frac{1}{2} \div \frac{1}{25} = 187\frac{1}{2}$। শুল্বসূত্রে এই প্রক্রিয়াটি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রগতি : প্রগতি ছিল প্রাচীন ভারতীয় গাণিতিকদের একটি অতি আকর্ষণীয় বিষয়। সংহিতার যুগেও প্রগতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নিম্নলিখিত সমান্তর শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায় :

1	3	5	...	19	29	39	99
2	4	6	...	20			
4	8	12		20			
5	10	15		100			
10	20	30		100			

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে 'দক্ষিণা' দেবার একটি নিয়মের মধ্যে গুণোত্তর শ্রেণীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, এখানে শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের কোন নিয়ম দেওয়া হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণে এই নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন সাধারণ পদ্ধতির নিয়ম নাই। তবুও সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর উল্লেখও নির্ভুল সমষ্টি নির্ণয় থেকে মনে হয় বৈদিক গাণিতিকরা হয়তো কোন সাধারণ পদ্ধতি জানতেন। বৃহদ্দেবতায় সমষ্টি নির্ণয়ের এই অঙ্কটি আছে :

$$2+3+4+5+\ldots\ldots+1000=500499$$

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে গুণোত্তর শ্রেণীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের ভারতীয় গাণিতিকরা পূর্ববর্তীদের মত সমান আগ্রহী ছিলেন এ-বিষয়ে। মহাবীর, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও নারায়ণ প্রভৃতি গাণিতিকরা শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র দিয়ে তাঁদের প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন।

বৈদিক যুগের বীজগণিত

সাধারণত বীজগণিতের উদ্ভব-কাল গুপ্তযুগে সূচীত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুগেও গণিতের এই শাখার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তখন এর জ্যামিতিক রূপটি ছিল গাণিতিকদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দু। প্রদত্ত একটি বাহু দ্বারা কোন বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিতে $ax=c^2$ এই সমীকরণের বীজ নির্ণয় করতে হতো। 'মহাবেদী' ও 'শ্যেন-চিতি' নির্মাণে যে সমীকরণের সাহায্য নিতে হতো তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব 2000 বৎসর পূর্বেও ভারতীয় গাণিতিকরা বীজগণিতের ধারণা ও তার নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শুল্বসূত্রে দ্বিঘাত, অনির্ণেয় সমীকরণ, করণী, মূলদ ও অমূলদ রাশি ও আসন্ন মান নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। a ও b বাহুযুক্ত আয়তক্ষেত্রের কর্ণ $\sqrt{a^2+b^2}$। ডঃ টি, এ, সরস্বতী আম্মা তাঁর Geometry in Ancient and Medieval India গ্রন্থে বলেছেন: "Here (as also in evaluating $\sqrt{a^2-b^2}$), the purpose of the Śulbasūtras is really more geometrical i. e. to combine two squares into an equivalent square...."

সমবায় ও বিন্যাস: প্রগতির ন্যায় সমবায় ও বিন্যাসও ছিল প্রাচীন ভারতীয় গাণিতিকদের একটি প্রিয় বিষয়। শুধু গাণিতিকরা নন, অ-গাণিতিক ছান্দসিকরা আবার এ-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বৈদিক ছন্দ ও তার বৈশিষ্ট্য সংঘটনে এই বিষয়ের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এ জন্যেই কেবল নয়, অন্য বিষয়ের সমস্যা সমাধানেও এই নিয়মের ব্যবহার হয়েছে। যেমন, 16টি বিভিন্ন প্রকারের বস্তু থেকে একসঙ্গে 1, 2, 3 অথবা 4টি করে বস্তু নিয়ে কত প্রকারের সুগন্ধি প্রস্তুত করা যায়, তার সমাধানও করা হয়েছে। জ্ঞান ও সমস্যার নানান ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগ করে সমবায় ও বিন্যাস তত্ত্বের বহুল প্রয়োগ ও নির্ভুল উত্তর-নির্ণয় থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয় গণিতের উৎকর্ষতা।

সমবায় ও বিন্যাসের আলোচনায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পিঙ্গলের ছন্দসূত্রের অবদান কম নয়। পিঙ্গল সংক্ষিপ্ত নিয়ম বর্ণনা করে সমস্যা সমাধান করেছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে তাঁর নিয়ম ও পদ্ধতির আলোচনা করা যাক।

সমস্যা :—পুনরাবৃত্তির সাহায্যে n-সংখ্যক বস্তুকে দুটি করে নিয়ে কত প্রকারে বিন্যাস করা যায়? (এখানে দুটি বস্তু বলতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রার কথা বলা হয়েছে)

নিয়ম :—"যখন অর্ধ করা হবে তখন 2 বসাও, যখন 1 বিয়োগ করা হবে তখন শূন্য বসাও; শূন্যের বেলায় 2 দ্বারা গুণ ও অর্ধের বেলায় বর্গ কর।"

6 মাত্রার গায়ত্রী ছন্দের ক্ষেত্রে বিন্যাস-নিয়ম প্রয়োগ করে পিঙ্গলের নিয়মটি আলোচিত হচ্ছে।

	A	B
1. সংখ্যাটি বসাও (এখানে ছন্দের সংখ্যা)	6	×
2. অর্ধ কর	3	2
3. 3 অযুগ্ম, অতএব 1 বিয়োগ কর	2	0
4. অর্ধ কর	1	2
5. 1 অযুগ্ম অতএব 1 বিয়োগ কর	0	0

B-স্তম্ভের সংখ্যাগুলি পিঙ্গলকৃত নিয়ম দ্বারা পাই। প্রকৃত গণনা B স্তম্ভ থেকে শুরু হয়। শূন্যের বেলায় 2 দ্বারা গুণ করে 2 পাওয়া যায়; অর্ধের বেলায় বর্গ; সুতরাং 2-এর বর্গ $=2^2$। আবার শূন্যের বেলায় দ্বিগুণ করলে $2\times2^2=2^3$ পাওয়া যায়। অর্ধের বেলায় বর্গ হবে; সুতরাং $(2^3)^2=2^6$। এটাই সমস্যার নির্ণেয় উত্তর।

কেবল বিন্যাস নয়, পিঙ্গলের গ্রন্থে সমবায়ের আলোচনাও আছে। ভারতীয় গণিতে সমবায়ের নাম "মেরু-প্রস্তর"। দশম শতকে হলায়ুধ এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। সপ্তদশ শতকে প্যাসকাল এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এখন তা "প্যাসকালের ত্রিভুজ" নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতীয় গাণিতিকরা কমপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্যাসকালের প্রায় 2000 বৎসর পূর্বে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

"Let no one who is unacquainted with geometry enter here."—Plato

ভারত

প্রাচীন কালে বিজ্ঞানানুশীলন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হতো। ফলতঃ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে গণিতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ শুদ্ধভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পন্ন করতে হলে গ্রহ-উপগ্রহের বিশেষ সময়ে অবস্থান, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতিতে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রধানভাবে আলোচিত হলেও এই বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গণিতও অনুশীলিত হতো। এইভাবেই আমরা পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতি চর্চার ইতিহাস জানতে পারি।

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন ধর্মপ্রাণ দেশ। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এক কথায় বলতে গেলে, ধর্মই ছিল ভারতীয় সমাজ-জীবন, রাজনৈতিক-জীবন ও সাংস্কৃতিক-জীবনের মূল ভিত্তি। ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে যেমন ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এ-দেশের বিজ্ঞান-চেতনার মূলেও ধর্মের অপরিহার্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সে-কারণে বেদী নির্মাণ থেকেই এদেশের জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল। শুল্ব সূত্রে নিহিত প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতির পরিচয় দেওয়ার আগে বৈদিক পূজা অনুষ্ঠানের বিধি ও রীতি নিয়ে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন। তাহলে আমরা ভারতীয় জ্যামিতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করতে পারব।

অগ্নির স্বরূপ ও বৈদিক পূজা অনুষ্ঠানের পরিচয়

বিধি ও নিয়মানুযায়ী বেদী-নির্মাণ ও অগ্নি প্রজ্বলিত করে পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন করাই ছিল বৈদিক অনুষ্ঠানের মূলমন্ত্র। অগ্নির স্বরূপ না জানলে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের তাৎপর্য উপলব্ধি হবে না। বেদের ঋষিরা অগ্নির দুটি

স্বরূপের কথা বলেছেন: একটি স্থূল রূপ বা নিকৃষ্ট রূপ, আর অন্যটি সূক্ষ্ম বা উৎকৃষ্ট রূপ। ঋষিগণ সেই অগ্নির উপাসনার কথা বলেছেন যে কারণ-সত্তা থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নির যে অংশ স্থূল, যে অংশ মৃতদেহ ভক্ষণ করে, সে অংশের অর্চনা ঋষিদের অভিপ্রেত নয়। তাঁদের অভিপ্রায়—যে অগ্নির মধ্যে আর একটি অগ্নি আছে, যে অগ্নি দেবতাদের কাছে যজ্ঞের হবি বহন করে থাকে, যে অগ্নি বিশ্বের যাবৎ বস্তুকে জানে, তাঁরই উপাসনা করা। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয়, সেই যজ্ঞের উপাস্য দেবতা স্থূল অগ্ন্যাদি দেবতা নয়। অর্থাৎ অগ্নির সূক্ষ্ম রূপটিই দেবতাদের কাছে যজ্ঞীয় হবি বহন করে। যজ্ঞের অগ্নির প্রকৃত তাৎপর্যই এই। ঋগ্বেদে সর্বত্রই অগ্নিকে দেবতাদের দূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হবি বহন করে বলে অগ্নি দূত। যে মানব কেবলমাত্র অমৃত প্রাপ্তির জন্য অগ্নিতে হবি প্রক্ষেপ করে, কেবল সেই মানুষের সম্বন্ধেই অগ্নি দূত হয়। অন্যত্র নয়।

বৈদিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞের অপরিহার্যতা উপরের আলোচনায় কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে বলে আশা করা যায়। যা হোক, যজ্ঞ ছিল দু'রকমের। প্রথম প্রকারের নাম 'নিত্য' এবং দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'কাম্য'। নিত্য শব্দটির অর্থ আবশ্যিক, কাম্য হচ্ছে কামনা করা,—কিছু পেতে ইচ্ছা করা।

বৈদিক ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি দিন কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আবশ্যিক বলে বিবেচিত হতো। কেবল যাঁরা সন্ন্যাসী,—যাঁরা গৃহ থেকে দূরে কোন অরণ্যে বা পর্বতকন্দরে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, তাঁরা ছিলেন সব রকম আচার-অনুষ্ঠানের বাইরে। বিশেষ ধরণের যজ্ঞ-বেদীতে প্রত্যেক গৃহস্থকে তিন প্রকার অগ্নি সংরক্ষিত রাখতে হতো। সেগুলি ছিল 'গার্হপত্য', 'আহ্বানীয়' ও 'দক্ষিণ'। যজ্ঞবেদী-নির্মাণে সবিশেষ সাবধানতা বৈদিক অনুশাসন। কারণ, বেদী নির্মাণে,—এর আকার ও আয়তনে সামান্যতম ভুল ত্রুটি হলে গৃহস্থের অমঙ্গল ও অকল্যাণ হিসাবে গণ্য হতো।

গার্হপত্য বেদী **বর্গাকার** অথবা **বৃত্তাকার** হতে পারত, আহ্বানীয় বেদী **বর্গাকার** ও দক্ষিণ বেদী ছিল **অর্ধবৃত্তাকার**। 'ব্যাম' একক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এক ব্যামের পরিমাপ ছিল 72 ইঞ্চি। 'পুরুষ'-ও একক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এর পরিমাপ ছিল 90 ইঞ্চি। সে-যুগে 'পুরুষ' একক কোন রাজা বা পুরোহিতের দৈর্ঘ্য ছিল বলে মনে হয়।

উপরোক্ত তিন প্রকার অগ্নি নিত্য পূজা-অর্চনার জন্য নির্দেশিত ছিল। আর

এক প্রকার অগ্নি, 'কাম্যাগ্নি'-র প্রচলন ছিল। এই প্রকার অগ্নির মধ্যে কোন-না-কোন পার্থিব লাভালাভ জড়িত ছিল বলে শাস্ত্রে এই প্রকার অগ্নি সমাদৃত হতো না। রাজা-রাজড়ারা ছিল এই প্রকার অগ্নির ভক্ত। অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা আমাদের অজানা নেই। অবশ্য কথনো কথনো মুনি-ঋষিরা একত্রে দেশ বা কোন গোষ্ঠীর বৃহত্তর কল্যাণে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। কাম্যাগ্নি নির্মাণ অতীব জটিল। ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, ট্রাপেজিয়াম প্রভৃতিতে বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যতিরেকে এই প্রকারের বেদী-নির্মাণ সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এক বেদীকে সম-আকার বা ভিন্ন-আকারের অন্য বেদীতে রূপান্তরিত করা ছিল আরো জটিল।

॥ শুল্ব ও শুল্বকার ॥

শুল্ব শব্দের অর্থ 'রজ্জু' বা 'দড়ি'। তাই কথনো কথনো শুল্ব শব্দের পরিবর্তে রজ্জু শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রজ্জু বা দড়ি দিয়ে জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কণ হতো বলে খুব সম্ভব এই নাম দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসেও 'লিলেন' বা সুতোর ব্যবহার দেখা যায়। জ্যামিতির নানা উপপাদ্য, সম্পাদ্য ও সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে শুল্ব সূত্রে নিহিত আছে। 'অবতরণিকা'য় আমরা সূত্রের সংজ্ঞা দিয়েছি। বৈদিক যুগের শিক্ষা দান ছিল মৌখিক। কিন্তু কালক্রমে বিশাল জ্ঞান মৌখিক শিক্ষা দানে অসম্ভব হয়ে উঠে। তখনই সূত্রাকারে লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়,—সূত্র যুগের শুরু হয়। এক সময় ভারতে বহু বৈদিক প্রতিষ্ঠান ছিল। 150 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পতঞ্জলির রচনা থেকে জানতে পারা যায় তখন 1131 বা 1137 প্রকারের বৈদিক প্রতিষ্ঠান ছিল। অনুমিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন শুল্ব সূত্র পড়ানো হতো। কিন্তু বর্তমানে আমরা মাত্র সাত প্রকারের শুল্বসূত্রের কথা জানি।

ভারতীয় রীতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুল্বকারদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আর জানি না তাঁদের রচিত গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে। নীচে শুল্বকারদের নাম ও তাঁদের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

॥ বৌধায়ন ॥

প্রাচীনতার দিক থেকে বৌধায়নের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। এঁর রচনা-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও পণ্ডিতরা 800 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দকে এঁর রচনাকাল বলে অনুমান করেন। বৌধায়নের সূত্রগ্রন্থ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ।

তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে মোট 525টি সূত্র আছে। ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এ দশটি স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে 467টি উপপাদ্য আছে। এই আলেকজেন্দ্রীয় শিক্ষকের মনীষায় আমরা প্রায়ই অভিভূত হই, আর তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। কিন্তু বৌধায়ন প্রভৃতি জ্যামিতিকারদের সম্পর্কে আমরা প্রায়ই নীরব থাকি,—এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যা হোক,—বৌধায়ন তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বেদী তথা জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কনের নিয়ম কখনো বিস্তারিতভাবে কখনো অতি সংক্ষেপে তথা সূত্রাকারে বিবৃত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শুল্বকারগণ কোন সূত্রের আবিষ্কারক নন। খুব সম্ভব, ইউক্লিডের মত বৌধায়নও কোন বৈদিক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য আচার্য ছিলেন।

।। কাত্যায়ন ।।

কাত্যায়নের শুল্বসূত্র দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের সূত্র সংখ্যা 90 এবং দ্বিতীয় অংশের সংখ্যা 40 বা 48। বৌধায়নের তুলনায় কাত্যায়নের বেশী কিছু কৃতিত্ব নাই। এখানে-ওখানে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায় মাত্র। এই গ্রন্থের রচনা আনুমানিক 500 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে ধরা হয়।

।। আপস্তম্ব ।।

ইনি সম্ভবত 400 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। এঁর গ্রন্থ 21টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং মোট সূত্র সংখ্যা 223টি। আপস্তম্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিভিন্ন প্রকার বেদী-নির্মাণ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

।। মানব ।।

অন্যান্য শুল্বসূত্রের ন্যায় মানব শুল্বসূত্রে বিভিন্ন প্রকারের বেদী ও অগ্নি নির্মাণের নিয়ম ও সূত্রাদির বর্ণনা আছে। মানব ও কাত্যায়ন শুল্বের সঙ্গে অন্যান্যদের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। বৌধায়ন ও আপস্তম্ব নিয়মগুলি সূত্রাকারে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু মানব ও কাত্যায়ন পদ্যের ব্যবহার করেছেন। মানব শুল্বের প্রধান ভাষ্যকার শিবদাস বলেন, পদ্যাংশের রচয়িতা হচ্ছেন শুল্বকারগণ। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন মানব-শুল্ব 500 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে 200 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হয়ে থাকবে।

মানব-শুল্বের প্রথম অধ্যায়ে পরিভাষা সূত্রের আলোচনা আছে। দ্বিতীয়,

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বেদীর আলোচনা দেখা যায়। সপ্তম অধ্যায়ের কিছু অংশে পরিমাপ ও 'দক্ষিণা' সম্বন্ধে বলা হয়েছে ; অবশিষ্ট অংশে 'সুপর্ণ-চিতি' নামে এক প্রাচীন চিতির উল্লেখ আছে। সুপর্ণ-চিতিকে গরুড়-চিতিও বলা হয়। 'সুপর্ণ' শব্দের অর্থ পরম সত্তা, প্রাণশক্তি, বিষ্ণু, সূর্য। এই চিতির উল্লেখ ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লক্ষ্যণীয় :—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু
রথো দিব্যঃ স সুপর্ণ গরুত্মান।"

বৌধায়ন ও আপস্তম্বে এই চিতির উল্লেখ নাই। কিন্তু রামায়ণে উল্লেখ আছে। মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য 'গরুড়-চিতি' নির্মাণ করেছিলেন। 'সপ্তবিধ-চতুরস্র-শ্যেন-চিৎ'-এর সঙ্গে মস্তক ছাড়া সব দিক থেকে এই চিতির মিল দেখা যায়।

মানব শুল্বসূত্রে আর কোন চিতি বা অগ্নির উল্লেখ নাই। তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশই নানা প্রকারের বেদী-নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছে। অপরপক্ষে, বৌধায়ন ও আপস্তম্বে নানা প্রকার অগ্নি-নির্মাণের বিবরণ আছে। এর কারণ সম্বন্ধে নরেন্দ্র-কুমার মজুমদার তাঁর "Mānava Sūlba Sūtram" প্রবন্ধে বলেছেন মানব শুল্বসূত্রের ব্যবহার সম্ভবত অনগ্নিক-যজ্ঞ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং অন্য দুটি আগ্নিক-যজ্ঞ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত-ভাষ্য থেকেও এই মত সমর্থিত হয়। তিনি বলেছেন, "যাঁহারা ঋগ্বেদী—ঋগ্বেদানুসারে যজ্ঞকারী, তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রে সকল বিকারে অনুস্যূত, জগৎ-কারণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা যজুর্বেদী, তাঁহারা যাবতীয় অগ্নির মধ্যে এই ব্রহ্ম-সত্তাকেই উপাসনা করেন। যাঁহারা সামবেদী, তাঁহারাও মহাব্রত নামক যজ্ঞে এই ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন।"

পরিভাষা খণ্ডে পরিমাপের জন্য রজ্জু ও শঙ্কুর বর্ণনা আছে। অন্য কোন শুল্বগ্রন্থে এরূপ দেখা যায় না। 'পূর্ব-পশ্চিম-রেখা' নির্ণয় সব ধরনের বেদী ও অগ্নি নির্মাণের ভিত্তি-স্বরূপ। মানব এই রেখা নির্ণয়ের চার প্রকার পদ্ধতি দিয়েছেন। কাত্যায়নে মাত্র একটি, আর অন্য শুল্বে গুরুত্বপূর্ণ এই রেখা নির্ণয়ের কোন বর্ণনা নাই। অবশ্য প্রাথমিক এই নিয়মটি স্বতঃসিদ্ধের মতই স্পষ্ট ও সত্য বলে ধরে নেওয়ার জন্যই সম্ভবত এর বর্ণনা অন্যান্য শুল্বগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না।

।। পূর্বপশ্চিম রেখা নির্ণয় ।।

কাত্যায়ন শুল্বসূত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই রেখা নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ :—

"সমে শংকুং নিখায় শংকুসম্মিতয়া রজ্জ্বা মণ্ডলং পরিলিখ্য যত্র লেখয়োঃ শংকবগ্রচ্ছায়া নিপততি তত্র শংকু নিহন্তি সা প্রাচী।"

মানব শুল্বেও একই পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—

সামতলিক ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত অঙ্কন করে কেন্দ্রে দৃঢ়ভাবে একটি শঙ্কু স্থাপন করতে হবে। সূর্যোদয়ের সময় বৃত্তের পরিধিতে শঙ্কুর ছায়া যে বিন্দুতে পতিত হবে এবং সূর্যাস্তের সময় শঙ্কুর ছায়া বৃত্তের পরিধিস্থ যে বিন্দুতে পতিত হবে— এই উভয় বিন্দুর সংযোগ রেখাই হবে "পূর্ব-পশ্চিম-রেখা।"

।। কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য ।।

ইউক্লিডের জ্যামিতি পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ ও পাঁচটি স্বীকার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইগুলিই জ্যামিতিক প্রমাণ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি। ইউক্লিড এগুলির উপর নির্ভর করেই মোট 464টি উপপাদ্য যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। বলা বাহুল্য, আরোহ-অবরোহ পদ্ধতিতে সতর্ক যুক্তি-তর্ক-নির্ভর ইউক্লিডের জ্যামিতি। ভারতীয় ও গ্রীক জ্যামিতির পার্থক্য এখানেই। ভারতীয় গণিতে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্যের কোন উল্লেখ নাই। ভারতীয় গণিত একান্তভাবে গণিত নির্ভর। ভারতীয় জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডঃ টি. এ. সরস্বতী আম্মার মন্তব্য : "The Indian's aim was not to build up an edifice of geometry on a few self-evident axioms, but to convince the intelligent student of the validity of the theorem, so that visual demonstration was quite an accepted form of proof." ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে মনে হয়, ভারতীয় জ্যামিতি কোন প্রকারেই গ্রীসের নিকট ঋণী নয়। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আছে সাড়ে চারশ'-র মত উপপাদ্য। কিন্তু ভারতীয় গণিতে এই সংখ্যা পাঁচশ'-রও বেশী। পণ্ডগুলির মত যদি সত্য হয়,—যদি ভারতে এক হাজারেরও বেশী বৈদিক প্রতিষ্ঠান থেকে থাকে, এবং সে-সব প্রতিষ্ঠানে যদি ভিন্ন ভিন্ন শুল্বসূত্রের অধ্যয়ন হয়ে থাকে, তা হলে এই সংখ্যা যে কত বেশী হবে তা কল্পনা করে নিতে হয়। মানবের শুল্বসূত্রের মারুতি, বারুণী, সুপর্ণ-চিতি প্রভৃতির নিয়ম অন্য কোন সূত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। তা বলে এর অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতিতে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্যের কোন উল্লেখ নাই। তা বলে তাঁরা কি এ-বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন? তাঁরা কি কেবল অভিজ্ঞতা ও পরিমাপ থেকেই বেদী ও অগ্নি নির্মাণে বিভিন্ন স্বীকার্যের সহায়তা নিতেন? আজ আমাদের হাতের কাছে তেমন প্রমাণ নাই যা থেকে আমরা উপরের প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি। তবে যাঁরা সেই প্রাচীন কালে গণিতে অভূত-পূর্ব উন্নতিসাধন করেছিলেন, জটিল পাটিগাণিতিক সমস্যা, বীজগণিত ও গোলীয় ত্রিকোণমিতির ধারণা ও সূত্রাদি প্রয়োগ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি করেছিলেন, তাঁরা কোন যুক্তি-তর্কের ধার ধারতেন না, এ এক অসম্ভব কল্পনা মাত্র। শুল্বসূত্রের নানা জ্যামিতিক অঙ্কন থেকে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :—

(1) যে-কোন সরল রেখাকে যে-কোন সংখ্যক সমান অংশে বিভক্ত করা যায়।

(2) ব্যাস অঙ্কনের দ্বারা বৃত্তকে যে-কোন অংশে বিভক্ত করা যায়।

(3) আয়তক্ষেত্রের কর্ণ ক্ষেত্রটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(4) কর্ণদ্বারা আয়তক্ষেত্র চারটি অংশে বিভক্ত হয় এবং বিপরীত অংশগুলি পরস্পর সমান।

(5) রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(6) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ও ভূমির সংযোজক রেখা ত্রিভুজটিকে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত করে।

(7) একই ভূমি ও সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যবর্তী আয়তক্ষেত্র ও সামন্ত-রিকের ক্ষেত্রফল সমান।

(৮) আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।

(9) ত্রিভুজের বাহুগুলিকে সমান সংখ্যক অংশে বিভক্ত ক'রে এবং দুই-দুই হিসাবে বিন্দুগুলি শীর্ষবিন্দুর সহিত সংযোজিত ক'রে ত্রিভুজটিকে যে কোন সংখ্যক সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অংশে বিভক্ত করা যায়।

।। প্রাচীন যজ্ঞবেদীর পরিচয় ও ইতিহাস ।।

ঋগ্বেদ সংহিতায় পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে যজ্ঞ-বেদীর নির্মাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ

আছে। শ্রীরামচন্দ্রের অগস্ত্যমুনির আশ্রম গমনের সময় এবং চিত্রকূট ও পঞ্চবটীতে অবস্থানের সময় যজ্ঞ-বেদীর উল্লেখ আছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে তিন প্রকার বেদী—গার্হপত্য, আহ্বানীয় ও দক্ষিণ বেদী সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ঋগ্বেদের যুগের পূর্ববর্তী বলে স্বীকৃত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই সব বেদী-নির্মাণে বৃত্তের বর্গ ও অতিভুজের বর্গ-জনিত সমস্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং পীথাগোরাসের নামে পরিচিত উপপাদ্যটি ভারতে কমপক্ষে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত তিনপ্রকার 'নিত্য' যজ্ঞ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আরো কতকগুলি আবশ্যিক অনুষ্ঠান ছিল। যেমন,—**ইষ্টিযজ্ঞ**, **পশুযজ্ঞ** ও **সোমযজ্ঞ**। ইষ্টিযজ্ঞ ছিল দু'রকমের—**দর্শ** ও **পৌর্ণমাস**। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাখন ও ফলমূল দিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হতো।

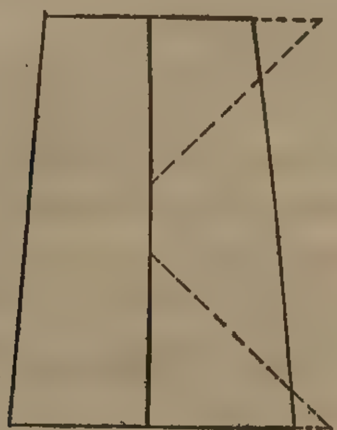

চিত্র—3 (দর্শপৌর্ণমাসিকী বেদী)

বছরে অন্তত একবার করে বর্ষাকালের যে-কোন অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় পশুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। সোম যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল খুব জাঁকজমকপূর্ণ এক বিরাট ব্যাপার। ব্যয়বহুল এই যজ্ঞানুষ্ঠান তিন-পুরুষে মাত্র একবার অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি ছিল।

কাম্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে বেদীর নাম পাওয়া যায়, তা হচ্ছে **শ্যেন-চিতি**। এই বেদীর আকার বাজপাখীর মত ছিল বলে এরকম

নামকরণ হয়েছে। কামাগ্নি নির্মাণ প্রণালী সাধারণত জটিল। তাই 'শ্যেন-চিতি' নির্মাণ প্রণালী ভীষণ জটিল।

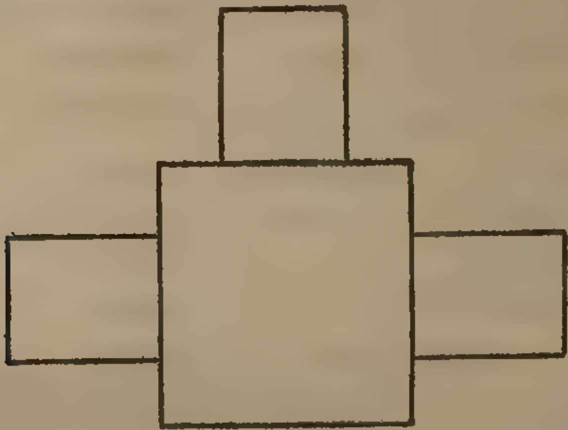

চিত্র—4 (শ্যেন-চিতি)

আর এক প্রকার বেদীর নাম ছিল বক্র-পক্ষ-ব্যস্ত-পুচ্ছ-শ্যেন। বাজপাখীর মত দেখতে এই বেদীর ডানা দুটি ছিল নিম্নমুখী এবং লেজটি ছিল বিস্তৃত।

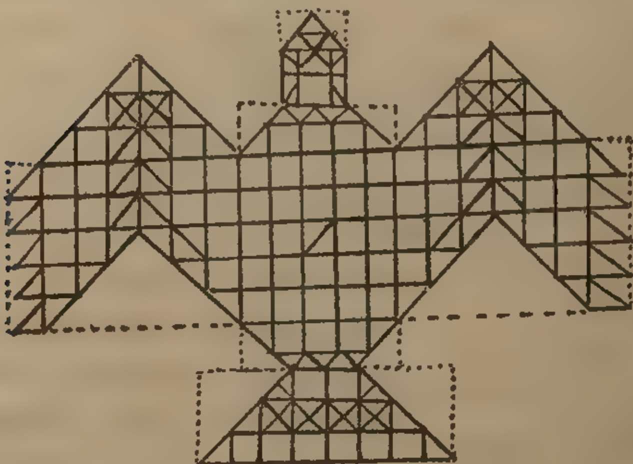

চিত্র—5 (বক্র-পক্ষ-ব্যস্ত-পুচ্ছ-শ্যেন)

কঙ্ক বেদী ছিল বকের মত দেখতে। অলজ এক প্রকার পাখীর মত, প্রউগ ছিল সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, উভয়তঃ প্রউগ ছিল রম্বসের মত। রথ-চক্র

রথের চাকার মত, দ্রোণ ছিল দোনা,—পাত্রের মত। পরিচর্য বৃত্তাকার, কূর্ম কচ্ছপের মত। একাদশিনী বেদী মহাবেদীর মত দেখতে হলেও এই বেদী মহাবেদীর এক বৃহৎ রূপ—উভয় বেদীর মধ্যে একটি সরল অনুপাত দেখতে পাওয়া যায়। 'একাদশিনী' নামকরণের তাৎপর্য এই যে এই বেদীর সম্মুখভাগে অর্থাৎ পূর্বপ্রান্তে এগারোটি 'যূপ' স্থাপনের বিধি ছিল। অশ্বমেধ বেদীও মহাবেদীর মত দেখতে। কিন্তু আয়তনে একাদশিনী বেদীর চেয়ে বড়। এই বেদীর পূর্বপ্রান্তে একুশটি যূপ স্থাপন করার বিধি। সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র যখন পুষ্পকে চড়ে অযোধ্যার নিকটবর্তী হয়েছিলেন, তখন মহাকবি কালিদাস তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় বর্ণনা দিচ্ছেন :

"জলানি যা তীরনিখাতযূপা বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্।
তুরঙ্গমেধাবভৃথাবতীর্ণৈঃ ইক্ষ্বাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি" ॥

"যে সরযুর তীরে যূপ সকল প্রোথিত রহিয়াছে ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের অশ্বমেধ যজ্ঞান্ত স্নান দ্বারা যে সরযুর জল পবিত্রতর হইয়া রাজধানী অযোধ্যার নিকট দিয়া বহিয়া চলিয়াছে।"

অশ্বমেধ যজ্ঞে যূপের প্রচলন সম্পর্কে রঘুবংশের শ্লোকটি আমাদের কিছু ধারণা বহন করে বলে উদ্ধৃত হলো।

।। কয়েকটি যজ্ঞবেদীর জ্যামিতিক পরিচয় ।।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতি গ্রীক জ্যামিতির মত যুক্তি-তর্ক-নির্ভর নয়। তাই, যজ্ঞবেদীর জ্যামিতিক পরিচয়ে আমরা তার গাণিতিক দিকটির পরিচয় বেশী করে পাই। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-চর্চা উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। কেবল, জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান নয়—সব জ্ঞানের সর্বশেষ লক্ষ্যটি ছিল ব্রহ্মদর্শন। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান তাই ছিল প্রয়োজন-ভিত্তিক। জ্যামিতি চর্চাও এই নিয়ম-বিধি বহির্ভূত ছিল না।

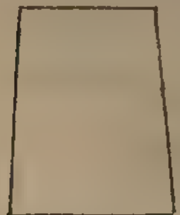

চিত্র—6 (মহাবেদী)

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তিন বেদী—গার্হপত্য,আহবনীয় ও দক্ষিণের মধ্যে আকারে প্রভেদ থাকলেও আয়তনে কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক প্রকার বেদীর ক্ষেত্রফল ছিল নির্দিষ্ট এবং তা এক বর্গব্যাম। মহাবেদী বা সৌমিকী-বেদীর আকার ছিল সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম। প্রাচীন এই বেদীর সম্মুখীন বাহু 24 পদ, ভূমি 30 পদএবং উচ্চতা ছিল 36 পদ।

সৌত্রমণি-বেদীর আকারও ছিল সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম। কিন্তু ক্ষেত্রফল ছিল মহাবেদীর এক তৃতীয়াংশ। পৈতৃকী-বেদীর আকারও তাই, কিন্তু ক্ষেত্রফল সৌত্রমণি-বেদীর এক নবমাংশ। প্রাগ্-বংশ-বেদীর আকার আয়তক্ষেত্র। একাদশিনী বেদীর পূর্বপ্রান্তের দৈর্ঘ্য 10 অক্ষ 11 পদ 8 অঙ্গুলি; অশ্বমেধ-বেদীর পূর্বপ্রান্তের দৈর্ঘ্য 20 অক্ষ 21 পদ 8 অঙ্গুলি।

বেদী-নির্মাণে ইট ব্যবহার করা হতো। প্রাথমিক পর্বে বেদীতে পাঁচটি স্তর থাকত। প্রাথমিক বেদী উচ্চতায় হাঁটুর সমান,—বৈদিক পরিমাপ অনুযায়ী 32 অঙ্গুলি। প্রত্যেক ইটের আকার ও আয়তন নির্দিষ্ট ছিল। যেমন—চতুরশ্র-শ্যেন-চিতি নির্মাণে প্রত্যেকটি ইট হতো বর্গাকার এবং প্রত্যেক স্তরে 200 ইট থাকার বিধি ছিল। অবশ্য কোন কোন বেদী-নির্মাণে ইটের আকার ভিন্ন হলেও সংখ্যা সুনির্দিষ্ট রাখার বিধি ছিল।

গার্হপত্য বেদী পাঁচ স্তরে নির্মিত হতো। প্রতি স্তরে ইটের সংখ্যা 21 এবং যজ্ঞবেদীর ক্ষেত্রফল হতো এক বর্গ ব্যাম। লক্ষ্য করার বিষয়, স্তর নির্মাণে নিশ্চিত কিছু 'মশলা' ব্যবহার করা হতো এবং দুটি ইটের মধ্যেকার ফাঁক পূরণ করার বিষয়ে গণিতজ্ঞদের চিন্তার অবকাশ ছিল। বৌধায়ন এই বেদী-নির্মাণে তিন প্রকার ইট ব্যবহার করার বিষয় আলোচনা করেছেন। এদের আকার এক ব্যামের এক-ষষ্ঠাংশ, এক-চতুর্থাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ। প্রথম স্তর নির্মাণে প্রথম প্রকারের 9টি ইট, দ্বিতীয় প্রকারের 12টি ব্যবহৃত হতো; দ্বিতীয় স্তরে প্রথম প্রকারের 16 টি এবং তৃতীয় প্রকারের দুটি ইট ব্যবহৃত হতো। তৃতীয় ও পঞ্চম স্তরে প্রথম স্তরের ন্যায় ইট লাগত, আর চতুর্থ স্তরটি ছিল দ্বিতীয় স্তরের অনুরূপ।

।। পীথাগোরাসের পূর্বে ।।

অতিভুজের উপর বর্গ সম্পর্কিত উপপাদ্যটির আবিষ্কারক হিসাবে গ্রীক গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক পীথাগোরাসের সর্বাধিক পরিচিতি। কিন্তু গণিত ইতিহাসকারগণ ঐ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পীথাগোরাসের উপপাদ্যের যে প্রমাণটি পড়ে, সেটিও তাঁর নয়। খুব সম্ভব, এই প্রমাণটির কৃতিত্ব ইউক্লিডের প্রাপ্য। সে যা হোক,—ভারতে ঋগ্বেদের যুগের পূর্বেও এই উপপাদ্যটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। শুধু ভারতে কেন,—পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যদেশেই এই উপপাদ্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে এই উপপাদ্যটি '**কর্ণের উপর বর্গ**' নামে খ্যাত। অতি প্রাচীন দক্ষিণ বেদী নির্মাণে

এই উপপাদ্যের সাহায্য অপরিহার্য। তা ছাড়া আরো নানা ধরণের বেদী নির্মাণে এই উপপাদ্যের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

বৌধায়ন শুল্বসূত্রে উপপাদ্যটির বর্ণনা এইভাবে পাওয়া যায় :—

> "দীর্ঘচতুরশ্রস্যা ক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমাণী তির্যঙ্ মাণী
> চ যৎপৃথগ্ ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি"—

—আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যাহা (ক্ষেত্রফল) পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন করে তাহা (ক্ষেত্রফল) উহার কর্ণ উৎপন্ন করে।

সহজ ও সরল ভাষায় আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ক্ষেত্রফল একত্রে উহার কর্ণের ক্ষেত্রফলের সমান।

দুঃখের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্যটির বর্ণনা শুল্বসূত্রে থাকলেও এর কোন প্রমাণের উল্লেখ নাই। থিবো, বুর্ক ও ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত এই উপপাদ্যটির তখনকার প্রচলিত প্রমাণই সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এই উপপাদ্যের নিশ্চয় প্রমাণ ছিল। এর বহুল প্রচার ও প্রয়োগই সম্ভবতঃ শুল্বকারদের লিখে রাখার প্রেরণা দেয়নি। বৌধায়ন এর গাণিতিক দিকটির উল্লেখ করে বলেছেন, এর সত্যতা উপলব্ধি হবে 3 ও 4 একক, 12 ও 5 একক, 15 ও 8 একক, 7 ও 24 একক এবং 15 ও 26 একক বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের বেলায়। আমরা জানি, $3^2+4^2=5^2$; $12^2+5^2=13^2$ প্রভৃতি। আয়তক্ষেত্রের কর্ণ 5 একক হলে তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 4 ও 3 একক হবে। সুতরাং কর্ণের উপর বর্গ সম্পর্কিত উপপাদ্যটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তা ছাড়া শুল্বসূত্রে এর প্রমাণ থাকার কথাও নয়। যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদী-নির্মাণ, সেখানে সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণই বা থাকবে কেন? এই প্রসঙ্গে ডঃ টি. এ. সরস্বতী আম্মার মতটি উল্লেখযোগ্য : "To speculate on whether the Indians have a proof for the theorem or what the proof could have been is idle. The Śulbasūtras, our only means of knowing what the condition of mathematics then was in India, are only practical manuals for the construction of the altars. Proofs are outside their scope. Very likely they had proofs orally transmitted to the enquiring student."

বুর্কের মতে এই উপপাদ্যটির প্রমাণে প্রাচীন শুল্বকারগণ হয়তো কর্ণ ও অন্য

বাহু দুটিকে একক বর্গে পরিণত করে গণনার দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণ করতেন। নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে।

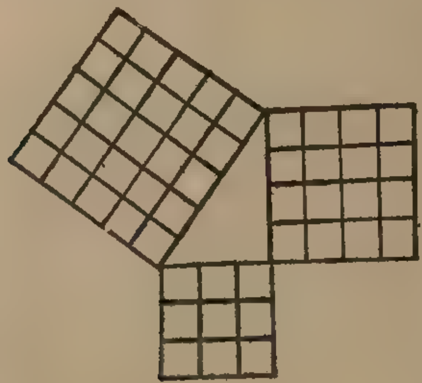

চিত্র—7

।। বৃত্তের বর্গ-রূপ ও π (পাই)-এর মান ।।

কোন বৃত্তের সমান বর্গক্ষেত্র ও কোন বর্গক্ষেত্রের সমান বৃত্তাঙ্কনের ইতিহাস খুব প্রাচীন। গ্রীক গণিতে যে তিনটি সমস্যা দীর্ঘদিন অসমাধানিত ছিল, এটি তার মধ্যে একটি। প্রকৃত কাল-নির্ণয় করা না গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সমস্যাটির সমাধান প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অন্তত তিন হাজার বছর পূর্বে করেছিলেন। গার্হপত্য, আহ্বানীয় ও দক্ষিণ বেদী-নির্মাণ এই সমস্যার সমাধান না হলে সম্ভব হতো না। তা ছাড়াও অন্যান্য বেদী শ্মশান-চিৎ, রথচক্র-চিৎ, পরিচর্য-চিৎ, দ্রোণ-চিৎ প্রভৃতি নির্মাণে এর প্রয়োগ আছে।

বৌধায়ন শুল্বসূত্রে সম্পাদ্যটি নিম্নরূপে উল্লিখিত আছে: "যদি তুমি বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন করিতে চাও তাহা হইলে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে উহার কর্ণের অর্ধ পরিমাণ ব্যাসার্ধ লইয়া পূর্ব-পশ্চিম বরাবর রেখা স্পর্শ করিয়া বৃত্তাঙ্কন কর। অতঃপর বর্গক্ষেত্রের বহিঃস্থ রেখার এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ব্যাসার্ধ লইয়া বৃত্তাঙ্কন কর।"

ABCD একটি বর্গক্ষেত্র, O কেন্দ্র (কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু)। OA সংযুক্ত করা হলো। O-কে কেন্দ্র করে OA ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তাঙ্কন করা হলো। এই বৃত্ত পূর্ব-পশ্চিম বরাবর রেখা EW-কে P বিন্দুতে ছেদ করল। PR-কে এমন ভাবে ভাগ

করা হলো যেন $QR=\frac{1}{3}PR$ হয়। এবার O-কে কেন্দ্র করে OQ ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তাঙ্কন করলে তা প্রায় ABCD বর্গক্ষেত্রের সমান হবে।

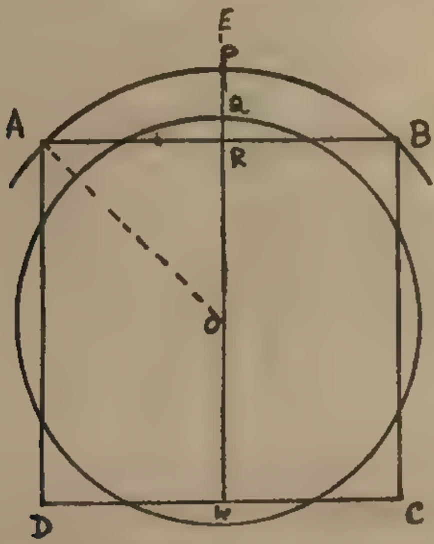

চিত্র—৪

শুল্বসূত্রে π-এর মান সম্পর্কে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু নানান জ্যামিতিক অঙ্কন থেকে প্রমাণিত হয় প্রাচীন কালে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা বৃত্তের পরিসীমা ও ব্যাসের অনুপাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। আমরা জানি, r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল πr^2। সুতরাং বৃত্তাকার কোন যজ্ঞবেদীর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে π-এর মান নির্ণয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

উপরের চিত্রে $AB=2a$ হলে, $OQ=\frac{a}{3}(2+\sqrt{2})$

অতএব $\pi=18(3-2\sqrt{2})$। এখানে π-এর মান 3·088। π-এর মানটি নির্ভুল নয়, স্থূল মান। যজ্ঞবেদী নির্মাণে এই মান যথেষ্ট বলে গণ্য হতো মনে হয়।

॥ শুল্বসূত্রে একক ॥

এককের প্রয়োজনীয়তার কথা না বললেও চলে। আধুনিক বিজ্ঞানে কত প্রকারের এককই না প্রচলিত আছে। এ-সবই সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য। প্রাচীন

যুগে ভারতীয় গণিতজ্ঞরাও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সঠিক পরিমাপ করার জন্য নানা প্রকার একক আবিষ্কার করেছিলেন। এককগুলির নাম থেকে মনে হয় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যেমন,—‘পুরুষ’ একক সম্বন্ধে মহাবীর বর্ধমানের সংসার ত্যাগের মুহূর্তের এক বিবরণ পাওয়া যায়। ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে আছে,—“সেই কালে সেই সময়ে (মহাবীর) হেমন্তের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাভিমুখিনী ছায়ার এক “পৌরুষী” পরিপূর্ণ হইলে সুব্রত নামক দিবসে বিজয় নামক মুহূর্তে চন্দ্রপ্রভা নামক শিবিকায় আরোহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।” এক পৌরুষী বা পুরুষ সমান সাড়ে তিন হাত বা পুরুষের দৈর্ঘ্যের সমান বা ঊর্ধ্ববাহু পুরুষের দৈর্ঘ্যের সমান বলা হয়েছে। আঙ্গুলি, পদ, ব্যাম প্রভৃতি এককগুলি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সূচিত করে। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো :

$5\frac{5}{8}$ অঙ্গুলি $=1$ পদ $=1$ প্রক্রম

12 অঙ্গুলি $=1$ প্রাদেশ

24 অঙ্গুলি $=1$ অরত্নি $=1$ হাত $=18$ ইঞ্চি $=1$শম্য

96 অঙ্গুলি $=1$ ব্যাম $=1$ পিশিল

104 অঙ্গুলি $=1$ অক্ষ

120 অঙ্গুলি $=1$ পুরুষ

5 শম্য বা হাত $=1$ পুরুষ

8 যব $=1$ অঙ্গুলি

1 প্রক্রম $=2$ পদ (ইষ্টি যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

$=3$ পদ (পৌষ যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

$=2\frac{1}{2}$ পদ (সোম যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

$=5$ পদ (সাগ্নিক যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

এই এককগুলির কোন সর্বভারতীয় রূপ ছিল কিনা বলা যায় না। মনে হয় অঞ্চলভেদে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল।

॥ শুল্বসূত্রে গণিত ॥

ভারতীয় গণিতজ্ঞরা যুক্তি-তর্কের ভাষাগত দিকটির প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করেননি। গণিতে যে দিকটির প্রতি তাঁরা বিশেষ আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন, সে দিকটি হচ্ছে জটিল গাণিতিক পথ। সম্ভবত এই কারণেই শুল্বকারগণ

সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলিকে মূলদ রাশির দ্বারা প্রকাশ করেছেন। a, b ও c সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহু হলে এদের সম্পর্ক $a^2+b^2=c^2$ —এই সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। শুল্বসূত্রে এই সমীকরণের কোন সাধারণ বীজ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে ওই সমীকরণের ধর্মটি প্রযুক্ত হয়েছে। শুল্বসূত্রে নিম্নরূপ বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের উদাহরণ পাওয়া যায় :—

(1) $a=3,\ b=4,\ c=5$

(2) $a=5,\ b=12,\ c=13$

(3) $a=7,\ b=24,\ c=25$

(4) $a=8,\ b=15,\ c=17$

(5) $a=12\ \ b=35,\ c=37$

সৌত্রমণি বেদীতে $5\sqrt{3}$, $12\sqrt{3}$, $13\sqrt{3}$ এবং অশ্বমেধ বেদী নির্মাণে $15\sqrt{2}$, $36\sqrt{2}$ এবং $39\sqrt{2}$ বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজাঙ্কনের পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ অমূলদ রাশি ॥

শুল্বসূত্রে অমূলদ রাশির পরিচয়ও পাওয়া যায়। কোন বিশেষ প্রকার বেদীর বৃহত্তীকরণ থেকেই অমূলদ রাশির ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছিল। যেমন,—সৌত্রমণি বেদী ত্রিভুজাকার ; কিন্তু এই বেদীর ক্ষেত্রফল 5, 12, 13 বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের তিনগুণ।

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ প্রভৃতি অমূলদরাশিকে শুল্বসূত্রে 'করণী' বলা হয়েছে। $\sqrt{2}=$ দ্বিকরণী, $\sqrt{3}=$ ত্রি-করণী, $\frac{1}{\sqrt{3}}=$ তৃতীয় করণী, $\frac{1}{\sqrt{}}=$ সপ্তম করণী।

বিভিন্ন যজ্ঞবেদীর ক্ষেত্রফল নির্ণয় থেকে করণী সংক্রান্ত নানা প্রক্রিয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়নের শুল্বসূত্রে দ্বি-করণী ($\sqrt{2}$)-এর আসন্ন মান পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকালে করণীর আসন্ন মান নির্ণয় গণিতের ইতিহাসে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে।

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{3.4.34}$$

এখানে, $\sqrt{2}=1{\cdot}4142156$; $\sqrt{2}$-এর সঠিক মান $1{\cdot}4142$। কিন্তু কোন্ পদ্ধতি অবলম্বনে প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত

করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার কোন ইঙ্গিত শুল্বসূত্রে নাই। অবশ্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। দ্বি-করণীর আসন্ন মান নির্ণয়ে সম্ভাব্য একটি পদ্ধতি বিবৃত করা হলো।

একক বাহুবিশিষ্ট দুটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে একটিকে তিনটি সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত করে প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে 1 ও 2 দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। তৃতীয় আয়তক্ষেত্রকে তিনটি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করে প্রথমটিকে 3 দ্বারা এবং অপর দুটিকে সমান চারটি করে অংশে বিভক্ত করে 4, 5, 6, 7, এবং 8, 9, 10, 11 দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। এই এগারোটি খণ্ডকে নিম্নরূপ চিত্রের ন্যায় অপর বর্গক্ষেত্রে সংযোজিত করা হলো।

চিত্র—9

এরকম করার ফলে একটি নতুন ক্ষেত্র পাওয়া যাবে যার চিহ্নিত ছোট্ট বর্গক্ষেত্রটির জন্যই সমগ্র ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র হতে পারবে না। এখন নতুন ক্ষেত্রের বাহুর পরিমাপ $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3 \cdot 4}$ এবং চিহ্নিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে নবতম বর্গক্ষেত্রটি প্রথমে নেওয়া বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা $\left(\frac{1}{3.4}\right)^2$ অধিক।

যদি 4 থেকে 11 পর্যন্ত ছোট খণ্ডগুলির বিস্তার x হয়, তা হলে,

$$2x\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}\right)-x^2=\left(\frac{1}{3.4}\right)^2$$

বা, $x=\frac{1}{3.4.34}$ [x^2 উপেক্ষা করে]

প্রত্যেক বর্গক্ষেত্রের কর্ণ $\sqrt{2}$ সুতরাং $\sqrt{2}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{3.4.34}$

বর্তমানে একজন পাশ্চাত্য গবেষক করণীর এই আসন্ন মান নির্ণয়ের কৃতিত্ব ব্যবিলনীয়দের প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেছেন। দ্বি-করণীর আসন্ন মান নির্ণয় ব্যবিলনে বহু শতাব্দী পূর্বে হয়েছিল সত্য, কিন্তু কেবল প্রাচীনত্বই অন্যান্য দেশের মৌলিকতা বিনষ্ট করে না।

আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সর্বপ্রথম অমূলদ রাশি ব্যবহার করেন। অবশ্য গ্রীসেও অমূলদ রাশির প্রচলন ছিল। কিন্তু $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি অমূলদ রাশির মূলদ রাশিতে আসন্ন মান প্রকাশ করার কোন পদ্ধতি তাঁরা জানতেন না। অমূলদ রাশি দ্বারা পাটীগাণিতিক সমস্যার সমাধান পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। পীথাগোরাস প্রথম এই রাশির ব্যবহার করলেও একথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে শুল্বকারগণ তাঁর বহু বহু শতাব্দী পূর্ববর্তী। অমূলদ রাশির ধারণা ও এ-সম্পর্কীয় তত্ত্ব অতি আধুনিক,—ডেডিকিণ্ড, ক্যান্টর প্রভৃতি গণিতজ্ঞদের অবদান। আমরা গর্ব করতে পারি এই বলে যে, অন্তত তিন হাজার বছর পূর্বে আমাদের দেশের গণিতজ্ঞরা এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও গণিতের সর্বক্ষেত্রে তার ব্যবহার করেছিলেন।

।। ক্ষেত্রফল ও আয়তন ।।

শুল্বসূত্রে জ্যামিতিক ক্ষেত্রফল এবং সামতলিক ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তনের সূত্র পাওয়া যায়।

(1) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

(2) সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল $=$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

(3) ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি $\times$ উচ্চতা

(4) চোঙের ক্ষেত্রফল $=$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

।। শুল্বসূত্রের ভাষ্যকারগণ ।।

শুল্বসূত্রের অনেক ভাষ্য আছে,—এমন কি একই শুল্বসূত্রের একাধিক ভাষ্যও আছে। কিন্তু এ-সব গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় এক অসম্ভব ব্যাপার। নিম্নে কয়েকজন ভাষ্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

।। বৌধায়ন শুল্বসূত্র ।।

এই সূত্রগ্রন্থে দু'জন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যায়,—দ্বারকানাথ ও ভেঙ্কটেশ্বর। দ্বারকানাথের শুল্ব-ভাষ্যটির নাম শুল্ব-দীপিকা। প্রথম আর্যভটের গ্রন্থ থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অনুমিত হয় তিনি আর্যভটের পরবর্তী কোন

সময়ে বর্তমান ছিলেন। শুল্বসূত্রের বর্গের বৃত্তরূপ ও এর বিপরীত প্রতিজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত ফলের সমালোচনা করে উদাহরণের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে আর্যভটের ফল অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও নির্ভুল। শুল্বসূত্রে π-এর মান নির্ণয়ের সূত্র সংশোধিত করে দ্বারকানাথ নিম্নরূপ সূত্রটি দিয়েছেন :—

$r=\left\{ a+\frac{a}{3}(\sqrt{2}-1) \right\} \left(1-\frac{1}{18}\right)$ এই সূত্র থেকে

$\pi=3{\cdot}141109....$পাওয়া যায়।

ভেঙ্কটেশ্বর দীক্ষিতের ভাষ্য গ্রন্থের নাম **শুল্ব-মীমাংসা**। তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

॥ কাত্যায়ন শুল্বসূত্র ॥

এখানেও দু'জন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যায়,—রাম বা রামচন্দ্র ও মহীধর। রামচন্দ্রের ভাষ্যের নাম **শুল্ব-সূত্র-বৃত্তি** এবং মহীধরের ভাষ্যের নাম **শুল্ব-সূত্র-বিবরণ**। বর্তমান লক্ষ্ণৌ-এর নিকটবর্তী নৈমিশবাসী রামচন্দ্রের গ্রন্থে শ্রীধরাচার্যের ত্রিশতিকার উদ্ধৃতি আছে, যদিও তাঁর গ্রন্থে সমকোণী ত্রিভুজাঙ্কনের এক নতুন পদ্ধতি আছে। তা হলেও তাঁর কৃতিত্ব অন্যত্র। $\sqrt{2}$-এর সপ্তম দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুল মান নির্ণয়ের জন্যই তিনি বিখ্যাত।

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{3.4.34}-\frac{1}{3.4.34.33}+\frac{1}{3.4.34.34}$$

অর্থাৎ $\sqrt{2}=1{\cdot}414213502$। অনুমিত হয় রামচন্দ্র হয়তো শুল্বকার কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি জানতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ কোন ইঙ্গিত দেননি।

মহীধরের রচনাকার্য 1589 খ্রীস্টাব্দ বলে জানতে পারা যায়। তাঁর ভাষ্যটি রামচন্দ্রের ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি অন্যান্য বিষয়ের উপর সতেরোখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ আপস্তম্ব শুল্বসূত্র ॥

এই গ্রন্থের ভাষ্যকারের সংখ্যা সর্বাধিক। চারজন বিখ্যাত ভাষ্যকার গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এঁদের মধ্যে গার্গ্য নৃসিংহ সোমসুতের পুত্র গোপালনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর গ্রন্থের নাম **আপস্তম্বীয়-শুল্ব-ভাষ্য**।

অরবিন্দ স্বামী আপস্তম্বের শ্রৌতসূত্রেরও ভাষ্য রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি

আর্যভটের পরবর্তী। তাঁর রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা না গেলেও তিনি পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তিনি বৃত্তচাপের ক্ষেত্রফলের যে সূত্র দিয়েছেন তা কোন গণিত গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল শ্রীধরাচার্যের পর এই সূত্রটি আরো সূক্ষ্ম ও শুদ্ধরূপে দেখতে পাওয়া যায়। এর ভাষ্য গ্রন্থের নাম শুল্ব প্রদীপিকা।

কপর্দিস্বামীর ভাষ্যগ্রন্থের নাম শুল্ব-ব্যাখ্যা। ইনি সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। গণিতজ্ঞ শূলপাণি, হেমাদ্রি ও নীলকণ্ঠ এঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শূলপানির রচনাকাল মোটামুটি 1150 খ্রীস্টাব্দ এবং হেমাদ্রি দেবগিরির রাজা মহাদেবের (1260—71) মন্ত্রী ছিলেন।

সুন্দররাজ সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদে বর্তমান ছিলেন। শুল্ব-প্রদীপ এঁর রচিত গ্রন্থ। ইনি দ্বারকানাথের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

।। মানব শুল্ব সূত্র ।।

বারানসীর বাসিন্দা নারদের পুত্র শিবদাস হচ্ছেন এই শুল্বসূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার। শিবদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্করভট্ট ছিলেন মৈত্রায়ণী শুল্বের ভাষ্যকার। উভয় ভ্রাতার গ্রন্থে রামচন্দ্রের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। শিবদাস দ্বিতীয় ভাস্করের গ্রন্থ থেকে ত্রৈরাশিক নিয়মটি উদ্ধৃত করেছেন। বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্যের উদ্ধৃতি তাঁর গ্রন্থে থাকায় তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী বলে অনুমিত হন। শুল্বপাঠ সম্বন্ধে শিবদাসের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন গণিত-পাঠ সমাপ্ত করে শুল্বপাঠ করা উচিত। অন্যথায় শুল্বে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক যুগের গণিত সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। কিন্তু এ-যুগের বিপুলায়তন গ্রন্থাদির আলোচনা ও বিক্ষিপ্ত গাণিতিক তথ্যাদি পরিবেশন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। লেখক অকপটে তাঁর সীমিত জ্ঞান স্বীকার করে পরবর্তী কোন সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অপেক্ষা করছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

"The transfer of a mathematical way of thought to the rest of our intellectual effort is in a sense, an application of mathematics. Precise numerical answer is not usually required and may not even be consistent with the input and output structure of a model."

Cambridge Report.

লেখন ও প্রাচীন সংখ্যা

ভারতবর্ষে কবে লিখিতরূপের আবিষ্কার হয়েছিল আজ আর তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব বলে মনে হয় না। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপি হচ্ছে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি। খরোষ্ঠী লিপির বিদেশী উৎস সম্পর্কে মতভেদ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য মনীষী এই লিপির বিদেশী উৎসে বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন ব্রাহ্মী লিপির উৎস হচ্ছে সেমীয়-লিপি। সে যা হোক, এই লিপির প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে, অশোকের সময় কালের। এখন প্রশ্ন,—ভারতে কি তাহলে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে কোন লিপির প্রচলন ছিল না? পণ্ডিতরা বলেন বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে লিখিত রূপের প্রচলন ছিল। বশিষ্ট ধর্মসূত্রে এর ইঙ্গিত আছে। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটি অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ—ঋগ্বেদে 'আট' সংখ্যাটির উল্লেখ আছে। "সহস্রাণি দদাতো অষ্টকর্ণ্যাঃ"—'কর্ণে অষ্ট-চিহ্নিত এক হাজার গাভী আমাকে দাও।" ঋগ্বেদের এই উদ্ধৃতিটি তখনকার যুগে সংখ্যার লিখিতরূপ নির্দেশ করে। এখনো পল্লীগ্রামে গোরুর কানে ও শরীরের অন্য অংশে লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়ে চিহ্ন দেওয়ার রীতি আছে। অবশ্য যদিও অন্য কারণে দেওয়া হয়, তবুও এর মধ্যে আমরা সেই সুপ্রাচীন ঋগ্বেদীয় ঐতিহ্যের ও রীতির অনুবর্তন দেখতে পাই। এছাড়াও বৈদিক যুগে যে লেখার প্রচলন ছিল ঋগ্বেদে তার অনেক প্রমাণ আছে। এ-প্রসঙ্গে স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির **Vedic Culture** গ্রন্থ থেকে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হলো : **It is suggested by many persons that in the Vedic**

Age the art of writing was unknown; hence the Vedas were committed to memory and thus handed down orally from generation to generation but Riks 6.53.7 and 8 clearly refer to the existence of a script, vide "Ārikha kikira krinu". Letters of the alphabet are mentioned in Rik 10. 13. 3. Rik 10. 71 sukta is about the learning of lauguages and the knowledge Absolute." সপ্তম খ্রীস্টপূর্বাব্দের পাণিনির ব্যাকরণে 'যবনানি' 'লিপিকার' 'লিবিকার' শব্দগুলিও সেকালে লেখার প্রচলনের সাক্ষ্য দেয়।

বর্তমানে ব্রাহ্মীলিপির বিদেশী উৎস স্বীকার করা হয়না। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত শীলমোহর ও প্রস্তুলিপি তিন হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দে ভারতে প্রচলিত লিখিত রূপের সাক্ষ্য বহন করে বলে মনে করা হয়।

॥ প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা ॥

প্রথম অধ্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহর ও প্রস্তুলিপিতে সংখ্যার কথা আলোচিত হয়েছে। সিন্ধু-লিপিতে এক থেকে বারো অথবা তেরো পর্যন্ত সংখ্যার নমুনা পাওয়া গেলেও, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ প্রভৃতি বড় বড় সংখ্যা তাঁরা কেমনভাবে লিখতেন, তার কোন পরিচয় আমাদের জানা নাই। সিন্ধুসভ্যতা থেকে অশোকের সময় পর্যন্ত প্রায় 2700 বছরের ব্যবধান। সুদীর্ঘ এই মধ্যবর্তী সময়কার কোন লিখিত রূপের আবিষ্কার আজও সম্ভব হয়নি। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাই অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে এ-দেশে লিখিতরূপের প্রচলন ছিলনা। কিন্তু তা না মানার যথেষ্ট কারণ আছে।

॥ ব্রাহ্মীলিপির ভারতীয় উৎস ॥

বিদেশী নানা প্রাচীন লিপির সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অধিকাংশই ব্রাহ্মীলিপির বিদেশী উৎস সমর্থন করেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যের জন্যই এই মতবাদ স্বীকার করা যায় না। এই সম্পর্কে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজীর মতবাদটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর মতে চার হাজার বছর পূর্বে ভারতীয়রা লেখা-শিল্পে পারঙ্গম ছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব দু' হাজার বছর পূর্বে ভারতীয়রা 10^{9} সংখ্যাটির ব্যবহার করেছেন, আবার 10^{53} পর্যন্ত সংখ্যার নামকরণও দেখতে পাওয়া যায়। এ-সব থেকে প্রমাণিত হয় যে ভারতে অতি

প্রাচীনকালে পাটীগণিতের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছিল। লিখিত রূপের প্রচলন না থাকলে এটা যে সম্ভব নয়, এ-অনুমান অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন সব ধর্মগ্রন্থেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সংখ্যা লিখন ও ব্রাহ্মীলিপির জনক বলে অভিহিত হয়েছেন। ব্রাহ্মী শব্দের মধ্যে ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের সম্পর্ক থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

॥ খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপিতে সংখ্যা ॥

সম্রাট অশোক ও তাঁর পরবর্তীকালের অধিকাংশ প্রত্নলিপিই দু'প্রকার লিপিতে লেখা,—খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপির বিস্তার কাল খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। সম্রাট অশোকের খরোষ্ঠী প্রত্নলিপিতে মাত্র চারটি সংখ্যা পাওয়া যায়। উল্লম্ব রেখার দ্বারা এখানে সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে:

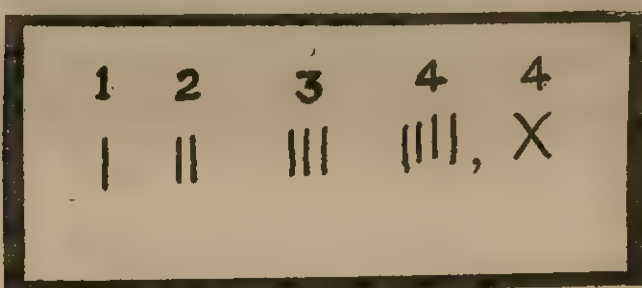

চিত্র—10 খরোষ্ঠী লিপি

শক, পার্থিয়ান ও কুষাণ-যুগে আরো উন্নত ধরনের সংখ্যা ব্যবহার দেখা যায়:

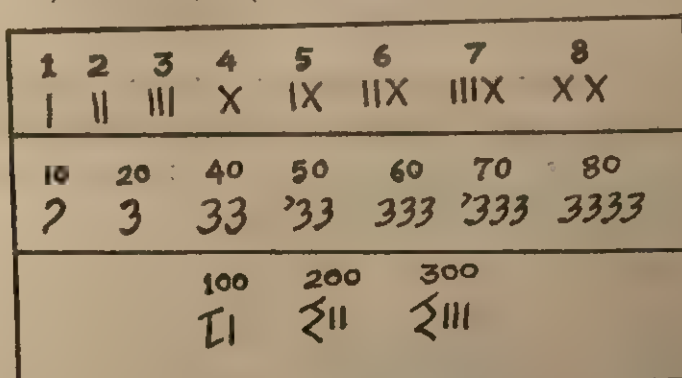

চিত্র—11 শক-পার্থিয়ান-কুষাণ যুগের সংখ্যা

এখানে সংখ্যার ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষণীয়। অশোকের প্রত্নলিপিতে

যেখানে 4 সংখ্যাটি চারটি উলম্ব রেখার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল, শক-পার্থিয়ান যুগে সেই সংখ্যাটি ক্রশ-চিহ্ন (+) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। চারটি উলম্ব রেখার ক্রশ-চিহ্নে রূপান্তরের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ জানতে পারা যায় না। হয়তো চার দিক নির্দেশের মধ্যে চার-এর ইঙ্গিত আছে, বা সহজ সরলীকরণ। চার সংখ্যার পর যোগের নিয়ম অনুসৃত হয়েছে আট পর্যন্ত। কিন্তু 'নয়' কেমন ছিল তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যোগের নিয়মটি 'নয়' পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছিল। তা হলে এই সংখ্যাটি 1xx-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকবে। অবশ্য এ-সবই অনুমান। হয় তো 'নয়' সংখ্যার জন্য কোন পৃথক চিহ্ন থাকতেও পারে।

ভারতে ব্রাহ্মীলিপির বহুল প্রচলন ছিল, আর এই লিপি থেকেই বর্তমানের ভারতীয় লিপিসমূহের উদ্ভব। এই লিপির অতি প্রাচীন নিদর্শন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। নিম্নের লিপিগুলি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর :

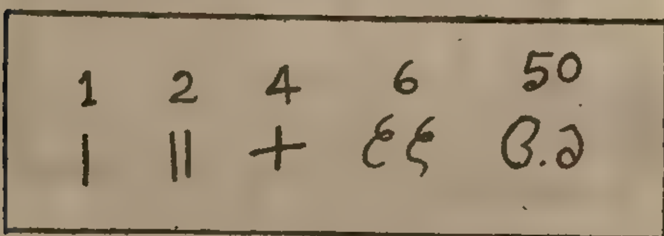

চিত্র—12 খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মীসংখ্যা

এরপর প্রাচীন সংখ্যার নিদর্শন মধ্যভারতের নানাঘাট পর্বতে পাওয়া যায়। সাতবাহন বংশের রাজা বেদিশ্রী কর্তৃক পথিকদের বিশ্রামের জন্য এই পর্বতগাত্রে একটি গুহা নির্মিত হয়। এখানকার শিলালিপিতে বিভিন্ন যজ্ঞে প্রদত্ত উপহার সামগ্রীর তালিকা আছে। নানাঘাট সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ :

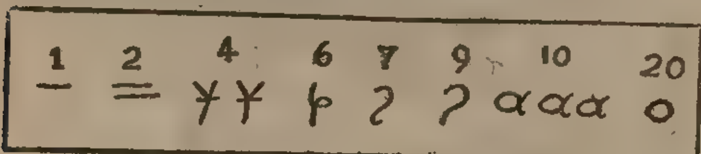

চিত্র—13 নানাঘাট সংখ্যা

বোম্বাই-এর নাসিক জেলায় প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ :

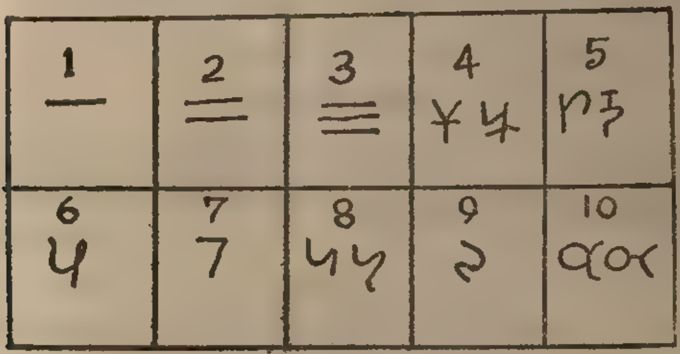

চিত্র—14 নাসিক সংখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়

"The history of mathematics is important also as a valuable contribution to the history of civilization··· Mathematical and physical researches are a reliable record of intellectual progress."

—F. Cajori

জৈন গণিত

জৈন ধর্মে গণিতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গণিতানুশীলন পরিগণিত হতো। জৈন ধর্মের সর্ব প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব বাহাত্তর কলার প্রধান হিসাবে গণিতের নাম উল্লেখ করেছেন। অরিষ্টনেমী ও মহাবীর বর্ধমানের শিক্ষা-সূচীতে গণিতের নাম পাওয়া যায়, অবতারণায় আমরা এ-সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গণিতের প্রতি জৈনদের আগ্রহ, উৎসাহ ও আকর্ষণ থাকলেও, এমন কি জ্ঞানের এই শাখায় তাঁদের মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার থাকলেও, আজ আর সে-সবের পৃথক কোন গ্রন্থ নাই। জৈন ধর্মাবলম্বী মহাবীরের ন্যায় কোন গণিত গ্রন্থ আর কোন জৈনদের দ্বারা লিখিত হয়নি, অথবা লিখিত হলেও তা কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। জৈনদের গণিত সম্পর্কে আকর্ষণ ও গাণিতিক উপাদান তাঁদের বিশাল আগম শাস্ত্রাদিতে ছড়িয়ে আছে। গণিতজ্ঞ মহাবীরের বিবৃতি থেকে জানতে পারা যায় যে, তাঁর **গণিত-সার-সংগ্রহ** একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। তাঁর পূর্ববর্তী মহান ঋষিরা যে অসীম গাণিতিক জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, তিনি সেখান থেকেই তাঁর গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না এক সময় জৈন আচার্যরা বিশাল গাণিতিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং হয়তো এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন।

॥ সংখ্যাতত্ত্ব ॥

জৈন গণিতে সংখ্যা তিন ভাগে বিভক্ত: (1) **সংখ্যাত** বা **সংখ্যেয়**, (2) **অসংখ্যাত** বা **অসংখ্যেয়** এবং (3) **অনন্ত**। যে সংখ্যা অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা যায় তা-ই সংখ্যাত বা সংখ্যেয়। একক থেকে আরম্ভ করে আঠাশটি অঙ্ক

নিয়ে যে সংখ্যা হয় তা সংখ্যাত বা সংখ্যেয়। এর অতিরিক্ত সংখ্যাকে অসংখ্যাত বা অসংখ্যেয় বলা হয়। অসংখ্যেয় সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না,—উপমা দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। যেমন, **পল্যোপম ও সাগরোপম।** কিন্তু অসংখ্যাত বা অসংখ্যেয় অনন্ত বা অসীম নয়। অসংখ্যেয় সীমার অন্তর্গত। যখন কোন সংখ্যা সীমার অতিরিক্ত, তখন তাকে আর উপমার দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না,—তখন অনন্ত সংখ্যার আবির্ভাব। সংখ্যাত, অসংখ্যাত ও অনন্তের আবার তিন প্রকার করে বিভাগ আছে,—**জঘন্য, অধম ও উৎকৃষ্ট।** তিন প্রকার সংখ্যার আবার কোন কোনটির প্রবিভাগ আছে।

অনন্ত পাঁচ প্রকার: (1) **একতো অনন্তং** (2) **দ্বিধানন্তং** (3) **দেশবিস্তারনন্তং** (4) **সর্ববিস্তারনন্তং** (5) **শাশ্বতানন্তং।**

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে 'অনেগবাসাণউয়া' বা নবযুতবর্ষের উল্লেখ আছে। টীকাকারের মতে নবযুতবর্ষের তাৎপর্য হচ্ছে অসংখ্য বৎসর। কারণ, চুরাশী লক্ষ বৎসরে এক **পূর্বাঙ্গ**; এই পূর্বাঙ্গকে চুরাশী লক্ষ দিয়ে গুণ করিলে এক **পূর্ব** হয়। পূর্বকে চুরাশী লক্ষ দিয়ে গুণ করলে এক **নবতাঙ্গ** হয়। এক নবতাঙ্গকে চুরাশী লক্ষ দিয়ে গুণ করলে এক **নযুত** হয়। অর্থাৎ জৈন গণিতে সংখ্যাতত্ত্বে চুরাশী লক্ষগুণোত্তর পদ্ধতি নামে এক নতুন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ভারতীয় গণিতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ আর কোথাও দেখা যায় না।

দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন প্রণালী ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি জৈন-যুগে প্রচলিত ছিল কি না জানা যায় না। বৈদিক যুগে প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক পৃথক নাম ছিল। কিন্তু জৈন-যুগে একাধিক সংখ্যা যুক্ত করে সংখ্যার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন,—এক, দশ, শত, সহস্র, দশ-সহস্র, দশ-শত-সহস্র, কোটি, দশ-কোটি, শত-কোটি। ঐগুলি যথাক্রমে 1, 10, 100, 1000, 10 000, 10 00 000, 10^7, 10^8 এবং 10^9। একাধিক সংখ্যা যুক্ত করে সংখ্যা গঠনের পিছনে বিশাল বিশাল সংখ্যা গঠনের ইতিহাস আছে।

আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও জৈন ও বৌদ্ধদের মত বৃহৎ সংখ্যার ব্যবহার ও নামকরণ দেখা যায় না। একটি সংখ্যেয় রাশি কত বড়? জৈন গণিতজ্ঞ বলেন, "পৃথিবীর ন্যায় ব্যাস বিশিষ্ট একটি পাত্রে একটি একটি করে গণনা করে সরিষা দ্বারা পূর্ণ কর। অনুরূপভাবে স্থল ও সমুদ্রের ন্যায় পাত্রগুলি পূর্ণ কর। তবুও সংখ্যেয় রাশি গঠন সম্ভব নয়।" খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধগ্রন্থ **ললিতাবিস্তারে** 10^{53} পর্যন্ত সংখ্যার নাম আছে। কচ্চায়নের পালি ব্যাকরণে 10^{140}

সংখ্যাকে অসংখ্যেয় বলা হয়েছে। বর্তমানে 10^{100}-কে 'গোগুল' বলে। জৈন ও বৌদ্ধ গণিতজ্ঞরা তারো অনেক উপরে। নিম্নে জৈনদের সময় সম্পর্কে ধারণার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

(1) এক পূর্বি—75600, 000, 000, 000 বৎসর।

(2) এক শীর্ষ প্রহেলিকা—$(8, 400\ 000)^{28}$ পূর্বি। এই সংখ্যাটিতে 194টি অঙ্ক আছে !!

বিংশ শতাব্দীতে ক্যান্টর অনন্ত তত্ত্বের আবিষ্কারক। নতুন সংখ্যার আবিষ্কার হলো আলেফ-জিরো (Alef-Zero)। এ-ও এক বৃহৎ সংখ্যা—অনন্ত সংখ্যা নামে পরিচিত। কিন্তু জৈন গণিতজ্ঞদের দৃষ্টি যেন আরো সুদূর প্রসারিত। *A Concise History of Science in India* গ্রন্থে S. N. Sen বলেছেন, "The highest numerable number of the Jainas reminds us of the Alef-Zero of modern mathematics, and the Jaina imagination clearly went much farther than that."

॥ গণিতের বিষয়বস্তু ॥

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর জৈন গ্রন্থ **স্থানাঙ্গ-সূত্রে** গণিতের বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে। জৈন গণিতজ্ঞদের মতে গণিতের বিষয়বস্তু দশটি,—**পরিকর্ম, ব্যবহার, রজ্জু, রাশি, কলা সবর্ণ, যাবৎ-তাবৎ, বর্গ, ঘন, বর্গ-বর্গ ও বিকল্প।** জৈন গ্রন্থে এই গাণিতিক পরিভাষার সঠিক অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু গণিতের বৈশিষ্ট্য তার সর্বজনীনতায়। তাই পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও একই পরিভাষা ব্যবহার করায় এদের অর্থ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। অর্থগুলি নিম্নরূপ :

(1) **পরিকর্ম**—প্রাথমিক চার নিয়ম।

(2) **ব্যবহার**—প্রযুক্তি পাটীগণিত।

(3) **কলা সবর্ণ**—ভগ্নাংশ।

(4) **রজ্জু**—শুল্ব বা জ্যামিতি।

(5) **রাশি**—স্তূপ, শস্য পরিমাপ বিষয়ক সামতলিক ও ঘন বস্তু সম্পর্কিত পরিমিতি।

(6) **বর্গ**—বর্গ।

(7) **ঘন**—ঘন।

(8) **বর্গ-বর্গ**—উচ্চতর ঘাত বিষয়ক সমস্যা এবং বর্গমূল।

(9) **যাবৎ-তাবৎ**—অজ্ঞাত রাশি। জৈন গণিতে ঠিক কি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে বীজগাণিতিক অর্থে যে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। অজ্ঞাত রাশি দ্বারা পাটিগাণিতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয়েছে বলেও মনে করা হয়।

(10) **বিকল্প**—জৈন গণিতে সমবায় ও বিন্যাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

॥ পরিকর্ম—প্রাথমিক চার নিয়ম ॥

উমাস্বাতির গ্রন্থে গুণ ও ভাগের দুই প্রকার পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। একটি বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির অনুরূপ এবং অন্যটি উৎপাদক সম্বলিত। উৎপাদকের সাহায্যে গুণনের পদ্ধতি ব্রহ্মগুপ্ত ও পরবর্তী গণিতজ্ঞদের গ্রন্থে দেখা যায়। শ্রীধরের ত্রিশতিকায় উৎপাদকের সাহায্যে ভাগহার দেখা যায়।

॥ কলা সবর্ণ—ভগ্নাংশ ॥

অপ্রকৃত ভগ্নাংশের আসন্ন মান নির্ণয়ে জৈন গণিতজ্ঞরা চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যখনই কোন অপ্রকৃত সংখ্যার ভগ্নাংশটি 1-এর চেয়ে কম হয়েছে, তখনই তাঁরা সেই অংশটি উপেক্ষা করেছেন ; আবার যখন ভগ্নাংশটি $\frac{1}{2}$ এর অধিক হয়েছে, তখন তাঁরা ভগ্নাংশটিকে 1-এর সামিল করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, $315089\frac{218079}{630178}$ এর স্থলে 315089 এবং $318314\frac{553404}{636628}$-এর স্থলে 318315 ধরে নেওয়া হয়েছে।

॥ রজ্জু—জ্যামিতি ॥

বৈদিক যুগের ন্যায় জৈন যুগেও 'রজ্জু' শব্দটি জ্যামিতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জৈন জ্যামিতির কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ হলো 'সমচক্রবাল-বৃত্ত' (বৃত্ত), 'ব্যাসার্ধ,' 'জীব' (জ্যা), 'ধনুপৃষ্ঠ' (চাপ), 'সম-চতুরস্র' (বর্গ), 'চতুরস্র' (চতুর্ভুজ), 'আয়ত' (আয়তক্ষেত্র), 'ত্র্যস্র' (ত্রিভুজ), 'প্রতর' (সমতল), 'ঘন-ত্র্যস্র' (ত্রিভুজ পিরামিড), 'ঘন-চতুরস্র' (ঘনক), 'ঘন-বৃত্ত' (গোলক) প্রভৃতি।

তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র ভাষ্যে বৃত্তীয় পরিমিতির অনেকগুলি সূত্র প্রদত্ত আছে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো :

(1) বৃত্তের পরিধি $= \sqrt{10} \times$ ব্যাস

(2) বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4} \times$ পরিধি $\times$ ব্যাস

(3) জ্যা $=\sqrt{4\text{শর}(\text{ব্যাস}-\text{শর})}$

(4) শর $=\frac{1}{2}[\text{ব্যাস}-\sqrt{(\text{ব্যাস})^2-(\text{জ্যা})^2}]$

(5) অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর চাপ $=\sqrt{(\text{শর})^2_6+(\text{জ্যা})^2_4}$

(6) ব্যাস $=\dfrac{(\text{শর})^2+\frac{1}{4}(\text{জ্যা})^2}{\text{শর}}$

এখানে 'শর' শব্দের অর্থ উচ্চতা।

॥ π-এর আসন্ন মান ॥

প্রায় 2000 বছর ধরে জৈন গণিতজ্ঞরা π-এর আসন্ন মান $\sqrt{10}$ ধরে এসেছেন। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। **সূর্য-প্রজ্ঞপ্তি**-তে π-এর দুটি মান হলো 3 এবং $\sqrt{10}$। কিন্তু গ্রন্থকার প্রথম মানটি বর্জন করে দ্বিতীয় মানটি গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে $\pi=3$ প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে গণিতের আরো উন্নতির ফলে ওই মানটি বর্জিত হয়।

॥ জম্বু-দ্বীপ বা পৃথিবী বিষয়ে ধারণা ॥

জৈন চিন্তাধারায় জম্বু-দ্বীপ বা পৃথিবী বৃত্তাকার এবং ছয়টি সমান্তরাল পর্বতের দ্বারা সাতটি অংশে বিভক্ত। পৃথিবীর ব্যাস 100,000 যোজন, পরিধি 316227 যোজন 3 গব্যূতি 128 ধনু $13\frac{1}{2}$ অঙ্গুলির কিছু বেশী এবং ক্ষেত্রফল 7905694150 যোজন 1 গব্যূতি 1515 ধনু 60 অঙ্গুলি। অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত জৈন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ লল্লাচার্য তাঁর **শিষ্যধীবৃদ্ধিদ** নামক গ্রন্থে বলেছেন পৃথিবীর পৃষ্ঠফল 2856338557 যোজন। দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ দ্বিতীয় ভাস্কর লল্লাচার্য নির্ণীত ফলের শতাংশও বাস্তব পৃষ্ঠফল নয় বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ভাস্করের এই মত মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, লল্লাচার্য ব্যবহৃত একক ও ভাস্কর ব্যবহৃত এককের মধ্যে পার্থক্য থাকা তেমন বিচিত্র নয়। সেন-যুগে লক্ষ্মণ সেনের সময় জমি পরিমাপের জন্য 'নল' ব্যবহৃত হতো। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন বিজয় সেনের হাতের মাপের দৈর্ঘ ওই যুগে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে নলের ফলের সঙ্গে ভাস্করের ফলের পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। শুধু যুগেও একক সর্বত্র সমান ছিল না।

॥ সূচক ॥

জৈন সাহিত্যে সূচকের নামকরণের চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অনুযোগ-দ্বার-সূত্রে ঘাত ও বর্গমূলের নাম প্রথম বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ, তৃতীয় বর্গ,……, এবং প্রথম বর্গমূল, দ্বিতীয় বর্গমূল প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান গাণিতিক চিহ্নে এদের নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :

(1) প্রথম বর্গ $=(a)=a^2$

(2) দ্বিতীয় বর্গ $=\{(a)^2\}^2=a^4$

(1) প্রথম বর্গমূল $=\sqrt{a}=a^{\frac{1}{2}}$

(2) দ্বিতীয় বর্গমূল $=\sqrt{(\sqrt{a})}=a^{\frac{1}{4}}$

(3) তৃতীয় বর্গমূল $=\sqrt{\{\sqrt{(\sqrt{a})}\}}=a^{\frac{1}{8}}$

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের বিবৃতি থেকে জানতে পারা যায় ঘাতের নামকরণে বর্গ, ঘন, বর্গ-বর্গ (চতুর্থ ঘাত), ঘন-বর্গ (ষষ্ঠ ঘাত), ঘন-বর্গ-বর্গ (দ্বাদশ ঘাত) এবং মূল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় বর্গ-মূল-ঘন $=\{(a^{\frac{1}{8}})^3\}=a^{\frac{3}{8}}$ ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুযোগ-দ্বার-সূত্রে একটি বিবৃতি থেকে দেখা যায় প্রথম বর্গমূল $\times$ দ্বিতীয় বর্গমূল $=$ দ্বিতীয় বর্গমূলের ঘন $=a^{\frac{1}{2}}\times a^{\frac{1}{4}}=(a^{\frac{1}{4}})^3=a^{\frac{3}{4}}$। এই গ্রন্থে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা 29টি অঙ্কে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বৃহৎ সংখ্যাটি ষষ্ঠ বর্গের ও পঞ্চম বর্গের গুণফল অর্থাৎ $2^{2^6}\times 2^{2^5}=2^{64}\times 2^{32}=79$, 228, 162, 514, 264, 337, 593, 543, 950, 336 !!! এখানে আরো বলা হয়েছে যে, সংখ্যাটি 2^{96} দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং এই তথ্য থেকে আমরা সূচক-সূত্র পাই :

(1) $a^m\times a^n=a^{m+n}$ এবং (2) $(a^m)^n=a^{mn}$।

॥ বিকল্প—সমবায় বিন্যাস ॥

ভারতীয় গণিতের সমবায় ও বিন্যাসের ধারণার প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। বৈদিক যুগে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃজনে এই ধারণার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জৈন গণিতজ্ঞরাই এই বিষয়টি গণিতের অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। মহাবীরাচার্যের গণিত-সার-সংগ্রহে সমবায় ও বিন্যাসের সূত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পূর্বেও এ-বিষয়ে সূত্র রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ভগবতী-সূত্র, অনুযোগ-দ্বার-সূত্র ও জম্বু-দ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি-তে সমবায়ের ধারণা আছে। সুশ্রুতের রসভেদ বিকল্পাধ্যায়ে ছয়টি রস থেকে 1, 2, 3 প্রভৃতি

করে নিয়ে 63টি সমবায় গঠনের কথা বলা হয়েছে। সমবায় অর্থে বিকল্প শব্দটি জৈনদেরও পূর্ববর্তী। পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু জটিল শ্লোকের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যেন আরো জটিল। দশম শতাব্দীর পিঙ্গলের ভাষ্যকার হলায়ুধের ব্যাখ্যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। হলায়ুধের ব্যাখ্যা :

শীর্ষে একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কনের পর তার নিম্নে দুটি বর্গক্ষেত্র এমনভাবে অঙ্কন কর যাতে তাদের অর্ধাংশ প্রথম বর্গক্ষেত্রের নিম্নে থাকে। অতঃপর তার নিম্নে তিনটি,—তার নিম্নে চারটি প্রভৃতি বর্গক্ষেত্র একই নিয়মে অঙ্কন কর যতক্ষণ না আকাঙ্খিত পিরামিড প্রস্তুত হয়। শীর্ষ বর্গক্ষেত্রে 1 বসাও এবং প্রত্যেক স্তরের প্রান্তীয় বর্গক্ষেত্রে 1 বসাও। অন্যান্য বর্গক্ষেত্রে ঠিক তার উপরের বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের যোগফল বসাও। এইভাবে যে চিত্র অঙ্কিত হবে তার নাম "মেরু প্রস্তর"।

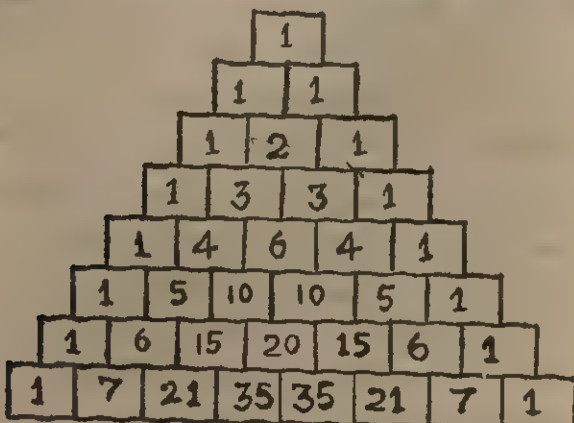

চিত্র—15 মেরু-প্রস্তর

চিত্রটি থেকে এই সূত্রটি পাওয়া যায় : ${}_{n+1}C_r = {}_nC_r + {}_nC_{r-1}$। পাশ্চাত্য গণিতের ইতিহাসে এই চিত্রটি 'পাসকালের ত্রিভুজ' নামে পরিচিত। কিন্তু 'মেরুপ্রস্তর' পাসকালের ত্রিভুজের চেয়ে সহজ। মেরু-প্রস্তরের ধারণা পাসকালের দু'হাজার বছর পূর্বেকার, হলায়ুধের ব্যাখ্যাই তো কমপক্ষে ছ'শ বছর পূর্বের।

বিভিন্ন জৈন গ্রন্থে প্রাপ্ত সমবায় ও বিন্যাসের সূত্রগুলি আধুনিক পরিভাষায় নিম্নরূপ :

$$(1)\ nC_1 = n;\quad (2)\ nC_2 = \frac{n(n-1)}{1.2};\quad (3)\ nC_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{1.2.3}$$

$$(1)\ nP_1 = n;\ (2)\ nP_2 = n(n-1);\ (3)\ nP_3 = n(n-1)(n-2)।$$

।। দু'জন অগণিতজ্ঞ জৈন আচার্যের জীবনী ।

ভদ্রবাহু ও উমাস্বাতী গণিতজ্ঞ ছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থে যে-সব গাণিতিক উপাদান ছড়িয়ে আছে তা থেকে এমন অনুমান করা যায় যে গণিতে তাঁরা একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। শ্রুত কেবলিন ভদ্রবাহু নিঃসন্দেহে উমাস্বাতীর পূর্ববর্তী।

ভদ্রবাহু

ভদ্রবাহু ছিলেন 'শ্রুত কেবলিন' অর্থাৎ সমগ্র জৈনশাস্ত্র তাঁর মুখস্থ ছিল। মগধের অধিবাসী ভদ্রবাহু গৃহী ছিলেন না,—ছিলেন দিগম্বর সন্ন্যাসী। সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকায় তাঁর বাস্তব জীবনের কোন কাহিনী জানা যায় না।

একটি কিংবদন্তী অনুসারে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধে দীর্ঘ বারো বছর ধরে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। মহাজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ ভদ্রবাহু নাকি পূর্বেই গণনা করে ভাবী দুঃসময়ের বিষয় অবগত হন। সে-কারণে তিনি অসংখ্য শিষ্যসহ দক্ষিণ ভারতের কন্নড় দেশে গমন করেন এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তিনি গণধর ছিলেন এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নাকি শেষ বয়সে "শ্রাবণ বেলগোলা" পর্বতে জৈনধর্মানুমোদিত 'সল্লেখনা' (অনশন ব্রত) অবলম্বন করে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। এখনো এই 'শ্রাবণ বেলগোলা' পর্বতে অসংখ্য জৈন মন্দির ও শিলালিপি জৈন অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক সত্য যে, দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের এই অঞ্চলে নানা বংশের নৃপতিরা জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

ভদ্রবাহুর দক্ষিণ ভারত গমনকালে অনেক শিষ্যই তাঁর সঙ্গে যাননি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রকোপে এই জৈনরা তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখতেও পারেন নি। শ্বেতবস্ত্র পরিধান এই সময় থেকেই এক শ্রেণীর জৈনদের মধ্যে প্রচলিত হয়। ফলে, জৈনধর্মের দুটি শাখা,—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরের সূচনাও শুরু হয়।

ভদ্রবাহুর নির্বাণ-স্থান ও নির্বাণ-বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্বের মতে শ্রীবীর নির্বাণের 170 বছর পরে ভদ্রবাহুর পরিনির্বাণ হয়েছিল।

জৈনদের নিকট ভদ্রবাহু উত্তরাধ্যয়ন সূত্র ও কল্পসূত্রের লেখক হিসাবে অধিক পরিচিত। কিন্তু তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়না। কারণ ভদ্রবাহুর সময়ে ভারতে কোন লিপি প্রচলিত ছিল বলে জানা যায় না। সম্রাট অশোকের সময় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন ছিল বটে, কিন্তু তার পূর্বের কোন লিপির অস্তিত্ব এখনো জানা যায় নি। তাছাড়া গণধর শ্রুত কেবলিন ভদ্রবাহু যিনি সমুদয় জৈনগ্রন্থ মুখস্থ করে রেখেছিলেন, তাঁর পক্ষে কোন গ্রন্থ রচনা বাহুল্য মনে করাই স্বাভাবিক। তাঁর নামে প্রচলিত গ্রন্থসমূহ হয়তো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী অবলম্বনে পরবর্তী কালে কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচনা।

॥ উমাস্বাতী ॥

উমাস্বাতী নামের সঙ্গে তাঁর পিতা ও মাতার নাম জড়িত আছে বলে মনে করা হয়। এরূপ বলা হয়, তাঁর পিতার নাম স্বাতী ও মাতার নাম উমা। অন্যান্য অনেক জৈন আচার্যদের সময়-কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও উমাস্বাতীর সময় নিয়ে কোন সংশয় নাই। তিনি 150 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ন্যগ্রোধিকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানটি কুসুমপুরের অন্তর্গত। ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে কুসুমপুর একটি স্মরণীয় নাম। এখানেই আচার্য আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন। মনে হয়, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল থেকেই কুসুমপুর উচ্চতর গণিত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে এখানে গণিতের গবেষণা ও অধ্যাপনা চলতে থাকে।

ভদ্রবাহুর মত উমাস্বাতীও গণিতজ্ঞ ছিলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর রচিত **'তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র'** ভাষ্যে প্রচুর গাণিতিক উপাদান আছে। অন্যান্য গ্রন্থ থেকে অনেক গাণিতিক সূত্র উদ্ধৃত করলেও গণিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল না, এমন কথা বলা যায় না।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ভারতীয় গণিতের উন্নতি ও সংস্কার সাধনে জৈনদের বিশিষ্ট অবদান আছে। এক সময় তাঁদের গাণিতিক প্রতিভা অন্য ধর্মে ও মতে বিশ্বাসী গণিতজ্ঞদের মুগ্ধ করেছিল। জৈনদের আবিষ্কৃত গাণিতিক পরিভাষা পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। জৈন ধর্ম উদ্ভবের মূলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিরোধ থাকলেও উভয় ধর্মের গণিতজ্ঞদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিলনা। গণিতের সর্বজনীনতার এমন মহৎ দৃষ্টান্ত আর অন্য কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

"No subject loses more than mathematics by an attempt to dissociate it from its history." —Glashier.

বকশালী পাণ্ডুলিপি

বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানি যেমন বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কোন এক গ্রামের একটি বাড়ীর গোয়ালঘরের মাচা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তেমনি 'বকশালী পাণ্ডুলিপি' নামাঙ্কিত গণিত গ্রন্থটিও পেশোয়ারের নিকট একটি গ্রামের কৃষকের খননের ফলে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভূর্জবৃক্ষের বল্কলে লিখিত এই গ্রন্থখানি 1881 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। সমগ্র গণিত গ্রন্থটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি,—মাত্র সত্তরটি পাতা, তাও আবার কয়েকটি শতছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভারতের জলবায়ু এবং বিখ্যাত বল্মীক গ্রন্থটির কতখানি গ্রাস করেছে, তা আর আজ জানা যাবে না। হায়, যদি সমগ্র গ্রন্থটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যেত! তা হ'লে হয়তো আমরা প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়গুলি সংযোজিত করে একটি ক্রমিক বিবরণ দিতে পারতাম। গ্রন্থটি গাথা ভাষায় সারদা লিপিতে লিখিত।

কোলব্রুক, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রমসাধ্য গবেষণা করে যেমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি ভারতবাসীর সপ্রশংস শ্রদ্ধাও পেয়েছেন। কিন্তু 'বকশালী পাণ্ডুলিপি'-র অনুবাদক জি. আর. কে (Kaye) সাহেব যেন সচেতনভাবে ভারতীয় কৃতিত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন না করে তা বিকৃত ও নিম্নমান করার প্রচেষ্টা করেছেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা' গ্রন্থে এই মনোভাবের বিষয়ে বলেছেন, "এককালে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে হিন্দুরা বৈজ্ঞানিক যে সমুদয় তথ্য জানিত তাহার প্রায় সকলই বিদেশ হইতে শিখিয়াছিল। তাঁহাদের মতে গ্রীসই ছিল সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস এবং ইহার নিকটই ভারতবর্ষ বিশেষভাবে ঋণী ছিল।......

গ্রীকেরা যে ইহার (ত্রিকোণীমিতির সাইন) ব্যবহার জানিত এরূপ কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ইহার প্রচলন ছিল। তথাপি ইউরোপীয় কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা যে হিন্দুরা গ্রীকগণের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছিল।" উদ্ধৃতিটি আর দীর্ঘ না করে এক কথায় বলা যায় যে, এখনো অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় কৃতিত্বের প্রকৃত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে কার্পণ্য বোধ করেন।

এই পাণ্ডুলিপি কোন্ সময়ে রচিত বা কে এই গ্রন্থের রচয়িতা, এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে দেশীবিদেশী অনেক পণ্ডিত এর উদ্ভব-কাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী বলে মনে করেন। কিন্তু কে্য সাহেব অত প্রাচীনতা স্বীকার করেন না। তিনি এর ভাষা ও লিপির উপর শাণিতযুক্তির ছুরি চালিয়ে একে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন। এ-বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় গণিতে বিশেষজ্ঞ সুপণ্ডিত ডঃ বিভূতিভূষণ দত্তের মতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় ভাষা ও লিপির দ্বারা উদ্ভব-কাল নির্ণয় না করে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করতে হবে। এই গ্রন্থের গাণিতিক রীতি, পদ্ধতি, সাংকেতিক চিহ্ন ও পরিভাষার উপর ভিত্তি স্থাপন করে তিনি এর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলে মনে করেন।

এই গ্রন্থটি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থের অনুলিপি বা করণ গ্রন্থ (ভাষ্য)। গ্রন্থ রচনার বৈশিষ্ট্য, নানা বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা, পুনরুক্তি, পূর্ববর্তী আলোচনার উল্লেখ প্রভৃতি থেকে অন্তত তা-ই মনে হয়। গ্রন্থটিতে পাঁচ ধরনের হস্তলিপি আছে। কোন ব্রাহ্মণ গণিতজ্ঞ এর লেখক। তাঁর পিতার নাম ছজক। তিনি তাঁর পুত্র বশিষ্ঠ ও পরবর্তী বংশধরদের জন্য এই গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু ছজক পুত্র এই গ্রন্থের প্রকৃত রচচিতা নন,—অনুলিপিকার মাত্র।

বকশালী পাণ্ডুলিপির যুগে গাণিতিক পরিভাষা তখনো সৃজন-স্তরে। তাই এতে ব্যবহৃত শব্দগুলি তখনো সাধারণীকৃত হয়নি। সে কারণে পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা এসব শব্দ ব্যবহার করেননি। ভগ্নাংশের সমহরে পরিবর্তনের নাম 'সর্বণন'। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে এর স্থলে 'সদৃশ করণ' বা 'হরসাম্যকরণ' ব্যবহৃত হয়েছে। গাণিতিক সমস্যাকে 'ন্যাস' না বলে 'স্থাপন', কখনো কখনো 'ন্যাস' বা 'ন্যাস-স্থাপন' বলা হয়েছে। সাধারণত 'শ্রেণী-'কে শ্রেঢ়ী বলা হয়,

কিন্তু এখানে 'বর্গ,' 'পার্শ্ব' ও 'রূপণ করণ' বলা হয়েছে। ভারতীয় গণিতজ্ঞদের প্রিয় বিষয় একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের কোন উল্লেখ এখানে নাই। কুট্টকের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থেকে মনে হয় এই পাণ্ডুলিপির রচনাকাল আর্যভটের পূর্বে। অবশ্য এ-সবই অনুমান। পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত অংশে যে 'কুট্টক' ছিলনা, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

॥ সঙ্কলন গ্রন্থ ॥

এটি একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। 'আর্যভটীয়', 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' প্রভৃতির সঙ্গে এর কোন মিল নাই। এতে আছে গাণিতিক নিয়ম, তার উদাহরণ ও সমাধান। পাণ্ডুলিপির উদ্ধারকৃত অংশে পাটীগণিত ও বীজগণিতের আলোচনা দেখা যায়,—মাত্র কয়েকটি জ্যামিতি ও পরিমিতির উল্লেখ আছে। অনুমিত হয় খণ্ডিত অংশে জ্যামিতি ও পরিমিতির পূর্ণ আলোচনা ছিল। এই গ্রন্থে শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না,—একই পরিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা দুর্লভ নয়। পাটীগণিতের ভগ্নাংশ, বর্গমূল, লাভক্ষতি, সুদকষা ও ত্রৈরাশিক বোধ হয় ছজক-পুত্র তাঁর পুত্র ও বংশধরদের গণিত শিক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা বিবেচনা করেছিলেন। বীজগণিতের সরল ও সহসমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ, সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণী বিষয়ে আলোচনা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

॥ অজ্ঞাত রাশির সঙ্কেত ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে জৈন গণিতে 'যাবৎ-তাবৎ'-এর অর্থ বীজগণিত বলে বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে 'যাবৎ-তাবৎ' অজ্ঞাত রাশির অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ঠিক কখন থেকে এই অর্থ প্রচলিত হলো, তা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অমর সিংহ 'অমরকোষে' যাবৎ-তাবৎ-এর অর্থ দিয়েছেন 'মান' বা 'রাশি'। বকশালী-পাণ্ডুলিপিতে 'যাবৎ-তাবৎ'-এর স্থলে 'যদৃচ্ছা' শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অজ্ঞাত রাশির সঙ্কেত হিসাবে শূন্য (0) ব্যবহৃত হয়েছে। "যদৃচ্ছা বিন্যসে শূন্যে"—অজ্ঞাত সংখ্যা বা রাশির স্থানে শূন্য (0) বসাও। অবশ্য প্রকৃত শূন্য স্থানে শূন্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আরো পরবর্তীকালের। শ্রীধরাচার্য ও ভাস্করাচার্যও অজ্ঞাত রাশির সঙ্কেত হিসাবে

শূন্যের ব্যবহার করেছেন ;—পাটীগণিতে অজ্ঞাত রাশির ক্ষেত্রে শূন্য (0) ব্যবহারের বহুল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 'ত্রিশতিকা'-র নিম্ন উদাহরণটি লক্ষ্য করার মত :

আদি 20 । উ 0 । গচ্ছ 7 । গণিতম্ 245

সঙ্কেতটির অর্থ : কোন সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ 20, সাধারণ অন্তর অজ্ঞাত (সে-কারণ 0 ব্যবহৃত হয়েছে), পদসংখ্যা 7 এবং সমষ্টি 245।

সঠিক ও যথার্থ সঙ্কেতের অভাবে পাণ্ডুলিপির অনেক সমীকরণ দ্ব্যর্থক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তবে সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ,—

(1) $\boxed{\frac{0}{1}\quad \frac{5}{1}\text{যু}\quad -\frac{x}{1}+\frac{5}{1}=x+5}$, এখানে অজ্ঞাত রাশি $x=0$।

(2) $\left|\begin{array}{cccc} 0 & 5\ \text{যু} & \text{মূ} & 0 \\ 1 & 1 & & 1 \end{array}\right|\begin{array}{cccccc} \text{স} & 0 & 7 & + & \text{মূ} & 0 \\ & 1 & 1 & & & 1 \end{array}\Bigg|$

এখানে দুটি অংশে দুটি সমীকরণ আছে :

(1) $\sqrt{x+5}=S$; (2) $\sqrt{x-7}=t$

একই সমীকরণে দুটি করে শূন্য, দুটি করে অজ্ঞাত রাশি বোঝাচ্ছে। $\frac{'0'}{1}$—এই সঙ্কেতের দুটি অর্থ : (1) অজ্ঞাত রাশি, আবার (2) শূন্যের নীচে '1' দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে এই শূন্যটি প্রকৃত শূন্য নয়।

॥ ঋণাত্মক চিহ্ন ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে পাটীগাণিতিক প্রক্রিয়া বোঝাতে সংস্কৃত বর্ণমালার 'বর্ণ' বা সম্পূর্ণ শব্দ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে যোগ বোঝাতে 'যু', বর্গমূল বোঝাতে 'মূ' প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ঋণাত্মক রাশি বোঝাতে '+' চিহ্নের ব্যবহারের কোন প্রাচীন ইতিহাস জানতে পারা যায় না। অন্যান্য গণিত গ্রন্থে বিন্দু (˙) দিয়ে ঋণাত্মক চিহ্ন সূচিত হয়েছে। খুব সম্ভব '+' চিহ্নের সঙ্গে ব্রাহ্মী-লিপির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে থাকবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সি. এন. শ্রীনিবাসিয়েঙ্গারের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা গেল : "The origin of the symbol + for subtraction may be through the

word *kshaya* since kṣa in the Brahmi characters or in the Bakshāli characters differs from the symbol + in only having a little flourish at the lower end of the vertical line. ডঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত বলেন সংস্কৃত 'ক্ষয়'-এর বিবর্তনে + চিহ্নের উৎপত্তি ; ডঃ হর্ণেল বলেন সংস্কৃত 'কমিয়স' বা 'শ্যন' শব্দ থেকে এসেছে।

॥ বকশালী পাণ্ডুলিপির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ॥

বকশালী পাণ্ডুলিপির অনেক বৈশিষ্ট্য। তাই গণিতের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্বল্প পরিসরে পাণ্ডুলিপির সব বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা দ্বিঘাত করণীর আসন্ন মান নির্ণয়ের সূত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সূত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে এটি অন্যত্র কোথাও এমন সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। অবশ্য কোন কোন গণিতজ্ঞ বলেন সূত্রটির অস্তিত্ব শুল্ব-যুগেও পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গ্রীক গণিতজ্ঞ হীরনের সূত্রের সঙ্গে এর মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে এটি স্বাধীনভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রীকদের সঙ্গে কোন কিছুর মিল বা সাদৃশ্য দেখলেই তা গ্রীকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, এমন ধারণা কল্পনা-প্রসূত ছাড়া কিছুই নয়। 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা' গ্রন্থে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : "ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের ও চিন্তার আদান-প্রদান আবহমান কাল হইতে প্রচলিত।…… কোনো দুই দেশে কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিলেই তাহা যে ভাব বিনিময়ের ফল মাত্র একথা সিদ্ধান্ত করা চলে না। কারণ অনুরূপ পরিবেশের ফলে বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্রভাবে একই প্রকারের চিন্তা ও আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।" যাই হোক,—পাণ্ডুলিপির যুগ হীরনের পূর্ববর্তী বলে অনেক গণিতজ্ঞ মনে করেন।

সূত্র : অ-বর্গ সংখ্যার ক্ষেত্রে নিকটতম বর্গ-সংখ্যা বিয়োগ কর। ভাগশেষ নিকটতম বর্গসংখ্যার দ্বিগুণ করে ভাগ কর : এই সংখ্যার বর্গের অর্ধেককে আসন্ন বর্গমূল ও ভাগশেষের সমষ্টি দ্বারা ভাগ করে বিয়োগ করলে নির্ভুল বর্গমূল পাওয়া যায়।

আধুনিক গাণিতিক সঙ্কেতে সূত্রটি এ রকম :

$$\sqrt{A}=\sqrt{a^2+r}=a+\frac{r}{2a}-\frac{\left(\frac{r}{2a}\right)^2}{2\left(a+\frac{r}{2a}\right)}$$

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে সূত্রটির প্রয়োগ দেখানো যাক।

উদাহরণ : $$\sqrt{41}=6+\frac{5}{2.6}-\frac{\left(\frac{5}{2\cdot6}\right)^2}{2\left(6+\frac{5}{2\cdot6}\right)}=6+\frac{5}{12}-\frac{\left(\frac{5}{12}\right)^2}{2\left(6+\frac{5}{12}\right)}$$

$$\sqrt{105}=\sqrt{10^2+5}=10+\frac{5}{20}-\frac{\left(\frac{5}{20}\right)^2}{2\left(10+\frac{5}{20}\right)}$$

প্রথম উদাহরণে আসন্ন বর্গসংখ্যা=6, ভাগশেষ=5।

কয়েক প্রকার অঙ্কের গণনায় ত্রুটি ও যাথার্থ নির্ধারণের জন্য এই সূত্রের সম্প্রসারিত রূপের প্রয়োগ পাণ্ডুলিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। সেই সুদূর অতীতে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা যে এ ধরনের চিন্তা করেছিলেন ভাবতেও আজ অবাক লাগে।

সমান্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি পাণ্ডুলিপির আর একটি বিশিষ্ট অবদান। যদি কোন সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ a, সাধারণ অন্তর d, পদসংখ্যা n হয়, তা হলে পাণ্ডুলিপি অনুসারে, $S=\{\frac{1}{2}(n-1)\,d+a\}\,n$

॥ ভগ্নাংশ ॥

ভগ্নাংশের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় গণিতে অতি পুরাতন ঘটনা। ঋগ্বেদে ভগ্নাংশের বহু উল্লেখ আছে,—নানা সমস্যায় ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এর প্রয়োগও করেছেন। পাণ্ডুলিপির যুগেও ভগ্নাংশের ব্যবহার দেখা যায়। এ-যুগে ভগ্নাংশের যোগ-ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সদৃশ বা সম-হরের প্রচলন ছিল। প্রাচীন সভ্য অন্যান্য দেশেও এই একই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পাণ্ডুলিপি থেকে দু'একটি উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

উদাহরণ :

যোগ কর : $\frac{2}{1},\ 1\frac{1}{2},\ 1\frac{1}{3},\ 1\frac{1}{4},\ 1\frac{1}{5}$

নিয়ম :—সদৃশম্ ক্রিয়তে,—সদৃশ হরে পরিণত করা হলো।

$$\frac{120}{60},\ \frac{90}{60},\ \frac{80}{60},\ \frac{75}{60},\ \frac{72}{60}$$

এরপর উত্তর লেখা হয়েছে, $\frac{437}{60}$.

উদাহরণ :

যোগ কর : $\frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{3}{5}$

(সদৃশম্ ক্রিয়তে) $\frac{30}{60},\ \frac{20}{60},\ \frac{45}{60},\ \frac{36}{60}$

এবার উত্তর লেখা হয়েছে $\frac{131}{60}$

॥ কয়েকটি অঙ্কের উদাহরণ ॥

প্রাচীন ভারতের গণিত-গ্রন্থসমূহে একই ধরনের অঙ্ক দেখা যায়। এটি বোধ হয় গণিতজ্ঞদের সংরক্ষণশীল চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীধর, পৃথুদকস্বামী, মহাবীর, ভাস্করাচার্য প্রভৃতির গ্রন্থে একই প্রকার অঙ্কের অনুবর্তন দেখা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর অঙ্ক দ্বাদশ শতাব্দীর গণিত গ্রন্থে প্রায় অবিকৃত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, এমন ঘটনা অপ্রতুল নয়। বকশালী পাণ্ডুলিপির অঙ্কও ভাস্করাচার্য তাঁর লীলাবতীতে পরিবেশন করেছেন। নিম্নলিখিত অঙ্কটিতে ভাস্কর তিনজনের পরিবর্তে চারজন এবং জন্তুর পরিবর্তে মূল্যবান পাথরের উল্লেখ করেছেন।

1. **উদাহরণ ঃ**

তিনব্যক্তি যথাক্রমে 7টি অশ্ব, 9টি হয়* এবং 10টি উটের মালিক। যদি প্রত্যেকে একটি করে জন্তু পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে, তা হলে প্রত্যেকেই সমান ধনী হয়। প্রত্যেকটি জন্তুর মূল্য কত?

প্রদত্ত সর্তানুসারে, প্রত্যেকে সমান ধনী হলে প্রথম ব্যক্তি 5টি অশ্ব 1টি হয় ও 1টি উটের মালিক; দ্বিতীয় ব্যক্তি 7টি হয়, 1টি অশ্ব ও 1টি উটের মালিক এবং তৃতীয় ব্যক্তি 8টি উট, 1টি অশ্ব ও 1টি হয়-এর মালিক হবে।

এখন যদি x_1, x_2 এবং x_3 যথাক্রমে একটি অশ্ব, একটি হয় এবং একটি উটের মূল্য হয়, তা হ'লে

প্রথম ব্যক্তির সম্পদের মূল্য $= 5x_1+x_2+x_3 \ldots(1)$

দ্বিতীয় „ „ „ $= 7x_2+x_3+x_1 \ldots(2)$

তৃতীয় „ „ „ $= 8x_3+x_2+x_1 \cdots(3)$

প্রদত্ত সর্তানুসারে (1), (2) এবং (3) পরস্পর সমান।

সুতরাং $5x_1+x_2+x_3=7x_2+x_3+x_1=8x_3+x_2+x_1$

অতএব $5x_1+x_2+x_3=7x_2+x_3+x_1 \cdots(4)$

$7x_2+x_3+x_1=8x_3+x_2+x_1 \cdots(5)$

(4) সমীকরণ থেকে $4x_1=6x_2$ পাওয়া যায় এবং (5) নং সমীকরণ থেকে $6x_2=7x_3$ পাওয়া যায়।

(4) এবং (5) থেকে পাওয়া যায়।

$4x_1=6x_2=7x_3=K$ (মনে করা হলো)

এখন x_1, x_2 এবং x_3-এর সাংখ্যিক মান পেতে হলে K এর মান হবে 4, 6 ও 7-এর ল. সা. গু-র যে কোন গুণিতক। 4, 6 ও 7 এর ল. সা. গু 84। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে K-এর মান $84 \times 2 = 168$ ধরা হয়েছে।

সুতরাং $4x_1 = 6x_2 = 7x_3 = 168$

$\therefore\ x_1 = 42,\ x_2 = 28$ এবং $x_3 = 24$

[*অশ্ব ও হয় সমার্থক। পার্থক্য কেবল অশ্ব হয়-এর চেয়ে উন্নত]

2. উদাহরণ ঃ

পাঁচজন ব্যবসায়ী একটি মণি ক্রয় করল। যদি মণিটির মূল্য প্রথম ব্যবসায়ীর টাকার অর্ধেক ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর টাকার এক তৃতীয়াংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা তৃতীয় ব্যবসায়ীর টাকার এক চতুর্থাংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা চতুর্থ ব্যবসায়ীর টাকার এক-পঞ্চমাংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা পঞ্চম ব্যবসায়ীর টাকার এক ষষ্ঠাংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, তাহলে মণিটির মূল্য কত? আর প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছে কত করে টাকা আছে?

এখন পাঁচ জন ব্যবসায়ীর টাকার পরিমাণ যথাক্রমে x_1, x_2, x_3, x_4 ও x_5 এবং মণির মূল্য p হলে সর্তানুসারে,—

$$\tfrac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = x_1 + \tfrac{1}{3}x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = x_1 + x_2 + \tfrac{1}{4}x_3$$
$$+ x_4 + x_5 = x_1 + x_2 + x_3 + \tfrac{1}{5}x_4 + x_5 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \tfrac{1}{6}x_5 = p$$

1নং উদাহরণের মত $\frac{1}{2}x_1 = \frac{2}{3}x_2 = \frac{3}{4}x_3 = \frac{4}{5}x_4 = \frac{5}{6}x_5 = q$

অতএব, $x_1 = 2q,\ x_2 = \frac{3}{2}q,\ x_3 = \frac{4}{3}q,\ x_4 = \frac{5}{4}q,\ x_5 = \frac{6}{5}q$

উপরের যে কোন সমীকরণে x_1, x_2, x_3 প্রভৃতির মান বসালে আমরা p-এর মান পাই। প্রথম সমীকরণে বসালে

$$\frac{1}{2} \times 2q + \frac{3}{2}q + \frac{4}{3}q + \frac{5}{4}q + \frac{6}{5}q = p$$

অথবা, $$\frac{60q + 90q + 80q + 75q + 72q}{60} = p$$

অথবা, $\frac{377}{60}q=p$

উত্তরটি অখণ্ড সংখ্যায় হলে $q=60$ হবে।

অতএব $p=377$

$\therefore\ x_1=120, x_2=90, x_3=80, x_4=75$ এবং $x_5=72$

॥ অপ্রকৃত নিয়ম ॥

ইংরাজীতে এই পদ্ধতির নাম Regula Falsi, Rule of False Position প্রভৃতি। এটি ভারতীয় গণিতজ্ঞদের স্বতন্ত্র ও মৌলিক আবিষ্কার। ইউরোপে এই নিয়মটি আরবদের দ্বারা বাহিত হয়ে গণিতের সমস্যা সমাধানে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিতে এই পদ্ধতি বহুদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল। তারপর বীজগণিতের প্রয়োগ ও নানা সাঙ্কেতিক চিহ্নের আবিষ্কারের পর এর গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তবুও স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে যেখানে বীজগণিত অননুমোদিত সেখানে এই পদ্ধতি এখনো প্রয়োগ করা হয়। নবম শতাব্দীর জৈন গণিতজ্ঞ মহাবীরের 'গণিত সার সংগ্রহে' এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ আছে। পাণ্ডুলিপির যুগে এই পদ্ধতির প্রচলন থেকে মনে হয় ভারতে এটি খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর কোন সময়ে আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে।

এখনো পাটীগণিতের অঙ্ক সমাধানে,—সুদকষা, লাভ ক্ষতি, ভগ্নাংশ বিষয়ক অঙ্ক প্রভৃতিতে এই অপ্রকৃত নিয়ম বা Regula Falsi-র বহুল প্রয়োগ করা হয়। সেই সুবিখ্যাত অঙ্ক, কোন বাঁশের এত অংশ জলে, এত অংশ কাদায় ও এতখানি উপরে থাকলে বাঁশটির উচ্চতা কত? অথবা কোন ব্যক্তি তার মাসিক আয়ের এত অংশ গৃহখরচ বাবদ, এত অংশ বাড়ী ভাড়া, এত অংশ লেখাপড়া প্রভৃতিতে খরচ করার পর তার মাসে এত টাকা জমলে, তার মাসিক আয় কত? এইসব অঙ্কে আমরা এই অপ্রকৃত পদ্ধতির প্রয়োগই করে থাকি। এ-সব অঙ্কে সাধারণত আমরা একটি অপ্রকৃত সংখ্যা ধরে নিয়ে অঙ্ক কষে প্রকৃত উত্তর বার করি। বাঁশের অঙ্কটির ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা 1 ধরি ও মাসিক আয়ের অঙ্কের ক্ষেত্রে 100 টাকা ধরি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঁশের উচ্চতা 1 নয়, ব্যক্তিটির মাসিক আয়ও 100 টাকা নয়। খুশী মত

একটি অপ্রকৃত উত্তর ধরে নিয়ে অঙ্ক কষার এই পদ্ধতিকে তাই অপ্রকৃত নিয়ম পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

বকশালী পাণ্ডুলিপিকে প্রাচীন ভারতীয় গণিতের একটি লুপ্ত অধ্যায় বলা যেতে পারে। এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। আর্যভটের পূর্ববর্তী যুগের গাণিতিক নমুনা একমাত্র এখানেই আছে। এই পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব সম্পর্কে ডঃ শ্রীনিবাসিয়েঙ্গার বলেন,—"The date of the mathematics contained in the Bakhshāli manuscript is therefore far more important than the date of Ms. itself, but a precise estimate of the former date may be posible only when further such manuscripts come to light."

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

"No mathematician should ever allow himself to forget that mathematics, more than any other art or science, is a youngman's game."

—G. H. Hardy.

আর্যভট

আর্যভট নামটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্যভট'। প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের নামের সঙ্গে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম যুক্ত হওয়ায় ভারতবাসী মাত্র সকলেই আনন্দিত হবেন। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও পণ্ডিত মনীষীদের স্মৃতি রক্ষার জন্য সরকার ও বেসরকারী নানা সংস্থা অনেক কিছু করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও সাহিত্যিকদের স্মৃতি রক্ষার তেমন বিশেষ আয়োজন নাই। ব্যক্তি নামে দেশে নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, স্থানের নামকরণে, রাস্তার নামকরণেও ব্যক্তির নাম জড়িত হচ্ছে। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই আমাদের দেশের অসামান্য প্রতিভাধরদের নাম উপেক্ষিত হচ্ছে।

আর্যভট নামটি কোন কোন পত্র-পত্রিকায় ও সাধারণ মানুষের কাছে 'আর্যভট্ট' নামে লিখিত ও উচ্চারিত হচ্ছে। এই ভুল লেখা ও উচ্চারণ কম পরিতাপের বিষয় নয়। এই ভুলের পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে: প্রথমত নামের সঙ্গে 'ভট্ট' যুক্ত অনেক নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত, বিখ্যাত মীমাংসা লেখক কুমারিল ভট্ট, স্মৃতি চন্দ্রিকা গ্রন্থের লেখক দেবলভট্ট, আদিশূর প্রবর্তিত এবং কনৌজ থেকে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম বেণীসংহার রচয়িতা নারায়ণ ভট্ট, সুবিখ্যাত যদুভট্ট প্রভৃতি কয়েকটি উদাহরণ। দ্বিতীয়ত ভট্ট-এর সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত বলে 'ভট' উচ্চারণে স্বস্তি পাইনা, বা উচ্চারণে বাধাপ্রাপ্ত হই। যা হোক, ভট্ট উচ্চারণ না করে কেন আমরা 'ভট' উচ্চারণ করব তার কারণটি ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর

ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো : "ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে আর এক নিম্ন বা 'পতিত' শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে ; সূত পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানরাই ভট্ট ব্রাহ্মণ এবং অন্য লোকদের যশোগান করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট ব্রাহ্মণ।"

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে ক্রম পরম্পরায় তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রাচীন ভারতের গাণিতিক উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি দেখানো না গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, সুদূর অতীতে এ-দেশের গণিতজ্ঞরা নানা বিষয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। বেদ, বেদাঙ্গ, বৌদ্ধ ও জৈন বিশাল গ্রন্থরাজি এ-বিষয়ে আমাদের বিক্ষিপ্ত সংবাদ সরবরাহ করে। সত্য কথা, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ের গণিতজ্ঞান আমাদের অতি অল্প। তবুও গণিত বিষয়ে যতটুকু জানা যায়, গণিতজ্ঞদের সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। নিঃসন্দেহে এটি ভারতীয় ঐতিহ্য। ভারতীয় মনীষীরা তাঁদের বিষয় সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন, কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এ-দেশে বসওয়েলের বড় অভাব। ফলে, বহু গ্রন্থ আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। ভারতের গর্ব 'আর্যভটীয়'-ও হারিয়ে গেছে। জানিনা কোন্ পুণ্যের ফলে তার একটিমাত্র অনুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিত প্রবর ভাউ দাজী এ-জন্য সমগ্র ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। 1864 খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্যভটের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের একটি অনুলিপি সংগ্রহ করেন।

গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণ-যুগ। এই যুগে বিহারের অন্তর্গত কুসুমপুরে, ঐতিহাসিক পাটলিপুত্র বা পাটনায় 476 খ্রীষ্টাব্দে আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে গুপ্তযুগ ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই যুগ-সন্ধিক্ষণ আর্যভটের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের পক্ষে যে অনুকূল হয়েছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর্যভট মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' রচনা করেন। এই সময় পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আসীন ছিলেন বুধগুপ্ত এবং তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছরই আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন। 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে তিনি জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছেন :

ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥

উপরের শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কলিযুগের 3600 বছর অতিক্রান্ত

হলে আর্যভটের বয়স ছিল 23 বছর। অর্থাৎ তিনি 476 খ্রীষ্টাব্দের 21শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা হচ্ছে ঃ

আর্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানম্ ॥

কিন্তু প্রথম শতাব্দীর 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের বিখ্যাত ভাষ্যকার প্রথম ভাস্কর তাঁর লেখায় আর্যভটকে 'অশ্মক' বলেছেন। ফলে পরবর্তী যুগের কোন কোন ভাষ্যকার যেমন নীলকণ্ঠ বলেছেন আর্যভট অশ্মক জনপদের অধিবাসী। অশ্মক খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশ ;—কেরল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন ভাষ্যকার তাই আর্যভটীয়-কে 'অশ্মক-স্ফুট-তন্ত্র' নামেও অভিহিত করেছেন। আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আর্যভটীয় গ্রন্থের বহু ভাষ্য এবং এই গ্রন্থের উপর রচিত অন্যান্য গ্রন্থও দাক্ষিণাত্যের কেরল রাজ্য থেকেই পাওয়া গেছে। আবার আর্যভটীয় পদ্ধতিতে কিছু কিছু পঞ্জিকা ব্যবহারের রীতি এখনো এই রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ-সব তথ্য থেকে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে হয়তো আর্যভট কেরল রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন এবং কুসুমপুরে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা করে থাকবেন। কিন্তু পণ্ডিত কৃপাশঙ্কর শুক্ল মহাশয় মনে করেন আর্যভট কুসুমপুরেরই অধিবাসী এবং সে সম্ভাবনা অধিক বলে মনে হয়।

॥ আর্যভট সমস্যা ॥

বাংলা সাহিত্যে যেমন চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সমস্যা আছে, তেমনি গণিতের ইতিহাসেও আর্যভট সমস্যা আছে। একই নামধারী অন্তত দু'জন আর্যভটের নাম ভারতীয় গণিতে আছে। একজন আর্যভট কুসুমপুর নিবাসী ও 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের রচয়িতা আর একজন হচ্ছেন 'মহা-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের লেখক আর্যভট। এই গ্রন্থের সর্বত্র প্রথম জনকে আর্যভট ও দ্বিতীয় জনকে দ্বিতীয় আর্যভট বলে উল্লেখ করব। আর্যভট পঞ্চম শতাব্দীর, আর দ্বিতীয় আর্যভট দশম শতাব্দীর—উভয়ের মধ্যে 500 বছরের ব্যবধান।

অলবিরুণী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে দুজন আর্যভটের উল্লেখ করেছেন,—একজন কুসুমপুর-নিবাসী, অপরজন তাঁরও পূর্ববর্তী। অলবিরুণীর মতে আর্যভটীয় গ্রন্থের লেখক পূর্ববর্তী আর্যভটের অনুসরণকারী। অলবিরুণীর কথা সত্য হলে আমরা তিনজন আর্যভটের নাম পাচ্ছি। কিন্তু তাঁর কথা মেনে নেওয়ায় অসুবিধা আছে।

কারণ তাঁর গ্রন্থের সব বিবরণ নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত নয়,—এমন কি অনেক অসঙ্গতিও আছে।

কিন্তু দ্বিতীয় আর্যভট তাঁর গ্রন্থের সূচনায় একটি শ্লোকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন '**বৃদ্ধ আর্যভটের**' সিদ্ধান্তগুলি খুব প্রাচীন এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর গ্রন্থে নানা ধরনের ভুল-ত্রুটির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে জন্যই তিনি নিজের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্বিতীয় আর্যভট কথিত '**বৃদ্ধ আর্যভট**' যদি পঞ্চম শতাব্দীর আর্যভট হন, তাহলে তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে আর্যভটীয় গ্রন্থের সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। কারণ সূচনায় পূর্ববর্তী আর্যভটের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু **আর্যভটীয়** ও **মহা**-সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। এমন কি উভয় গ্রন্থের প্রাথমিক নীতিও ভিন্ন প্রকৃতির। এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় হয়তো দ্বিতীয় আর্যভটের পূর্ববর্তী কোন এক আর্যভট ছিলেন, কিন্তু তিনি 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের লেখক নন। তাহলে কি তৃতীয় কোন আর্যভট ছিলেন?

তৃতীয় আর্যভটের অস্তিত্ব ব্রহ্মগুপ্তের দুটি উক্তি থেকে সম্ভাবনাময় করে তোলে। সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত '**ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত**' গ্রন্থে কুসুমপুর নিবাসী আর্যভটের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, আর্যভট তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত স্বীকৃত মতবাদ অগ্রাহ্য করে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি '**খণ্ড-খাদ্যক**' গ্রন্থে আর্যভটের প্রশংসা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু খণ্ড-খাদ্যকের গ্রহাবস্থানের সঙ্গে আর্যভটীয় গ্রন্থের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তা হলে কি ব্রহ্মগুপ্ত প্রশংসিত আর্যভট কুসুমপুর নিবাসী আর্যভট নন? দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কোন্ আর্যভটের প্রশংসা করেছেন তার উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালের ভাষ্যকারগণ এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন বৃদ্ধ বয়সে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কুসুমপুর নিবাসী আর্যভটের প্রশংসা করেছেন। যা হোক, সমস্যাটি যে তিমিরে সে তিমিরেই রইল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কৃত হলে তখন হয়তো এ-সমস্যার সমাধান হবে।

আর্যভটীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আর্যভটীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মাত্র 121টি শ্লোকে সংক্ষিপ্তাকারে গ্রন্থটি রচিত। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি জটিল এবং স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য। পতঞ্জলির যোগ-দর্শনের মত এই গ্রন্থটি চারটি পাদে বিভক্ত।

প্রথম পাদের নাম **গীতিকা-পাদ**। মোট 13টি শ্লোকের মধ্যে দশটি শ্লোক গীতিকা ছন্দে রচিত। এটি '**দশগীতিকা**' নামেও পরিচিত। এখানে মূল সংজ্ঞা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে, বৃহত্তর কাল মানের এককের সংজ্ঞা, বৃত্তীয় এককের সংজ্ঞা আলোচিত হয়েছে।

43,20,000 বছর পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর ঘূর্ণন, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহদের আবর্তনের সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে এবং পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহদের ব্যাস নির্ণয় করাও হয়েছে, আর সাইন-পার্থক্যের তালিকা এই পাদের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় পাদের নাম '**গণিত-পাদ**'। মোট শ্লোক সংখ্যা 33। এখানে তিনি বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রফল, বৃত্ত, পিরামিডের আয়তন, সমান্তর শ্রেণী, শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়, সুদকষা, ত্রৈরাশিক-নিয়ম, ভগ্নাংশ, ত্রিকোণমিতির সাইন-তালিকা প্রস্তুতি, দ্বিঘাত সমীকরণ, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় পাদের নাম '**কালক্রিয়া-পাদ**'। এখানে মোট 25টি শ্লোকে নানান সময়ের একক এবং সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান বিষয়ে আলোচনা আছে। এখানে বছরের মাস, দিন প্রভৃতিতে বিভাগ ও বিভিন্ন ধরনের বছর, মাস, দিনের আলোচনা আছে।

50টি শ্লোকে '**গোল-পাদ**'-এ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। গোলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানান সমস্যার নিয়ম এখানে প্রদত্ত হয়েছে। গ্রহণ ও গ্রহ-দর্শন সম্পর্কিত গণনা ও লৈখিক চিত্রের অবতারণা এই পাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষেপে আর্যভটীয় গ্রন্থের কয়েকটি বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হলো। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অনির্ণেয় সমীকরণ ভারতীয় গণিতজ্ঞদের একটি প্রিয় বিষয়। আর্যভটের পর অন্যান্য গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে আরো গবেষণা করেন এবং '**কুট্টক**' অধ্যায়ে এ-বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন। জ্যামিতিক সম্পাদ্য, শ্রেণী প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপর আর্যভটের বিশেষ অবদান নাই। মনে হয় তাঁর পূর্ব থেকেই এ-সব বিষয় এমন বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি আর এ-বিষয়ে অগ্রসর হননি। জৈন-গণিত, বকশালী পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের পর অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু যে-সব বিষয়ে আর্যভটের বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে, তা হচ্ছে π-এর মান নির্ণয়, সাইন-তালিকা প্রস্তুতি, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি ও

বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতি সংখ্যাকে তার পূর্ববর্তী সংখ্যার দশগুণ হিসাবে ধরা হয়েছে। এক (1), দশ (10), শত (100), সহস্র (1000) এভাবে 10^9 পর্যন্ত সংখ্যার কথা আছে।

মাঝে মাঝে এমন মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার হয়, যার মূল্যায়ন তখন সম্ভব হয় না। ফলে আবিষ্কারকের কপালে জুটে অশেষ লাঞ্ছনা। বিজ্ঞান জগতে গ্যালেলিও তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর ক্যান্টর তো পাগল হবার উপক্রম হয়েছিলেন। আর্যভট-প্রতিভার বিস্ময়কর অবদান "আর্যভটীয়" ও "গণক-চক্র-চূড়ামণি" ব্রহ্মগুপ্তের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়েছিল।

॥ π-এর মান ॥

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনায় π একটি অপরিহার্য ধ্রুবক। সে-কারণে ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে π এর মান নির্ণয় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতে বৈদিক যুগ ও তার পূর্ববর্তী সময় থেকেই π-এর ধারণা প্রচলিত ছিল। শুল্বসূত্রে ও জৈন গণিতে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে π-এর মান 3, $\sqrt{10}$ ও 3·0883 ধরা হয়েছে। কিন্তু গণিতজ্ঞরা যত সূক্ষ্মতর গণনার বিষয় চিন্তা করেছেন, ততই π-এর সূক্ষ্মতর মানের প্রয়োজন হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত π-এর স্থূল ও সূক্ষ্মমান হিসাবে যথাক্রমে 3 ও $\sqrt{10}$ ধরেছেন। এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে π-এর মান 3 ধরেছেন। কিন্তু দশমিক চতুর্থ স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ মান নির্ণয়ের কৃতিত্ব আর্যভটের। পঞ্চম শতাব্দীর বিশ্বগণিতের ইতিহাসে এই কৃতিত্বের নজির আর কারো নেই। আর্যভট গণিত-পাদের দশম শ্লোকে এই সূত্রটি দিয়েছেন :

> চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাম্।
> অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ॥

100-এর সঙ্গে 4 যোগ করে 8 দিয়ে গুণ করে 62,000 যোগ কর। এই ফলটি 20,000 ব্যাস-বিশিষ্ট বৃত্তের আনুমানিক পরিধি হবে।

অঙ্কে প্রকাশ করলে,

$$\pi = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = \frac{8(100+4)+62000}{20000} = 3{\cdot}1416$$

π-এর আসন্ন মানটি অবশ্যই ভগ্নাংশে ছিল। কারণ ভারতে দশমিকের প্রচলন অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। আর্যভট এই মান নির্ণয় বৃত্তের পাদ বিভাজন

দ্বারা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা π-এর আসন্ন মান দিয়েছেন ভগ্নাংশে—$\frac{3927}{1250}$। এরূপ মনে করা হয় যে, তাঁরা এটি আর্যভটের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। আবার এরূপ অনুমানও করা হয় যে স্বয়ং আর্যভট হয়তো কোন লুপ্ত সূর্য-সিদ্ধান্ত থেকে মানটি পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় আর্যভটের **'মহা-সিদ্ধান্ত'** ও ভাস্করের **'লীলাবতী'**-তে π-এর মান $\frac{22}{7}$ দেখা যায়। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও ভাষ্যকারগণ π-এর আরো শুদ্ধ মান নির্ণয় করেছেন, $\pi = 3{\cdot}141592653$।

π-এর আর্যভটীয় মানটি সম্পর্কে কোন কোন গণিত-ইতিহাসকার বলেন—এই মানটির উদ্ভব গ্রীসে। কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস π-এর মান $3\frac{1}{7}$ থেকে $3\frac{10}{71}$ বলেছেন অর্থাৎ $\frac{22}{7}$ হচ্ছে **আর্কিমিডিস** নির্ণীত মান। অন্য কোন গ্রীক গণিতজ্ঞ পৃথক আর কোন মান দেননি,—এক **টলেমী** ছাড়া।

বর্গমূল ও ঘনমূল

বর্গমূল নির্ণয়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন। জৈন গণিতে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয়ের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আর্যভটই প্রথম বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যা জৈন গণিতজ্ঞরা করেননি। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর পদ্ধতির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। শূন্যসহ দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে স্থানিক-মান দ্বারা সংখ্যা লিখনের অস্তিত্ব তাঁর বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি থেকেই প্রমাণিত হয়। এ থেকে অনুমিত হয়, সংখ্যা-লিখনের এই পদ্ধতি বহু পূর্বে প্রচলিত। ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধর, ভাস্করাচার্য, কমলাকর প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা আর্যভট প্রদর্শিত বর্গমূল নির্ণয়ের নিয়ম ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি ষোড়শ শতাব্দীর আগে পাশ্চাত্যে দেখা যায়নি। ক্যাটানিও (1546 খ্রীঃ) এবং কাটালডি (1613 খ্রীঃ) তাঁদের গ্রন্থে এই পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ চীনদেশে এই দুই পদ্ধতির প্রয়োগ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দেখতে পাওয়া যায়। চীনা ভাষায় বর্গমূলের নাম **"খাই ফ্যাং"** এবং ঘনমূলের নাম **"খাই লি ফ্যাং"**। যা হোক, বর্গমূল নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি মহান

গণিতজ্ঞ আর্যভটের অবদান। গণিত পাদের চতুর্থ শ্লোকটিতে বর্গমূল নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ :

> ভাগং হরেদ্ বর্গান্নিত্যং দ্বিগুণেন বর্গমূলেন।
> বর্গাদ্বর্গে শুদ্ধে লব্ধং স্থানান্তরে মূলম্ ॥

ঘনমূল নির্ণয়ের প্রাচীন কোন ইতিহাস জানতে পারা যায় না। অনুমান করতে কষ্ট হয় না আর্যভট-পূর্ব যুগে কোন-না-কোন প্রকারে এই পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল; হয়তো আর্যভটই প্রথম এই পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও নিয়ম দেন। আর্যভটের পর প্রাচীন ভারতের অন্য গণিতজ্ঞরা এই পদ্ধতির উদাহরণসহ উল্লেখ করেছেন।

আর্যভট যে সংখ্যাটির ঘনমূল নির্ণয় করতে হবে তার ডান দিক থেকে সংখ্যাটিকে **ঘন-, প্রথম অঘন-** এবং **দ্বিতীয় অঘন-স্থানে** ভাগ করে তিনটি করে জোড়া করেছেন। এভাবে সর্বশেষ ঘন-স্থান থেকে নিকটতম ঘন-সংখ্যাটি নির্ণয় করে প্রথম ঘনমূল নির্ণয় করেছেন। এ-পর্যন্ত আর্যভটের সঙ্গে আমাদের বর্তমান পদ্ধতির কোন অমিল নাই। ঘনমূল সম্পর্কিত গণিত-পাদের পঞ্চম শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হলো :

> অঘনাদ্ ভজেদ্ দ্বিতীয়াৎ ত্রিগুণেন ঘনস্য মূলবর্গেণ।
> বর্গস্ত্রিপূর্বগুণিতঃ শোধ্যঃ প্রথমাদ্ ঘনশ্চ ঘনাৎ ॥

ভাবানুবাদ :—(সর্বশেষ ঘন-স্থান থেকে নিকটতম বৃহত্তম ঘন বিয়োগ করে), দ্বিতীয় অঘন-স্থানকে প্রাপ্ত ঘনমূলের বর্গের তিনগুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে; তারপর প্রথম অঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের বর্গ দ্বারা পূর্বঘনমূলের তিনগুণ বিয়োগ করতে হবে। তারপর ঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের ঘন বিয়োগ করতে হবে। এভাবে পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে মূল নির্ণীত হবে।

আর্যভট কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রটির বিশ্লেষণ করলে ঘনমূল নির্ণয়ের পদ্ধতির চারটি পর্যায় পাওয়া যায় :

(1) সর্বশেষ ঘন-স্থানের নিকটতম বৃহত্তম ঘন নির্ণয়

(এখানে আমরা প্রথম ঘনমূল-অঙ্কটি পাই)

(2) দ্বিতীয় অঘন-স্থানকে প্রথম ঘনমূল-অঙ্কটির বর্গের তিনগুণ দ্বারা ভাগ

(3) প্রথম অঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের বর্গ দ্বারা পূর্ব ঘনমূলের তিনগুণ দ্বারা বিয়োগ

(4) ঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের ঘন বিয়োগ

যদিও চারটি সোপানে পদ্ধতিটি বিশ্লেষিত হলো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটির তিনটি সোপান। কারণ চতুর্থ সোপানে আমরা প্রথম সোপানের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি।

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতিটির প্রয়োগ দেখানো যাক।

	148055667	5—ঘনমূলের প্রথম অঙ্ক
নিকটতম বৃহত্তম ঘন 5^3	125	
প্রথম ঘনমূলের বর্গের তিনগুণ	180	2—ভাগফল
$=3\times5^2=75$	150	—ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্ক
	305	
ভাগফলের বর্গ × ঘনমূলের তিনগুণ $=2^2\times3\times5=60$	60	
	2455	
ভাগফলের ঘন $=2^3=8$	8	
ঘনমূলের বর্গের তিনগুণ $=3\times52^2=8112$	24476	3—ভাগফল—ঘনমূলের তৃতীয় অঙ্ক
	24336	
ভাগফলের বর্গ × ঘনমূলের তিনগুণ	1406	
$=3^2\times3\times52=1404$	1404	
	27	
ভাগফলের ঘন $=3^3=27$	27	
	×	

$\therefore$ নির্ণেয় ঘনমূল $=523$

॥ প্রগতি ॥

ভারতীয় গণিতে প্রগতির ইতিহাস অতীব প্রাচীন। 'তৈত্তিরীয় সংহিতা', 'বাজসেনীয় সংহিতা', 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে সমান্তর শ্রেণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে $2+3+4+\ldots\ldots+1000=500499$—এই সমান্তর শ্রেণীর সমষ্টি দেখতে পাওয়া যায়। প্রগতির প্রাচীন নাম 'শ্রেঢ়ী-ব্যবহার'। উল্লিখিত গ্রন্থাদিতে শ্রেণীর সমষ্টির নির্ভুল গণনা আছে বটে, কিন্তু কোন সাধারণ নিয়ম উল্লিখিত হয়নি। জৈন-গণিত ও বকশালী পাণ্ডুলিপিতে শ্রেণী সম্পর্কিত সমস্যা এবং তার নিয়ম আছে। কিন্তু আর্যভট শ্রেণীর সমষ্টি, মধ্যক, পদসংখ্যা নির্ণয়ের নির্ভুল নিয়ম ব্যক্ত করে ভারতীয় গণিতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

প্রগতিতে এই পারিভাষিক শব্দ সমূহ প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। প্রথম পদ= আদি, মুখ, বদন; সাধারণ অন্তর=চয়, প্রচয়, উত্তর; মধ্যপদ=মধ্য; শেষ-পদ=অন্ত্য; পদসংখ্যা=পদ, গচ্ছ; শ্রেণীর সমষ্টি=ফল, গণিত, সর্বধন, সঙ্কলিত।

সমান্তর শ্রেণীর আংশিক সমষ্টি নির্ণয়ে নিম্নরূপ সূত্রটি গণিতপাদের উনিশতম শ্লোকটিতে দেখা যায়:

ইষ্টং ব্যেকং দলিতং সপূর্বমুত্তরগুণং সমুখমধ্যম্।

ইষ্টগুণিতমিষ্টধনং ত্বথবাদ্যন্তং পদার্ধহতম্॥

ভাবানুবাদ:—প্রদত্ত পদসংখ্যার 1 হ্রাস করে, 2 দ্বারা ভাগ করে, পূর্বপদসংখ্যা (যদি থাকে) যোগ করে, সাধারণ অন্তর দ্বারা গুণ করার পর প্রথম পদটি যোগ করলে সমান্তর শ্রেণীর মধ্যক পাওয়া যাবে। এবং এই মধ্যককে প্রদত্ত পদসংখ্যা দ্বারা গুণ করলে প্রদত্ত পদসংখ্যার সমষ্টি পাওয়া যাবে। অপর পক্ষে, প্রথম ও শেষপদের সমষ্টিকে পদসংখ্যার অর্ধ দ্বারা গুণ করলে শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণীত হবে।

আধুনিক বীজগাণিতিক সঙ্কেতে প্রকাশ করলে,—

$a+(a+d)+(a+2d)+\ldots\ldots$ সমান্তর শ্রেণী হলে,

$(a+pd)+(a+\overline{p+1}d)+\ldots\ldots+\{a+(p+n-1)d\}$ এই n পদের,

(1) সামন্তরীয় মধ্যক $=a+\left(\dfrac{n-1}{2}+p\right)d$

(2) সমষ্টি $=n\left\{a+\left(\dfrac{n-1}{2}+p\right)d\right\}$

এখানে প্রথম পদ $=a$, সাধারণ অন্তর $=d$, $n=$ পদসংখ্যা।

আবার, প্রথম পদ $=A$ এবং শেষপদ $=L$ হলে,

সমান্তর শ্রেণীর সমষ্টি $=\frac{1}{2}(A+L)$

বিংশতম শ্লোকটিতে পদসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র প্রদত্ত হয়েছে।

গচ্ছোঽষ্টোত্তরগুণিতাদ্ দ্বিগুণাদ্যুত্তরবিশেষবর্গযুতাৎ।

মূলং দ্বিগুণাদ্যূনং স্বোত্তরভজিতং সরূপার্ধম্॥

"শ্রেণীর সমষ্টিকে সাধারণ অন্তরের 8 গুণ দিয়ে গুণ কর এবং তার সঙ্গে প্রথম পদের দ্বিগুণ ও সাধারণ অন্তরের বিয়োগফলের বর্গকে যোগ করে ঐ যোগফলের বর্গমূল নাও। এর থেকে প্রথম পদের দ্বিগুণকে বাদ দাও। এরপর ঐ প্রাপ্ত ফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে ভাগ কর এবং ঐ ভাগফলে 1 যোগ কর। এবার সর্বশেষ প্রাপ্ত এই ফলের অর্ধেক নাও।" (জ্ঞান ও বিজ্ঞান)

যদি $a+(a+d)+(a+2d)+(a+3d)+\cdots n$ পর্যন্ত শ্রেণীর সমষ্টি s হয়, তা হলে,

$$n=\frac{1}{2}\left[\frac{\sqrt{8ds+(2a-d)^2}-2a}{d}+1\right]$$

এক প্রকার স্বাভাবিক সংখ্যার শ্রেণীকে আর্যভট 'উপচিতি' বলেছেন। $1+2+3+4+\ldots+n$—এই শ্রেণীটির প্রথম পদ 1 এবং সাধারণ অন্তর 1 বলে আর্যভট এর নাম দিয়েছেন "একোত্তরাদি-উপচিতি"। আবার, $1+(1+2)+(1+2+3)+\ldots\ldots$, এই শ্রেণীটির নাম দিয়েছেন 'চিতিঘন'। 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে এই শ্রেণীটির সমষ্টির দু'রকম সূত্র পাওয়া যায়:

$$(1)\ \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \text{ এবং } (2)\ \frac{(n+1)^3-(n+1)}{6}$$

এ-ছাড়া স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ ও ঘন-সমষ্টি আর্যভট দিয়েছেন। বলা হয়, এই অভেদ নির্ণয়ে তিনিই পথিকৃৎ।

$$(1)\quad 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\tfrac{1}{6}\,n(n+1)(2n+1)$$

$$(2)\quad 1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3=(1+2+3+\ldots+n)^2$$

$$=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$$

উপরের দু'প্রকার শ্রেণীর নাম আর্যভটের মতে 'বর্গচিতিঘন' এবং 'ঘন-চিতিঘন। অবশ্য 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের বিখ্যাত ভাষ্যকার প্রথম ভাস্কর ওই শ্রেণী দুটির নামকরণ করেছেন যথাক্রমে "বর্গসঙ্কলনা" এবং "ঘনসঙ্কলনা"।

॥ সাইন-এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

সাইন-তালিকা প্রস্তুতি আর্যভটের গাণিতিক প্রতিভার আর এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রাপ্য কিনা ঠিক বলা যায় না। আর কি পদ্ধতিতে তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তা-ও অসমাধানিত রয়ে গেছে। অবশ্য পরবর্তীকালের ভাষ্যকারদের সূত্র অবলম্বন করে দু'একজন বিশেষজ্ঞ সম্ভাব্য পদ্ধতি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। দুরূহ ও জটিল এই পদ্ধতিটি আর এখানে বিবৃত হলো না। কিন্তু আমরা এখানে সাইন-এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র, PAP' বৃত্তের চাপ এবং A মধ্যবিন্দু। PAP'-কে ভারতীয় গণিতে 'ধনু' বলা হয় এবং PNP' ধনুকের ছিলা বা জ্যা। কালক্রমে

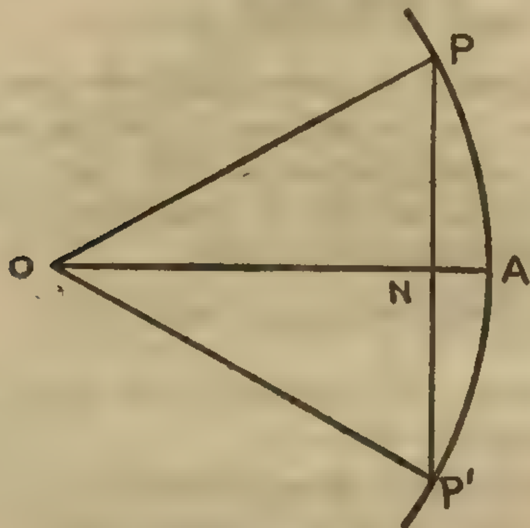

চিত্র—16

PN জ্যা, অর্ধ-জ্যা বা জীব-তে পরিণত হয়। ভারতীয় গণিতে PN-ই 'সাইন' —যদি $POA = \theta$ হয়, তা হলে জ্যা $\theta = PN = r \text{ Sin } \theta$ (r = ব্যাসার্ধ)। অর্থাৎ আধুনিক গণিতের সাইন-কে ব্যাসার্ধ দিয়ে গুণ করলে '**ভারতীয় সাইন**' পাওয়া যায়।

বর্তমান সাইন-এর উদ্ভব 'জ্যা' শব্দটি থেকে। আমরা জানি শব্দের অর্থান্তর ঘটে। ফলে কোন কোন শব্দ তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হারিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাংলা ভাষায় 'দারুণ' তেমনি একটি শব্দ। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'কাষ্ঠ' বা 'কাঠ'। কিন্তু বর্তমানে 'দারুণ' শব্দটি আমরা কি অর্থে ব্যবহার করি তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। 'জ্যা'-এর এক অর্থান্তরের ইতিহাস থেকে কেমনভাবে সাইনের উৎপত্তি হলো সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। 'জ্যা'-এর একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জীব'। আরবদের হাতে পড়ে 'জীব' হয় 'জিব্', পরে আবার পরিবর্তিত হয়ে 'জৈব্' হয়। আরবী অনুরূপ উচ্চারণ-যুক্ত অন্য একটি শব্দের অর্থ হচ্ছে 'হৃদয়'। পরবর্তীকালে রোমানরা ভুলক্রমে জিব →জৈব্-এর হৃদয় অর্থটি গ্রহণ করে। অর্থান্তরের স্তরগুলি দাঁড়াল : জ্যা > জীব

>জৈব্>হৃদয়>সাইনাস (Sinus)। 'সাইনাস' থেকেই উদ্ভব হলো বর্তমান 'সাইন'। গণিতের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।

॥ একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ॥

কোন একঘাত সমীকরণে দুটি অজ্ঞাত রাশি থাকলে একটির যে কোন মান ধরে অপরটির মান নির্ণয় করা যায়।

$2x \sim y = 1$ সমীকরণটিতে x এবং y দুটি অজ্ঞাত রাশি। x-এর ভিন্ন ভিন্ন মান ধরলে y-এরও ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, $x=1, y=1$; $x=2, y=3$; $x=4, y=7$ ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অজ্ঞাতরাশি দুটির অসংখ্য মান দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হয়। এরূপ যে সমীকরণের অসংখ্য বীজ থাকে, তাকে **অনির্ণেয় সমীকরণ** বলে।

বিশুদ্ধ গণিতে আর্যভটের এক মহৎ অবদান হচ্ছে একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির উদ্ভাবন। কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তিনি এই সমীকরণের সমাধান আবিষ্কার করেন এবং এরূপ সমাধান পদ্ধতি বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

॥ কয়েকটি জ্যামিতিক সূত্র ॥

একথা স্বীকার্য, ভারতীয় জ্যামিতি গণিতধর্মী,—পাটীগাণিতিক প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যেই ভারতীয় গণিতজ্ঞদের আনন্দ। আর্যভট জ্যামিতির উপপাদ্য ও সম্পাদ্য বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। তাঁর 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সূত্রাকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে সদৃশ ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত বিষয়ে আলোচনা করেছেন, শঙ্কু ও ছায়া সম্পর্কিত সমস্যার বিশেষ প্রয়োগও করেছেন। তথাকথিত পীথাগোরাসের উপপাদ্যটি সূত্রাকারে আর্যভট বলেছেন : **"যশ্চৈব ভুজাবর্গঃ কোটিবর্গশ্চ কর্ণবর্গঃ সঃ"**। অর্থাৎ ভুজ ও কোটির বর্গ যা কর্ণের বর্গও তাই।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র :—

ত্রিভুজস্য ফলশরীরং সমদলকোটী ভুজার্ধ সংবর্গঃ।

এখানে 'সমদলকোটি'-র অর্থ নির্ণয়ে জটিলতা আছে। বর্তমান ভাষায় সূত্রটি,—

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা।

বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র :—

সমপরিণাহস্যার্ধং বিষ্কম্ভার্ধহতমেব বৃত্তফলম্।

বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ পরিধি $\times$ ব্যাসার্ধ।

ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} h (a+b)$; a, b — সমান্তরাল বাহু, h — উচ্চতা।

গোলকের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 \times \sqrt{\pi r^2} = \pi r^3 \sqrt{\pi}$; r — ব্যাসার্ধ।

॥ আচার্য আর্যভট ॥

আর্যভট কেবলমাত্র গবেষণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি। সর্বদা সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলীর মাঝে যে তিনি গণিত ও জ্যোতিষের জ্ঞান বিতরণ করতেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে আর্যভটের প্রদর্শিত নীতি ও পথে '**আর্যভটীয় গোষ্ঠী**' গড়ে উঠে। ফলে আর্যভটের জনপ্রিয়তা এতখানি ছড়িয়ে পড়ে যে ব্রহ্মগুপ্ত '**খণ্ড-খাদ্যক**' গ্রন্থ লিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। কুসুমপুর আচার্যরূপে আর্যভটকে পেয়েই তৎকালে গণিত ও জ্যোতিষ চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। আচার্য আর্যভটের তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিষ্য পরম্পরা প্রচারিত হয়েছে এবং আর্যভটীয় গ্রন্থের উপর সংস্কৃত ও আঞ্চলিক ভাষায় বহু টীকা-ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ-সব থেকেই জানতে পারা যায় তিনি কী অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

আর্যভটের প্রধান ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন **প্রথম ভাস্কর** (629 খৃঃ)। গুরুর আবিষ্কৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা রচনা ও প্রচারে তাঁর অবদান অসামান্য ; অন্য শিষ্য **লাটদেব** জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় সর্বসিদ্ধান্তগুরুর সম্মান লাভ করেছিলেন। রোমক ও সূর্য-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাকার হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বরাহমিহির এই গণিতজ্ঞ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে প্রভাকরের নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম অধ্যায়

"In mathematics, it is even more important to be able to ask questions than to be able to answer them."
—A. H. Read.

বরাহমিহির

বরাহমিহিরের সময়কাল ধরা হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। তাঁর বিখ্যাত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থের রচনা কাল 505 খ্রীষ্টাব্দ বলে মনে করা হয়। বরাহমিহির জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু জৈন ধর্মাবলম্বী আর একজন বরাহমিহিরের নাম পাওয়া যায়। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁকে গণধর ভদ্রবাহুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সুপণ্ডিত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত 'কল্পসূত্র' গ্রন্থ থেকে কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হলো:

"তাঁহারা (শ্বেতাম্বর) বলেন, প্রতিষ্ঠান (গোদাবরী তীরস্থিত পৈথানা) নগর-বাসী ভদ্রবাহু ও বরাহমিহির দুই সহোদর ছিলেন। ভদ্রবাহুর গুরু যশোভদ্র তদীয় শিষ্য সম্ভূতবিজয় ও ভদ্রবাহুকে আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করায় বরাহমিহির ক্রুদ্ধ হইয়া জৈনধর্ম ত্যাগ করেন। 'বৃহৎ সংহিতা' নামক বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া বরাহমিহির বিদর্ভ দেশে বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সেই দেশের অশিক্ষিত জনগণের মনোহরণ করিবার জন্য তিনি প্রচার করিলেন যে, সূর্যদেবের আহ্বানে তিনি [বরাহমিহির] সৌর রথে আরোহণ করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং সকল গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া আসিয়াছেন। এই প্রচার কার্যের ফলে ঐ দেশের রাজা বরাহমিহিরের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে উক্ত দেশের জৈনদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। জৈনদিগের এই দুর্দশা দেখিয়া ভদ্রবাহু তাঁহার অলৌকিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা তর্ক যুদ্ধে তাঁহার সহোদর বরাহমিহিরকে পরাজিত করেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে বরাহমিহির পঞ্চত্ব লাভ করিয়া একটি 'দুষ্টব্যন্তর' অর্থাৎ অনিষ্টকারী অপদেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া জৈনদের ঘরে ঘরে নানাবিধ রোগের বীজ ছড়াইয়া দেন।"

'ভাদ্রবাহবী সংহিতা' অবলম্বনে এই কাহিনীর মধ্যে সত্যতা আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন না। যা হোক, আমাদের আলোচ্য বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। যদিও **'বৃহৎ সংহিতা'** নামে তাঁর একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে, তবুও ইনি ভদ্রবাহুর কল্পিত সহোদর নন।

বরাহমিহিরের ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে **'বৃহজ্জাতক'** গ্রন্থের উপসংহারে সামান্য একটু উল্লেখ আছে। একটি শ্লোক থেকে জানতে পারা যায় :

"আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্তবোধঃ কাপিত্থকে সবিতৃলব্ধ বরপ্রসাদঃ।" অর্থাৎ আদিত্যদাস তাঁর পিতা এবং তাঁর কাছে জ্ঞানলাভ করেন। কপিত্থ নামক স্থানে সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করে তিনি বর লাভ করেন। জন্মস্থান সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে, তিনি অবন্তীনগরের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মগধের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে উজ্জয়িনীতে এসে গ্রন্থ রচনা করেন।

গণিতজ্ঞ হিসাবে বরাহমিহিরের তেমন নাম নাই। এমন কি জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর কোন মৌলিক অবদান বা আবিষ্কার নাই। তাঁর খ্যাতি জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসকার হিসাবে। অবশ্য এটা আমাদের কম পাওনা নয়। কারণ তখনকার ও পূর্ববর্তী যুগের জ্যোতিষকার ও গণিতজ্ঞদের বিষয়ে নানান ইঙ্গিত আমরা এই ইতিহাসকারের রচনা থেকেই জানতে পারি। বরাহমিহির কোন মৌলিক আবিষ্কার নাই করুন, কিন্তু **পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকার** ন্যায় জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় তিনি মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে পাঁচখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের সার সংকলিত হয়েছে। এগুলি **পৌলিশ সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত, বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, সৌর সিদ্ধান্ত** ও **পৈতামহ সিদ্ধান্ত।** বরাহমিহিরের মতে এই পাঁচখানি সিদ্ধান্তের মধ্যে সৌরসিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ ও নির্ভুল, আর পৈতামহ ও বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'বৃহজ্জাতক' ও 'বৃহৎসংহিতা' নামে দুটি জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। এই দুই গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে—সময় নির্ধারণ, গ্রহদের অবস্থান, গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাঁর জ্যোতিষ গ্রন্থাদিতে ও হোরা শাস্ত্রে গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান। সে-কারণ তাঁর গ্রন্থে গ্রীক পারিভাষিক শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়।

আর্যভট আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য যদি পরবর্তীকালে সমর্থিত হতো, তা হলে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষের ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হতো। বিশেষ করে

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক নতুন আবিষ্কারের জন্য তিনি কঠোর ভাবে সমালোচিত হন। "বরাহমিহির আর্যভটের 'ভূ-ভ্রমণবাদ' সমর্থন করেননি। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় মেষরাশির আদিবিন্দু থেকেই নক্ষত্রচক্রের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। আর্যভটের আর্যভটীয়তেও মেষ রাশির আদি বিন্দুতেই বর্ষ গণনার সূত্রপাত। এমন হওয়া সম্ভব যে, বরাহমিহির আর্যভট অবলম্বনেই মেষ রাশির আদিবিন্দুতে নক্ষত্র চক্রের প্রারম্ভ নির্দিষ্ট করেন।" (—ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস)।

॥ প্রথম ভাস্কর ॥

ভারতীয় গণিতে দু'জন ভাস্করের নাম পাওয়া যায়। আলোচ্য ভাস্কর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। ইনি গণিতের ইতিহাসে প্রথম ভাস্কর নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ভাস্কর যিনি অসামান্য প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন, তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি সাধারণত ভাস্কর নামেই পরিচিত।

কুসুমপুর নিবাসী আর্যভটের প্রিয় শিষ্য প্রথম ভাস্করের গণিতে মৌলিক অবদান বেশী না থাকলেও তাঁর গুরুর মত ও পথ অবলম্বনে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাতেই তাঁর নাম কালের গ্রাস এড়িয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো প্রতিভাধর এই তরুণ ছাত্রটি গুরুর অলৌকিক প্রতিভায় এমনভাবে প্রভাবিত ও সমাচ্ছন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁর আর মৌলিকতা প্রকাশের সুযোগ ঘটেনি। আর্যভটের শিষ্যরা গুরুর প্রতি এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে, তাঁরা তাঁকে 'ভগবান' বা 'প্রভু' নামে সম্বোধন করতেন। এ-সম্পর্কে প্রথম ভাস্কর কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করতেন সে সম্বন্ধে 'মহা-ভাস্করীয়' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "**None except Āryabhaṭa has been able to know the motion of the heavenly bodies. Others merely move in the ocean of utter darkness of ignorance (Āryabhatiya ; K. S. Shukla).**

প্রথম ভাস্কর তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন,—'মহা-ভাস্করীয়', 'লঘু-ভাস্করীয়' এবং 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের উপর সুবিখ্যাত টীকা 'আর্যভটীয় সূত্রভাষ্য' বা 'আর্যভটীয় তন্ত্রভাষ্য'। 'মহা-ভাস্করীয়' গ্রন্থটি আর্যভটীয় গ্রন্থের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত তিনটি অধ্যায় অবলম্বনে আট অধ্যায়ে বিভক্ত ভাষ্য। এখানে অনির্ণেয় সমীকরণ, স্থান, কাল, দিক, গোলীয় ত্রিকোণমিতি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহদের

উদয় ও অস্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ধ্রুবক, তিথি ও বিবিধ বিষয়ের উদাহরণ-সহ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য **'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান'** গ্রন্থে মহা-ভাস্করীয়-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো বলেছেন : "এটিতে দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য এবং এক বর্ষে অধিমাস নির্ণয়ের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা আছে। গ্রন্থটিতে গ্রহদের অবস্থান নির্দেশ সঠিক কিনা তার নিরূপণের প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটিতে গ্রহকর্ম বিষয়ের বিবরণ আছে। এ বিষয়টি প্রথম আর্যভটের আর্যভটীয়তে প্রায় অনালোচিত।"

'লঘু-ভাস্করীয়'-ও আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এটি মহা-ভাস্করীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নবীন শিক্ষার্থীদের দুরূহ জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রবেশের সহজতম পথ।

একথা সত্য, আর্যভট অনির্ণেয় সমীকরণের আবিষ্কারক। কিন্তু এর সম্পূর্ণ রূপ, পদ্ধতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে প্রথম ভাস্করের বিস্তৃত গবেষণার জন্যই। এমন কি 'ছিন্নচ্ছেদপত্র' নামে তিনি এর একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনও করেন। গণিতে এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রথম ভাস্কর কেবলমাত্র গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন না, জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। 'আর্যভটীয় সূত্রভাষ্য গ্রন্থে নানা বিষয়ের উদ্ধৃতি তাঁর প্রতিভার বহুমুখীতা প্রমাণ করে। সেখানে ব্যাকরণ, বেদান্ত থেকে উদ্ধৃতি আছে, আর আছে মীমাংসা, অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি প্রভৃতি থেকে।

বিক্ষিপ্ত নানা উল্লেখ থেকে মনে হয় ভাস্করের পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কেরলের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সম্ভবত তিনি ওই দু'জায়গার কোন এক জায়গায় জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। দুটি জায়গার উল্লেখ থেকে মনে হয় তিনি একটি জায়গা থেকে উঠে গিয়ে অন্য জায়গায় বসবাস করে থাকবেন। যতদূর জানা যায় 629 খ্রীষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের বলভী-তে তিনি আর্যভটীয় সূত্রভাষ্য রচনা করেন।

নবম অধ্যায়

"The history of mathematics may be instructive as well as agreeable; it may not only remind us of what we have, but may also teach us how to increase our store."

—F. Cajori.

ব্রহ্মগুপ্ত

মুষ্টিমেয় যে কয়জন ভারতীয় গণিতজ্ঞ দেশ-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এমন কি বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্তের নাম সর্বপ্রথম করতে হয়। সর্জ সার্টন এই গণিতজ্ঞ সম্বন্ধে বলেছেন, "**One of the greatest scientists of his race and the greatest of his time.**" সপ্তম শতাব্দীর বিশ্বগণিতের ইতিহাসে এমন মৌলিক প্রতিভা খুব কমই দেখা যায়।

সৌভাগ্যের বিষয় ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বংশপরিচয়, আবির্ভাবকাল এবং গ্রন্থ প্রণয়নকাল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছেন। শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করা হলো :

শ্রীচাপবংশতিলকে শ্রীব্যাঘ্রমুখে নৃপে শকনৃপানাং
পঞ্চাশৎসংযুক্তৈর্বর্ষশতৈঃ পঞ্চভিরতীতৈঃ।
ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তঃ সজ্জনগণিতজ্ঞ গোলবিৎপ্রীত্যৈ
ত্রিংশদ্বর্ষেণ কৃতো জিষ্ণুসুতব্রহ্মগুপ্তেন।

—অর্থাৎ চাপবংশীয় নৃপ ব্যাঘ্রমুখের রাজত্বকালে 550 শকে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে গণিত ও গোলবিদগণের প্রীতির জন্য জিষ্ণুর পুত্র ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত রচনা করেন।

উদ্ধৃত শ্লোকটি থেকে জানতে পারা যায়, ব্রহ্মগুপ্তের জন্মকাল 598 খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর পিতার নাম জিষ্ণুগুপ্ত। অলবিরুনীর মতে মুলতান ও অহিলওয়ার নামক স্থানের মধ্যবর্তী ভিল্লমাল নামক স্থানে ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। বুহ্‌লারের মতে

গুজরাটের উত্তর সীমান্তবর্তী ভীনমাল বা শ্রীমালই হচ্ছে অলবিরুণী কথিত ভিল্লমাল। পূর্ব প্রচলিত ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ সাধন করে যুগোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর গ্রন্থের নাম দেন 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত'।

॥ ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

আর্যভটীয়-এর মত এই গ্রন্থটি ক্ষুদ্র নয়। এতে মোট অধ্যায় চব্বিশ,—অবশ্য ধ্যান-গ্রহ অধ্যায়টি বাদ দিলে। অলবিরুণী এই অধ্যায়টি বর্জন করার কথা বলেন। "কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, অধ্যায়টিতে বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর গাণিতিক সমাধানের চেয়ে অনুমাননির্ভর প্রচেষ্টাই নজরে আসে।" যা হোক,—এতে মোট শ্লোক সংখ্যা 1,022। প্রথম দশটি অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। গ্রহদের গড় গতি ও প্রকৃত গতি, স্থান-কাল-দূরত্ব সম্পর্কিত সমস্যা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহদের উদয় ও অস্ত সম্পর্কিত আলোচনাই অধ্যায়-গুলির বিষয়বস্তু। বাইশ সংখ্যক অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে। একাদশ অধ্যায়টি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ, এই 'তন্ত্র-পরীক্ষাধ্যায়'-এ অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মতের আলোচনা আছে। আর্যভট, লাট, শ্রীসেন, বিষ্ণুচন্দ্র ও প্রদ্যুম্ন কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন মতবাদ এই অধ্যায়ে সমালোচিত হয়েছে। এমন আত্ম-নির্ভরশীল ও দৃঢ় সমালোচনা প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। ব্রহ্মগুপ্তের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের পক্ষেই ওইরূপ সমালোচনা সম্ভব। বেদাঙ্গের যুগ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, জৈনদের দুই সূর্য, দুই চন্দ্র প্রভৃতি উদ্ভট কল্পনার তীব্র সমালোচনা এখানে দেখা যায়। তিনি আর্যভটের 'রাহু-কেতু তত্ত্ব' উপেক্ষা করে বলেন যে, গ্রহণ হওয়ার কারণ চন্দ্র ও পৃথিবী কর্তৃক ছায়া বিস্তার। অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা বোধ হয় কিছুটা রক্ষণশীল হন। আইনস্টাইন তার এক উদাহরণ। ব্রহ্মগুপ্ত সে-কারণে বোধ করি আর্যভটের "ভূ-ভ্রমণবাদ" স্বীকার করেননি।

গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। মাত্র সাড়ে চারটি অধ্যায় গণিতের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে গণিত ও কুট্টকের আলোচনা আছে। প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুসারে গণিতে পাটীগণিত, শ্রেণী, জ্যামিতি প্রভৃতির সংমিশ্রণ আছে। কুট্টক অধ্যায়ে আছে বীজগণিতের আলোচনা।

মানুষের প্রকাশের প্রথম ভাষা কবিতা। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে পদ্যের আবির্ভাব গদ্যের অনেক আগে। এই ঐতিহাসিক দিকটি বিচার করলে ভারতীয় রীতি কোন ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের প্রায় সব বিষয়ই ছন্দাকারে রচিত হয়েছে। অবশ্য এর অন্য কারণ থাকলেও রীতি ও ঐতিহ্যের যে অনুবর্তন আছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের ন্যায় 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত'-ও ঘনপিনদ্ধ ছন্দে রচিত বলে এর ব্যাখ্যা সহজ নয়। নবম শতাব্দীতে পৃথূদকস্বামী এর ভাষ্য রচনা করেন। বহু উদাহরণের সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্তের গাণিতিক নিয়ম ও ফলের ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটি বোঝার পথ সুগম করেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা হয়, উদাহরণগুলি পৃথূদকস্বামীর না ব্রহ্মগুপ্তের। সেকালের রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী গুরুর বিদ্যা ও শিক্ষা শিষ্য পরম্পরায় বাহিত হতো। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না যে ব্রহ্মগুপ্তের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ শিষ্য পরম্পরায় পৃথূদকস্বামীর নিকট পৌঁছায়নি। তাছাড়া ব্রহ্মগুপ্তের ন্যায় প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞ তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম ও সূত্রাদি উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেননি,—এরূপ কল্পনা করা যায় না।

॥ ব্রহ্মগুপ্তের অবদান ॥

ব্রহ্মগুপ্তের গাণিতিক প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনা গণিতের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বাইরে। তবুও এখানে আমরা তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামান্য আলোচনা করব।

পাটীগণিতে ব্রহ্মগুপ্তের উল্লেখযোগ্য বিশেষ অবদান নাই। কিন্তু বীজগণিতে রয়েছে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তথাকথিত **'পেলিয়াম সমীকরণ'** নামে খ্যাত দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের বীজ নির্ণয়ে তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। কিন্তু বিষয়টি সাধারণ পাঠকের পক্ষে জটিল হবে বলে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। অন্যত্র আমরা এ-বিষয়ের সামান্য অবতারণা করব।

A. দ্বিঘাত সমীকরণ

শুল্বসূত্রে ও বকশালী পাণ্ডুলিপিতে দ্বিঘাত সমীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এই সমীকরণ সমাধানের কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে সূত্রটি থাকলেও সমাধান পদ্ধতির কোন বিবরণ নাই।

আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত সুদকষা অঙ্কে এই সমীকরণের সমাধান সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নের সুদকষা অঙ্কটি ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত দ্বিঘাত সমীকরণ সংক্রান্ত একটি উদাহরণ।

উদাহরণ ঃ সমহারে 500 টাকার 4 মাসের সুদ 10 মাসের জন্য ধার দেওয়া হলে মোট সুদ 78 টাকা হয়। মাসিক সুদের হার নির্ণয় কর।

500 টাকার 4 মাসের সুদ x হলে,

সর্তানুসারে, সুদের মাসিক হার $\frac{1}{20}x\%$

$$\text{সুতরাং,}\quad \frac{x^2}{200}+x=78$$

$$\text{বা,}\quad x^2+200x-15600=0$$

$$\therefore\quad x=\frac{-200\pm\sqrt{(200)^2+4.15600}}{2}$$

$$=\frac{-200\pm 320}{2}=\frac{120}{2}=60$$

$$\therefore\quad \text{মাসিক সুদের হার } \frac{1}{20}\times 60=3\%$$

B. দু'একটি সূত্র

ভারতে দশমিকের প্রচলন অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে ভগ্নাংশ-বিষয়ের ধারণা প্রচলিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভগ্নাংশ-ঘটিত সূত্রের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এ-বিষয়ে ভগ্নাংশ প্রক্রিয়া সহজ ও সরল করার ব্যাপারে ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র আছে।

$\frac{a}{b}$ এই আকারের ভগ্নাংশকে সহজ ও সরল করার ব্রহ্মগুপ্ত প্রদর্শিত সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$\frac{a}{b}=\frac{a}{b+h}+\left(\frac{a}{b+h}\right)\frac{h}{b}$$

উদাহরণ ঃ (i) $\frac{1920}{93}=\frac{1920}{93+3}+\left(\frac{1920}{93+3}\right)\frac{3}{93}$

$$=\frac{\cancelto{20}{1920}}{\cancel{96}}+\frac{\cancelto{20}{1920}}{\cancel{96}}\cdot\frac{3}{93}=20\frac{60}{93}$$

এখানে $h=3$ ধরা হয়েছে।

(2) $\frac{9999}{97}=101+\frac{202}{97}=101+2\frac{2.4}{97}=103\frac{8}{97}$

এখানে $h=2$ এবং 4 ধরা হয়েছে।

(3) কোন সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ের সূত্র ঃ

$x^2=(x-y)(x+y)+y^2$.

উদাহরণ ঃ

$77^2=74.80+9=5929$।

এখানে $y=3$ ধরা হয়েছে।

এই নিয়মটি গ্রীকদের জানা ছিল। গ্রীক গণিতে এই সূত্রটি **'নিকোম্যাকাস সূত্র'** নামে পরিচিত। নিকোম্যাকাস খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

C. শ্রেণী

আর্যভটের ন্যায় ব্রহ্মগুপ্তও শ্রেণী বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত স্বাভাবিক সংখ্যা শ্রেণীর নাম দিয়েছেন **'একোত্তরমেকাত্ত'**। অবশ্য ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণী ভারতীয় গণিতে অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম এই ধারাটি মধ্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যযুগের অল্প খ্যাতিসম্পন্ন গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে এক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। মধ্যযুগের ধারাটি যদি রাজনৈতিক কারণে অবলুপ্ত না হতো, তা হলে ভারতীয় গণিত তথা ভারতীয় মণীষার এমন অধঃপতন ঘটত না। ব্রহ্মগুপ্ত স্বাভাবিক বর্গ-সংখ্যা ও ঘন-সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ দিয়েছেন ঃ

(1) $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(2) $1^3+2^3+3^3+\ldots\ldots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

সমান্তর শ্রেণীর আলোচনায় আর্যভটের চেয়ে ব্রহ্মগুপ্ত যেন আরো স্পষ্ট। শেষপদ, মধ্যপদ ও সমষ্টি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের গণিতাধ্যায়ে 17 নং সূত্র নিম্নরূপ :

পদমেকহীনমুত্তরগুণিতং সংযুক্তমাদিনাঽন্ত্যধনম্।
আদিযুতান্ত্যধনার্ধং মধ্যধনং পদগুণনং গণিতম্ ॥

অর্থাৎ "প্রথম পদ, সাধারণ অন্তর এবং পদসংখ্যা জানা থাকলে শেষ পদ কত সংখ্যা, মধ্য পদ কত সংখ্যা এবং যে কোন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা যেতে পারে। পদ সংখ্যা থেকে এক বিয়োগ করে ঐ বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ করে তারপর প্রথম পদ যোগ করলে শেষ পদ পাওয়া যাবে। এই শেষ পদের সঙ্গে প্রথম পদ আবার যোগ দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ দিলে মধ্য পদ পাওয়া যাবে। এই মধ্য পদকে পদসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমগ্র পদের সমষ্টি পাওয়া যাবে।" (প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা)

এখন, সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ$=a$, সাধারণ অন্তর$=b$ হলে,

(1) শেষতম পদ বা n-তম পদ$=a+(n-1)\,b$

(2) মধ্যপদ$=\frac{1}{2}\{2a+(n-1)\,b\}$

(3) সমষ্টি$=\frac{n}{2}\left\{2a+(n-1)\,b\right\}$

ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি বর্তমানে প্রচলিত সূত্রটির অনুরূপ নয়,—একটু তফাৎ আছে। বর্তমানে আমরা $a+ar+ar^2+\cdots$ n পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $\frac{a(r^n-1)}{r-1}$ সূত্রটি ব্যবহার করি। কিন্তু ভারতীয় গণিতজ্ঞরা r^n-এর স্থলে N ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ভারতীয় সূত্রটি $\frac{a(N-1)}{r-1}$। ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাষ্যকার সুপণ্ডিত পৃথূদকস্বামীর ব্যাখ্যা থেকে জানতে পারা যায় N-সঙ্কেতের অর্থ হচ্ছে 'r^n'। কিন্তু গুণোত্তর শ্রেণীর এই সূত্রটি স্বয়ং ভাষ্যকারের উদ্ভাবিত না ব্রহ্মগুপ্তের—এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না।

"গণিতজ্ঞদের রাজপুত্র" গাউস পাটীগাণিতিক সমাধানে আনন্দ পেতেন। ভারতীয় গণিতজ্ঞরাও সর্বত্র পাটীগাণিতিক প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে আনন্দ পেতেন। তাই, গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের পদ্ধতির মধ্যে পাটীগণিতের চলিত-নিয়ম

লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে নিয়মটি ও পরে একটি উদাহরণ দিয়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা N-অর্থে যে 'r^n' বোঝাতেন সেটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

নিয়ম ঃ—কোন গুণোত্তর শ্রেণীর পদসংখ্যা n যুগ্ম হলে, একটি স্তম্ভে $\frac{n}{2}$ লিখে ঠিক তার পাশের অন্য একটি স্তম্ভে বর্গ বোঝার জন্য 'S' (Square) লিখতে হবে, এবং n অযুগ্ম হলে একটি স্তম্ভে $(n-1)$ লিখে ঠিক তার পাশে অন্য একটি স্তম্ভে গুণ বোঝাবার জন্য 'm' (multiply) লিখতে হবে। পদসংখ্যা যুগ্ম অথবা অযুগ্ম হলে যথাক্রমে 2 দ্বারা ভাগ এবং 1 বিয়োগ দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম পদ বা 1-সংখ্যায় পৌঁছানো না যায়, ততক্ষণ এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অতঃপর ঊর্ধ্বক্রমে m-স্থানে 'r' দ্বারা গুণ এবং 'S'-স্থানে বর্গ করে একেবারে শেষপদে পৌঁছতে হবে।

ধরা যাক, কোন গুণোত্তর শ্রেণীর পদসংখ্যা $(n)=29=$অযুগ্ম। সুতরাং উপরের নিয়মানুসারে,—

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
$29-1$	$m=r\times r^{28}=r^{29}$
$\frac{28}{2}$	$S=(r^{14})^2=r^{28}$
$\frac{14}{2}$	$S=(r^7)^2=r^{14}$
$7-1$	$m=r\times r^6=r^7$
$\frac{6}{2}$	$S=(r^3)^2=r^6$
$3-1$	$m=r\times r^2=r^3$
$\frac{2}{2}$	$S=(r)^2=r^2$
1	$\rightarrow\ r$

সুতরাং $N=r^{29}=r^n$

॥ প্রাচীন উৎস ও ঐতিহাসিক উপাদান ॥

পাটীগণিতের অঙ্কের বিভিন্ন প্রকার উদাহরণের সঙ্গে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে সেই একই উদাহরণ বহু বহু শতাব্দী ধরে প্রায় অবিকল চলে আসছে। পার্থক্য কেবল এককে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতের এই দিকটি বেশ চিত্তাকর্ষক। এমন কি, যে ঐতিহাসিক উপাদানের জন্যে

আমরা হন্যে হয়ে চিঠিপত্র-দলিল-দস্তাবেজ, লিপিমালা, শিলালিপি, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতিতে অনুসন্ধান চালাই, তার উপাদান প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু অঙ্কের উদাহরণের মধ্যে নিহিত আছে, এ-কথা আমাদের ঐতিহাসিকদের মনে উদয় হয় না। আমাদের মনে হয়, গণিতের ন্যায় অতি বাস্তব বিষয়ের উদাহরণগুলি ঐতিহাসিকদের অনেক প্রামাণিক উপাদান যোগাতে পারে। কিন্তু সে-কথা থাক। আমরা এখানে ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থ থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে বর্তমানে প্রচলিত অঙ্কের প্রাচীনতা দেখাব।

1. **উদাহরণ :** চারটি নল যথাক্রমে 1 দিন, $\frac{1}{2}$ দিন, $\frac{1}{3}$ দিন ও $\frac{1}{6}$ দিনে একটি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে। নলগুলি এক সঙ্গে খুলে দিলে কখন চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে ?

2. **উদাহরণ :** চারটি বিদ্যালয়ে সম-সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। কোন পূজানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে বিদ্যালয়গুলি থেকে $\frac{1}{5}$ অংশ, $\frac{1}{4}$ অংশ, $\frac{1}{3}$ অংশ ও $\frac{1}{2}$ অংশ একত্রিত হলো। প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রদের সঙ্গে যথাক্রমে 1, 2, 3 ও 4 যোগ করলে 87 হয়। আবার ওই সংখ্যাগুলি বিয়োগ করলে 67 হয়। তা হ'লে প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে ক'জন করে ছাত্র এসেছিল ?

দুটি অঙ্কই অতি সহজ। সেজন্য সমাধান করা হলো না। আমাদের বক্তব্য উপরের অঙ্ক দুটির মত উদাহরণ এখনো পাটীগণিতের উদাহরণরূপে ব্যবহার করা হয়। প্রায় তেরো-চোদ্দ শ' বছর ধরে বংশ পরম্পরায় আমরা একই ধরনের অঙ্ক কষে আসছি। সেই **Tradition** সমানে চলেছে, কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি,— এস. ওয়াজেদ আলীর কথাটি বার বার মনে পড়ে।

॥ জ্যামিতি ॥

বৈদিক গ্রন্থে ত্রিভুজের উল্লেখ আছে, শুল্বসূত্রে ত্রিভুজ বিষয়ক আলোচনা আছে। কিন্তু জৈন গণিতজ্ঞরা ত্রিভুজ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। আর্যভট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন এবং সমকোণী ত্রিভুজের ধর্ম বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু ত্রিভুজ বিষয়ক আরো বিস্তৃত আলোচনা আমরা ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থে দেখতে পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ব্রহ্মগুপ্ত ত্রিভুজকে "একবাহু হীন চতুর্ভুজ" বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

স্থূলফলং ত্রিচতুর্ভুজবাহুপ্রতিবাহুযোগদলঘাতঃ।
ভুজযোগার্ধচতুষ্টয়ভুজোনঘাতাৎ পদং সূক্ষ্মম্ ॥

অর্থাৎ a, b, c ও d কোন চতুর্ভুজের বাহু হলে, স্থূল ক্ষেত্রফল$=\frac{a+c}{2}\cdot\frac{b+d}{2}$ এবং ত্রিভুজের স্থূল ক্ষেত্রফল$=\frac{\text{ভূমি}}{2}\cdot\frac{\text{অপর বাহুদ্বয়ের সমষ্টি}}{2}=\frac{a}{2}\cdot\frac{b+c}{2}$

কিন্তু শ্লোকের শেষাংশ থেকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূক্ষ্মতম মান পাওয়া যায়। ক্ষেত্রফল$=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, এখানে, $s=$অর্ধপরিসীমা$=\left(\frac{a+b+c}{2}\right)$

প্রমাণ ব্যতিরেকে তিনি মূলদ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমাধান নিম্নরূপ দিয়েছেন :

> কৃতিযুতিরসদৃশরাশ্যোর্বাহর্ঘাতৌ দ্বিসংগুণো লম্বঃ।
> কৃত্যন্তরমসদৃশয়োর্দ্বিগুণং দ্বিসমত্রিভুজে ভূমিঃ ॥

অর্থাৎ m ও n দুটি অসম মূলদ রাশি হলে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের বাহু m^2+n^2, ভূমি m^2-n^2 এবং উচ্চতা $2mn$ হবে। এই সূত্র থেকে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির পরিমাপ ভুজ$=m^2-n^2$, কোটি$=2mn$ এবং অতিভুজ$=m^2+n^2$ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের বাইশতম অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে ব্রহ্মগুপ্ত সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর পরিমাপ নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র দিয়েছেন। 'a' যদি সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহু হয়, তা হলে বাহু তিনটির পরিমাপ হবে, a, $\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{m}-m\right)$ এবং $\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{m}+m\right)$, m যে-কোন একটি মূলদরাশি।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ বাদে অন্য দুটি বাহুর যে-কোন একটি প্রদত্ত হলে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর পরিমাপ জানা যায়। আবার, অতিভুজ প্রদত্ত হলে বাহুগুলির পরিমাপ কিভাবে নির্ণীত হবে সে-পদ্ধতিও ব্রহ্মগুপ্তের অজানা ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এই সূত্রটি পাওয়া যায় না। মহাবীরাচার্য বাহুত্রয়ের পরিমাপ দিয়েছেন c, $\frac{2mnc}{m^2+n^2}$ এবং $\frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}\cdot c$

কিন্তু সূত্রটি মহাবীরের মৌলিক আবিষ্কার নয়। ব্রহ্মগুপ্তের সমকোণী ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের পরিমাপ নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র থেকেই এই সূত্রটি পাওয়া যায়।

কিন্তু "History of Theory of Numbers"-এর গ্রন্থকার ডিকসন উপরের সূত্র দুটির আবিষ্কারের সব কৃতিত্ব ফিবোনাচ্চি (Fibonacci) ও ভিয়েটাকে (Vieta) প্রদান করেছেন। প্রথম জন ত্রয়োদশ ও দ্বিতীয় জন ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর ব্রহ্মগুপ্ত এঁদের কত পূর্ববর্তী সে-কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নাই। তবে মনে হয়, ডিকসন ভারতীয় জ্যামিতি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না।

॥ একটি সম্পাদ্য ॥

যে দুটি সূত্র বিষয়ে আলোচনা হলো তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মগুপ্ত একটি সম্পাদ্যের অবতারণা করেছেন। এটি একটি অনুসিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হতে পারে।

সমস্যা ঃ দুটি বাহুর ছেদবিন্দুগামী উচ্চতাসহ এমন একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার বাহুগুলিকে মূলদরাশিতে প্রকাশ করা যায়।

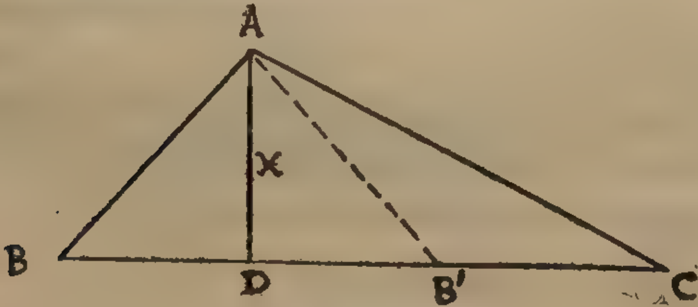

চিত্র—17

চিত্রে ABC ঈপ্সিত ত্রিভুজ। দুটি সমকোণী ত্রিভুজকে পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে যাদের একটি বাহু প্রদত্ত মূলদরাশি x। ABD এবং ADC দুটি সমকোণী ত্রিভুজাঙ্কনের দ্বারাই এরূপ সম্ভব।

ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র অনুসারে,—

$$AB=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a}+a\right),\ BD=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a}-a\right),$$

$$AC=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{b}+b\right),\ DC=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{b}-b\right)$$

সুতরাং $BC=BD+DC=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a}-a\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{b}-b\right)$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a}+\frac{x^2}{b}-a-b\right)$$

এখানে a এবং b যে-কোন মূলদরাশি, ব্রহ্মগুপ্ত কথিত 'ঐচ্ছিক' রাশি এবং x হচ্ছে 'ইষ্ট' অর্থাৎ প্রদত্ত মূলদরাশি।

12 একক উচ্চতা বিশিষ্ট কোন ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হলে, বাহুত্রয় 13, 14, 15 অথবা 13, 4 ও 15 একক বিশিষ্ট হবে। লক্ষণীয়, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ইউরোপীয় গণিতে এ ধরনের সমস্যা ও তার সমাধান নাই।

॥ চতুর্ভুজ ॥

চতুর্ভুজ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে দুটি গোষ্ঠী দেখা যায়। একদল চতুর্ভুজ বলতে বুঝতেন বৃত্তের চারটি জ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, আর অন্য দল বর্তমানে প্রচলিত ধারণা পোষণ করতেন। বেশীর ভাগ ভারতীয় গণিতজ্ঞ প্রথম মতানুসারী। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, মহাবীর এবং পরবর্তীকালের আর্যভটীয় গোষ্ঠী আছেন। আর্যভট কোন্ মতানুসারী সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু না বলা গেলেও তিনি প্রথম দলভুক্ত হবেন বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় দলে আছেন দ্বিতীয় আর্যভট এবং ভাস্করাচার্য। দ্বিতীয় আর্যভট সর্বপ্রথম ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের যাথার্থ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যদিও এটা দুর্ভাগ্যজনক, তিনি ব্রহ্মগুপ্তের তত্ত্বের সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি, তবুও গণিতে চতুর্ভুজ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ কম পাওয়া নয়। কারণ, এর ফলেই সাধারণ চতুর্ভুজ সম্পর্কীয় গবেষণার সূত্রপাত হয়।

বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ব্রহ্মগুপ্তের বিস্ময়কর অবদান আছে। কিন্তু তাঁর সূত্রে কোথাও 'অন্তর্লিখিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর গবেষণা, সূত্র এবং পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি থেকে মনে হয় এই উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। খুব সম্ভব, তাঁর সময়ে চতুর্ভুজ বলতে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজই বোঝানো হতো। দ্বিতীয় আর্যভটের পর থেকে বা তাঁর কিছু পূর্ববর্তী সময় থেকে সম্ভবত এই ধারণার পরিবর্তন হয়ে থাকবে। ফলে ব্রহ্মগুপ্তের তত্ত্ব

প্রশংসা ও নিন্দা এই উভয়ই কুড়োতে থাকে। যাই হোক,—ভারতীয় গণিতে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের দুটি তত্ত্ব ব্রহ্মগুপ্তের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

(1) ভুজযোগার্ধচতুষ্টয়ভুজোনঘাতাৎ পদং সূক্ষ্মম্ ॥

a, b, c এবং d -বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বাহু হলে, এর ক্ষেত্রফল

$$A=\sqrt{(s-a)\ (s-b)\ (s-c)\ (s-d)}\ ;\ \left[\ s=\frac{a+b+c+d}{2}\right]$$

(2) কর্ণাশ্রিতভুজঘাতৈক্যমুভয়থান্যোন্যভাজিতং গুণয়েৎ।
যোগেন ভুজপ্রতিভুজবধয়োঃ কর্ণৌ পদে বিষমে ॥

বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য a, b, c ও d হলে এবং x এবং y উহাদের কর্ণ হলে, উপরের সূত্র থেকে লেখা যায়,

$$x=\sqrt{\frac{(ab+cd)\ (ac+bd)}{ad+bc}}$$

$$\text{এবং}\quad y=\sqrt{\frac{(ad+bc)\ (ac+bd)}{ab+cd}}$$

এ-সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তটি বিস্ময়কর: তিনি বলেন, বৃত্তে অন্তর্লিখিত সকল চতুর্ভুজের বাহু, কর্ণ, লম্ব, ক্ষেত্রফল, এমন কি, পরিলিখিত বৃত্তের ব্যাস পর্যন্ত মূলদরাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এ-ধরনের চতুর্ভুজ "ব্রহ্মগুপ্তের চতুর্ভুজ" নামে খ্যাত।

এ-বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্তের তৃতীয় অবদান হচ্ছে দুটি সমকোণী ত্রিভুজের 'ভুজ' ও 'কোটি'-কে পরস্পরের অতিভুজের গুণনের দ্বারা বিষমবাহু চতুর্ভুজের বাহু নির্ণয়। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ:

জাত্যদ্বয়কোটিভুজাঃ পরকর্ণগুণাঃ ভুজাশ্চতুর্বিষমে।
অধিকো ভূমূর্খং হীনো বাহুদ্বিতয়ং ভুজাবন্যৌ ॥

অর্থাৎ দুটি 'জাত্য'-র কোটি ও ভুজকে পরস্পরের অতিভুজ দ্বারা গুণ করে বিষম চতুর্ভুজের বাহু পাওয়া যাবে। 'অধিক'টি ভূমি, 'হীন'-টি সম্মুখীন বাহু এবং অন্য দুটি পার্শ্ব বাহু।

পূর্ব পৃষ্ঠার সূত্রটি থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, চতুর্ভুজ অঙ্কনে দুটি সমকোণী ত্রিভুজ অপরিহার্য।

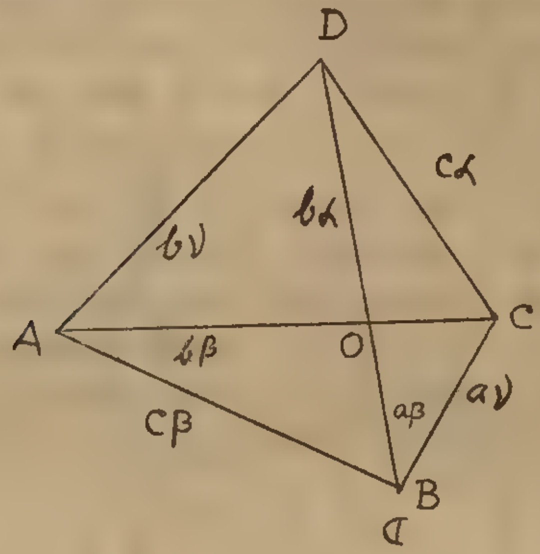

চিত্র—18

ধরা যাক, দুটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলি যথাক্রমে (a, b, c) এবং (α, β, γ) এবং এদের বাহুগুলি $c^2=a^2+b^2$ এবং $\gamma^2=\alpha^2+\beta^2$ এরূপ সম্বন্ধযুক্ত।

চিত্রে BOC এবং COD ত্রিভুজ দুটি অঙ্কন করা হলো এবং এদের বাহুগুলি যথাক্রমে $(a\alpha, a\beta, a\gamma)$ এবং $(\alpha a, \alpha b, \alpha c)$। BD-র অপর দিকে DOA এবং AOB দুটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো এবং এদের বাহুগুলি যথাক্রমে $(b\alpha, b\beta, b\gamma)$ এবং $(\beta a, \beta b, \beta c)$। সুতরাং $ABCD$ চতুর্ভুজের বাহুগুলি $(c\beta, a\gamma, c\alpha, b\gamma)$। এখানে কর্ণদ্বয় পরস্পর সমকোণে ছেদ করেছে।

এটি ব্রহ্মগুপ্তের চতুর্ভুজ।

এখন যদি (3, 4, 5) এবং (5, 12, 13) বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজ দ্বারা চতুর্ভুজ অঙ্কন করা যায়, তাহলে চতুর্ভুজের বাহুগুলি হবে 60, 39, 25, ও 52 একক বিশিষ্ট।

॥ ট্রাপিজিয়াম ॥

বৈদিক ও জৈন ধর্মে ট্রাপিজিয়ামের বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিশেষ করে সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামের অনুশীলন উভয় ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর জ্যোতির্বিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যাপকতার অরণ্যে এটি হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু ভারতীয় গণিতের সব যুগেই এর কিছু-না-কিছু অনুশীলন হয়েছে। আর্যভট ট্রাপিজিয়াম বিষয়ে মাত্র একটি সূত্র দিয়েছেন, ব্রহ্মগুপ্ত এর ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু তিনি এর অন্য জ্যামিতিক ধর্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকটিতে এই ধর্মের আভাস আছে। পৃথূদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক ব্যবহৃত **'অবিষম'**-এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন শব্দটি **'বর্গ'**, **'আয়তক্ষেত্র'** এবং **'সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম'** অর্থে প্রযোজ্য। ডঃ টি. এ. সরস্বতী আম্মার মতে 'অবিষম'-র অর্থ **"দুটি কর্ণ অসম নয়"** **(having the two diagonals not unequal)** হতে পারে। যাই হোক, ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র অবলম্বনে সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামের কর্ণ নির্ণয় করা যায়।

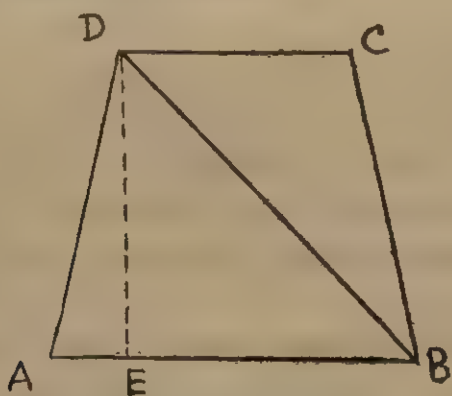

চিত্র—19

ধরা যাক, $ABCD$ ট্রাপিজিয়ামের বাহুর দৈর্ঘ্য a, b, c ও d
$DE \perp AB$ এবং B ও D যুক্ত করা হলো। তাহলে,

$$BD^2 = DE^2 + BE^2 = AD^2 - AE^2 + BE^2$$
$$= d^2 - \left\{\frac{(a-c)}{2}\right\}^2 + \left\{\frac{(a+c)}{2}\right\}^2$$
$$= d^2 + ac$$
$$= bd + ac \; [\because \; b = d]$$

যে চতুর্ভুজের বিপরীত দুটি বাহু সমান, সে-বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত বাহুগুলির পরিমাপ c, $\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{k}-k\right)+b$, c, এবং $\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{k}-k\right)-b$

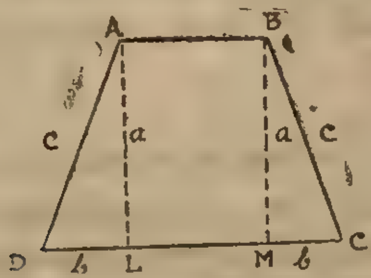

চিত্র—20

ADL ত্রিভুজের বাহুত্রয় c, a, এবং b। ব্রহ্মগুপ্তের সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত সূত্র অনুসারে ALC সমকোণী ত্রিভুজের একটি বাহু প্রদত্ত হলে, তিনটি বাহুর পরিমাপ হবে a, $\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{k}-k\right)$ এবং $\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{k}+k\right)$। সুতরাং $LC=\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{k}-k\right)$, $AC=\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{k}+k\right)$। অনুরূপে $DM=\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{k}-k\right)$। অতএব AB এবং CD বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় সম্ভব। এখন, যদি $AL \parallel BM$ হয়, তাহলে $ABCD$ একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম বলে গণ্য হয়।

॥ এক নতুন তত্ত্বের দিশারী ॥

ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত ছাড়া ব্রহ্মগুপ্ত বিশুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর 'খণ্ড খাদ্যক' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। 587 শকাব্দে বা 665 খ্রীষ্টাব্দে 67 বৎসর বয়সে তিনি এটি রচনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। আর্যভট সাইন-তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই সাইন-তালিকা থেকে মধ্যবর্তী সাইন-কোণ নির্ণয়ের এক অভিনব পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর 'খণ্ড খাদ্যক' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে তিনি যে সূত্রটি দিয়েছেন তা প্রায় এক হাজার বছর পরে নিউটন প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা আবিষ্কার করেন। পদ্ধতিটি প্রক্ষেপ তত্ত্ব (Theory of Interpolation) বলে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,

পরবর্তীকালের কোন গণিতজ্ঞের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ হয়নি। ভাস্করের ন্যায় প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে নিশ্চয় তত্ত্বটি সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারত। এমন কি মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতীয় গণিতজ্ঞরা যাঁরা আধুনিক গণিতের অনেক উচ্চতর গবেষণা করে গেছেন তাঁরাও হয়তো এক অভিনব সাফল্য লাভ করতে পারতেন।

॥ বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ॥

"গণক-চক্র-চূড়ামণি" ব্রহ্মগুপ্ত কেবল স্বদেশেই পূজিত হতেন না, বিদেশেও তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনটি ছিল সংরক্ষিত। খলিফা অল-মনসুর নামে বিখ্যাত আরব সুলতান টাইগ্রীস নদীর তীরে বাগদাদ নগরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমন্ত্রণে কঙ্ক নামে উজ্জয়িনীর এক পণ্ডিত গণিতজ্ঞ 770 খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে গিয়ে আরবদের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পাটীগণিত শিক্ষা দেন। সুলতানের আদেশে 796 বা 806 খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ইবন ইব্রাহিম অল্-ফজারী কর্তৃক ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত আরবী ভাষায় অনূদিত হয় 'সিন্দ্ হিন্দ্' বা 'হিন্দ্-সিন্দ্' নামে। ইয়াকুব ইবন তারিখ্ 'খণ্ড খাদ্যক' গ্রন্থটি 'আর্ কন্দ' বা 'অলর্কন্দ' নামে অনূদিত করেন। ভারতীয়দের পক্ষে এটা কম গৌরবের নয়।

॥ সংযোজন ॥

॥ বররুচি ॥

আর্যভট-পূর্ব কোন গণিতজ্ঞের নাম প্রায় আমরা জানি না। কিন্তু ভারতের দক্ষিণে সুদূর কেরালা রাজ্যে দু'একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় যাঁদের একজন অন্তত আর্যভট-পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন। তিনি হচ্ছেন কেরালার জ্যোতির্বিজ্ঞান ঐতিহ্যের জনক প্রথম বররুচি। এরূপ মনে করা হয় তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। এই সময় তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু দিন থেকে অনুমিত হয়। অনুমিত সময় হচ্ছে যথাক্রমে 343 ও 378 খ্রীষ্টাব্দ। 248টি চন্দ্র-বাক্যের রচয়িতা হিসাবে বররুচির পরিচয়। এই চন্দ্র-বাক্যগুলি "বররুচি বাক্য" নামে জনপ্রিয়। তাছাড়া 'কটপয়াদি' পদ্ধতির প্রচারক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে।

॥ হরিদত্ত ॥

ব্রহ্মগুপ্তের পর ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে যদি আর কারো নাম করতে হয়, তাঁর নাম **হরিদত্ত**। তিনি সম্ভবত 650 থেকে 700 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতি **'পরহিত'** পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য। কেরালার ঐতিহ্য থেকে জানতে পারা যায় মালাবার উপকূলের তিরুনাভে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ বর্ষীয় **'মহামঘ'** উৎসবের দিনে এই পদ্ধতির উদ্বোধন হয় এবং সেদিন ছিল কলিযুগের 3785 বর্ষ বা 683 খ্রীষ্টাব্দ। **'শকাব্দ-সংস্কার'** বা **'ভটসংস্কারের'** প্রবর্তক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। **'গ্রহচারনিবন্ধন'** ও **'মহামার্গনিবন্ধন'** নামে দুটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থটি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি,—প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির নাম জানতে পারা যায়।

॥ শ্রীধরাচার্য ॥

আর্যভটীয় পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা হরিদত্ত 'পরহিত' পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত হলেও কতখানি মৌলিক গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে-বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। হরিদত্তের পর প্রকৃত মৌলিক গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শ্রীধর। তাঁর সময়কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবকাশ আছে। 750 থেকে 991 খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে ধরা হয়। ডঃ কে. এস. শুক্ল মনে করেন তিনি 850 থেকে 950 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। ডঃ টি. এ. সরস্বতী আম্মা মনে করেন তিনি মহাবীরের পূর্ববর্তী।

শ্রীধর বিখ্যাত **'পাটীগণিত-সার'** গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে মোট তিনশ' শ্লোক আছে। সে-জন্য একে **'ত্রিশতিকা'**-ও বলা হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ও পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা যে-সব বিষয় পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তিনিও তাঁর ব্যতিক্রম নন। গুণনের ক্ষেত্রে **'প্রত্যুৎপন্ন'** নামে একটি নতুন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর গ্রন্থে গুণনের **'কপাট-সন্ধি'** পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা আছে।

শ্রীধর একখানি বীজগণিত গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে-গ্রন্থটি বর্তমানে অবলুপ্ত। যদি এই গ্রন্থটির কোন দিন বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত বা বকশালী পাণ্ডুলিপির মত হঠাৎ আবিষ্কার হয়, তাহলে ব্রহ্মগুপ্ত থেকে মহাবীর পর্যন্ত মধ্যবর্তী দু'শ বছরের গণিতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। ভাস্করাচার্যকে ধন্যবাদ, তিনি স্থানে স্থানে শ্রীধরের

গাণিতিক প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন এবং নিজ মত দৃঢ় ও স্পষ্ট করার জন্য দু'এক জায়গায় শ্রীধরের হারিয়ে যাওয়া বীজগণিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শ্রীধরের বীজগণিতের টুকরো টুকরো খবর ভাস্করের সৌজন্যেই পাওয়া যায়। দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ নির্ণয়ের পদ্ধতি আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

এখানে ত্রি-শতিকার একটি অঙ্ক উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো :

এক বারবনিতার সঙ্গে তার প্রিয়তমের প্রেম-কলহে একটি মুক্তামালার এক-তৃতীয়াংশ মেঝেতে এবং এক-পঞ্চমাংশ শয্যায় পড়ে গেল। এক-ষষ্ঠাংশ বারবনিতাটি রক্ষা করল, কিন্তু এক-দশমাংশ তার প্রিয়তমের কবলে গেল। যদি 6টি মুক্তা তখনো মালায় ঝুলতে থাকে, তা হলে কটি মুক্তা দিয়ে মালাটি নির্মিত হয়েছিল ?

মালায় মুক্তার সংখ্যা x হলে, সর্তানুযায়ী,—

$$x-(\tfrac{1}{3}x+\tfrac{1}{5}x+\tfrac{1}{6}x+\tfrac{1}{10}x)=6$$

বা, $x-\dfrac{24x}{30}=6$

বা, $x=30$

এই অঙ্কটি সমাজ-ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। অষ্টম-নবম শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্য রাখার পক্ষে গণিতের এই উদাহরণটি নিঃসন্দেহে প্রামাণিক। নাগর-জীবনের এমন বাস্তব চিত্র কি খুব বেশী লভ্য ?

শ্রীধর ট্রাপিজিয়ামের অর্থে 'চতুরস্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য শব্দটি 'বর্গ' এবং 'আয়তক্ষেত্র' বোঝাতেও তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি বর্গ ও আয়তের ক্ষেত্রফল দিয়েছেন ভূমি ও উচ্চতার গুণফল। অন্য চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল $=\frac{1}{2}$ (ভূমি + সম্মুখীন বাহু) × উচ্চতা। ট্রাপিজিয়ামের আর একটি নাম দিয়েছেন "ঋজু-বন্ধন-চতুর্বাহু"।

শ্রেণীর চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপনা শ্রীধরের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামের সাহায্যে সমান্তর শ্রেণীর উপস্থাপনা শ্রীধরের ত্রিশতিকার 'শ্রেঢ়ীক্ষেত্রে' আছে। ট্রাপিজিয়ামের উচ্চতা নির্ণয়ের পদ্ধতিটি শ্রীধরের নিজস্ব আবিষ্কার। কারণ, ভারতীয় কোন গণিতজ্ঞ আর এরূপ পদ্ধতির কথা বলেননি।

॥ গোবিন্দস্বামিন্ ॥

800 থেকে 850 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর যে খ্যাতনামা ভারতীয় গণিতজ্ঞ বর্তমান ছিলেন, তাঁর নাম গোবিন্দস্বামিন্। তিনি বিখ্যাত রাজজ্যোতিষী শঙ্করনারায়ণের গুরু ছিলেন। গোবিন্দস্বামিন্ গণিতে তেমন কোন অসাধারণ সাফল্য লাভ করেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রথম ভাস্করের পরম ভক্ত এবং আর্যভটীয় পদ্ধতি প্রচারের অন্যতম সমর্থক। **'মহাভাস্করীয়'** গ্রন্থের উপর তাঁর **'ভাষ্য'** রচনার মধ্যে গণিতের অনেক নতুন তথ্য আছে বলে মনে করা হয়। **'গোবিন্দকৃতি'** নামে তাঁর মৌলিক গ্রন্থ পরবর্তীকালের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদদের রচনা থেকে এ-কথা জানতে পারা যায়। কিন্তু আজও ওই গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়নি।

॥ শঙ্করনারায়ণ ॥

শঙ্করনারায়ণ ছিলেন গোবিন্দস্বামিনের শিষ্য। তিনি সম্ভবত 825 থেকে 900 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন বোরাখীয় চের (Cera) বংশীয় রাজা রবিবর্মার রাজজ্যোতিষী। শঙ্করনারায়ণ কোল্লাপুরীর অধিবাসী ছিলেন। গণিতে তাঁর বিশেষ অবদান সম্পর্কে কিছু জানতে পারা যায় না। তিনি 869 খ্রীষ্টাব্দে 'লঘুভাস্করীয়' গ্রন্থের উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁর সময় রাজকীয় অর্থানুকূল্যে কেরালায় একটি **মানমন্দির** প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বোধ করি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দশম অধ্যায়

"Mathematicians are like Frenchman ; whatever you say to them, they translate into their own language, and forthwith it is something entirely new."

—Goethe.

॥ মহাবীরাচার্য ॥

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে মহাবীরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনিই সম্ভবত প্রথম গণিতজ্ঞ যিনি বিশুদ্ধগণিত ছাড়া অন্য কোন বিষয় তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। নবম শতাব্দী পর্যন্ত প্রধান অপ্রধান সব গণিতজ্ঞই ছিলেন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। তাঁদের গ্রন্থের বেশীর ভাগ অংশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম মহাবীর।

জৈন ধর্মাবলম্বী মহাবীর জৈন ঐতিহ্য অনুসারে গণিতের চর্চা করেছেন। মাত্র অর্ধশতাধিক বৎসর পূর্বে তাঁর 'গণিত-সার-সংগ্রহ' আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও এই গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাস্কর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন গণিতজ্ঞ এই গ্রন্থের উল্লেখ করেননি। 'গণিত-সার-সংগ্রহ' এম. রঙ্গাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ ভারতে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ছিল। কানাড়ী ও তেলেগু ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য পাওয়া যায়।

মহাবীর নবম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তিনি রাজদরবারে সম্মানের আসন পেয়েছেন ; রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ (814—877) হয়তো স্বনামধন্য এই গণিতজ্ঞের উজ্জ্বল প্রতিভার নিদর্শন পেয়ে আনন্দিত চিত্তে তাঁকে পুরস্কৃত করতেন। জানিনা, জৈন ধর্মাবলম্বী এই গণিতজ্ঞ পার্থিব কোন সম্মান ও পুরস্কার গ্রহণ করে গর্ববোধ করতেন কি না! কিন্তু জৈন ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, গণিতের ন্যায় বিমূর্ত বিষয়ের ধ্যানধারণায় সর্বদা যিনি মগ্ন থাকতেন, তিনি রাজ সম্মানের লোভ পোষণ করতেন না। হয়তো রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ, তাঁর

দরবারের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্যই এই গণিতাচার্যকে রাজসভায় উপস্থিত হবার অনুরোধ জানাতেন।

॥ গণিত-সার-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

850 খ্রীষ্টাব্দে মহাবীর 'গণিত-সার-সংগ্রহ' রচনা করেন। এই গ্রন্থটি মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্রীধর ছাড়া মহাবীরের মত আর কোন ভারতীয় গণিতজ্ঞ বিশুদ্ধ গণিত গ্রন্থ রচনা করেননি। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের মত তিনিও উপাস্য দেবতার প্রার্থনা জানিয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন। কিন্তু এখানে মহাবীরের দেবতা কোন ব্রাহ্মণ্য দেবতা নন। তাঁর দেবতা জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের মত তাঁর গ্রন্থে অতি প্রাথমিক পাটীগাণিতিক প্রক্রিয়া যোগ-বিয়োগের কোন আলোচনা নাই। এতে বর্গ, বর্গমূল, ঘন ও ঘনমূল নির্ণয়, সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়, একক-ভগ্নাংশ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা, ত্রৈরাশিক, বীজগণিতের দ্বিঘাত ও অনির্ণেয় সমীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। পাটীগাণিতিক প্রক্রিয়ায় তিনি সর্বত্র দশগুণোত্তর স্থানিক-মান ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির নামকরণ করেছেন। কোন সংখ্যার চব্বিশটি অঙ্ক পর্যন্ত নামকরণের পরিচয় তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর্যভট প্রবর্তিত বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের ব্যবহারও তাঁর গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। মহাবীরের জৈন ও ব্রাহ্মণ্য উভয় প্রকার গণিতে ব্যুৎপত্তি ছিল। যে শ্রেণীর প্রথম কয়েকটি পদ নাই তার নাম দিয়েছেন 'ব্যুৎকলিত'। ভগ্নাংশিক প্রক্রিয়ায় ল. সা. গু-র ব্যবহার মহাবীরের প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ল. সা. গু-র নাম দিয়েছেন 'নিরুদ্ধ'। পরিস্থিতিতে ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় সমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, এমন কি কোন কোন বিষয়ে তিনি অগ্রণীর ভূমিকাও নিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে শূন্য (0) সম্পর্কিত সূত্র দেখতে পাওয়া যায় এবং ঋণাত্মক রাশির গুণন প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর শূন্য (0) দ্বারা ভাগের সিদ্ধান্তটি ত্রুটিপূর্ণ। তিনি বলেছেন কোন সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে।

॥ আচার্য মহাবীরের অবদান ॥

সত্য কথা বলতে কি, গণিতে মহাবীরের কোন মৌলিক অবদান নাই। তাঁর গাণিতিক প্রতিভার সৃজনাত্মক দিকটির পরিচয় গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে

পাওয়া যায় না। কিন্তু এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের আবিষ্কৃত নানা সূত্র ও ফল নিজ প্রতিভার কষ্টিপাথরে যাচাই করে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সংস্কার করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে **'বিশেষ'** **(particular)** থেকে **'সাধারণ'** **(general)**-এ পৌঁছেছেন। এখানেই মহাবীরের প্রধান কৃতিত্ব।

A. ॥ পাটীগণিত ॥

'গণিত-সার-সংগ্রহ' পাটীগণিত ও বীজগণিতের অঙ্কের আকর গ্রন্থ। নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক অঙ্ক এখানে আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত অঙ্কের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। মনে হয়, 'গণিত-সার-সংগ্রহ' একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের মত গ্রন্থটিতে আলোচনার একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হলো :

1. **উদাহরণ :** কোন আসলের 5, 7 ও 9 মাসে সুদাসল যথাক্রমে 50, 58 ও 60 হলে, সুদ নির্ণয় কর।

[এই অঙ্কটির সমাধানে $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a-c}{b-d}$ অভেদের সাহায্য গ্রহণ করা যায়]

2. **উদাহরণ :** মোট 8520-কে বিভিন্ন অংশে প্রতি মাসে শতকরা 3, 5 ও 8 হারে খাটানো হলো। 5 মাস পরে আসলগুলি থেকে তাদের সুদ বাদ দিলে, আসলগুলি সমান হয়। আসল নির্ণয় কর।

x, y ও z আসল হলে, প্রদত্ত সর্তানুসারে,

$$x+y+z=8520\cdots\cdots(1)$$

এখন, x-এর 5 মাসের সুদ $\frac{3}{20}x$

y এর „ „ „ $\frac{1}{4}y$

z এর „ „ „ $\frac{2}{5}z$

সুতরাং $x-\frac{3}{20}x=y-\frac{1}{4}y=z-\frac{2}{5}z$

বা $\frac{17}{20}x=\frac{3}{4}y=\frac{3}{5}z=k$

(1) নং সমীকরণ থেকে k-এর মান পাওয়া যায় 2040

$$\therefore \left.\begin{array}{l} x=2400 \\ y=2720 \\ z=3400 \end{array}\right\}$$

3. উদাহরণ : কোন্ সংখ্যাকে 7 দ্বারা ভাগ, 3 দ্বারা গুণ এবং বর্গ করার পর 5 যোগ করে $\frac{3}{5}$ দ্বারা ভাগ ও অর্ধ করে বর্গমূল নিলে 5 হয় ?

এ ধরনের অঙ্কের নিয়ম 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে দেওয়া আছে। খুব সম্ভব আর্যভটের পূর্ব থেকে এ ধরনের অঙ্ক ভারতে প্রচলিত ছিল। আর্যভটের সূত্রটি :

গুণকারা ভাগহরা ভাগহরাস্তে ভবন্তি গুণকারাঃ।
যঃ ক্ষেপঃ সোঽপচয়োঽপচয়ঃ ক্ষেপশ্চ বিপরীতে ॥

একই নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণনা ব্রহ্মগুপ্তের পর থেকে প্রায় সব ভারতীয় গণিতজ্ঞরা করে গেছেন। মহাবীর কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মটি অনুবাদ করে দেওয়া হলো।

নিয়ম : শেষ থেকে শুরু করে গুণ-স্থানে ভাগ, ভাগ-স্থানে গুণ, যোগ-স্থানে বিয়োগ, বিয়োগ-স্থানে যোগ, বর্গ-স্থানে বর্গমূল করে ঈপ্সিত সংখ্যা পাওয়া যায়।

অঙ্কটি প্রাথমিক স্তরের, তবুও কষে দেখানো হলো।

(1) $(5)^2=25$

(2) $25\times 2=50$

(3) $50\times\frac{3}{5}=30$

(4) $30-5=25$

(5) $\sqrt{25}=5$

(6) $5\div 3=\frac{5}{3}$

(7) $\frac{5}{3}\times 7=\frac{35}{3}=11\frac{2}{3}$

$\therefore$ নির্ণেয় সংখ্যা—$11\frac{2}{3}$

4. উদাহরণ : এক ব্যক্তি বাড়ীতে কিছু আম নিয়ে এলো। জ্যেষ্ঠ পুত্র

একটি আম নিয়ে অবশিষ্টের অর্ধেক নিল ; অতঃপর কনিষ্ঠ পুত্রও তাই করল। অবশিষ্ট আম বাড়ীর অন্যান্যরা নিলে ব্যক্তিটি কতগুলি আম নিয়ে এসেছিল ?

এই অঙ্কটি অনির্ণেয় সমীকরণের এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। এ ধরনের অঙ্কের নির্দিষ্ট কোন উত্তর পাওয়া যায় না,—অসংখ্য উত্তর হতে পারে। 'y' আমের সংখ্যা এবং 'x' অন্যান্যরা পেয়ে থাকলে অনির্ণেয় সমীকরণটি হয়, $y=4x+3$

এখন, xএর ঐচ্ছিক মান ধরে yএর অসংখ্য মান পাওয়া যায়। যেমন, $x=1, 2, 3$.......ধরলে $y=7, 11, 15$...হয়।

॥ মাল্য-গুণন ("Garland product") ॥

নিম্নলিখিত গুণফলসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেগুলি যেন মালার মত সজ্জিত আছে। তাই এদের মাল্য-গুণন বা 'Garland product' বলা হয়। মজার কথা এই যে ডান দিক বা বাম দিক যে-দিক থেকেই পড়া যাক না কেন সংখ্যার অঙ্কগুলি অপরিবর্তিত থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত রবার্ট মে-এর 'অঙ্ক পুস্তকং'-এ বেশ মজার এক ধরনের মাল্য-সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।

(1) $139\times109=15151$

(2) $12345679\times9=111, 111, 111$

(3) $152207\times73=111, 11, 111$

(4) $27994681\times441=12345654321$

(5) $333333666667\times33=11000011000011$

(6) $14287143\times7=100010001$

(7) $142857143\times7=1000000001$

(8) $11011011\times91=1002002001$

॥ একক ভগ্নাংশ ॥

এই লেখকের 'গণিতের কথা ও কাহিনী'-তে মিশরীয় একক-ভগ্নাংশের সামান্য আলোচনা আছে। তাই সে-বিষয়ে এখানে আর আলোচনা করা হলো না। ভগ্নাংশের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে আছে, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার 'ওজন' এবং 'স্কেল' থেকে প্রমাণিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর

পূর্বেও ভারতে ভগ্নাংশের প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে 'অর্ধ', 'ত্রিপাদ' প্রভৃতি শব্দ $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ সূচিত করে। প্রাচীন শুল্বসূত্রে পঞ্চদশ-ভাগ$=\frac{1}{15}$, সপ্ত-ভাগ$=\frac{1}{7}$। আবার কখনো 'ভাগ'-এর উল্লেখ না করেই ভগ্নাংশ বোঝানো হয়েছে। ত্রি-অষ্টম$=\frac{3}{8}$, দ্বি-সপ্তম$=\frac{2}{7}$ প্রভৃতি। বর্তমানে ভগ্নাংশ রাশি পড়ার প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী।

একক-ভগ্নাংশ বিষয়ে মহাবীর যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তেমনটি অন্য কোন ভারতীয় গণিতজ্ঞ দেখাননি। একক-ভগ্নাংশের ভারতীয় নাম **"রূপাংশক রাশি"** অর্থাৎ যে রাশির লব একক।

1. 1-কে 'n'-সংখ্যক একক ভগ্নাংশে পরিণত কর।

$$1=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\dots+\frac{1}{3^{n-2}}+\frac{1}{2.3^{n-2}}$$

সূত্র :—একক লব বিশিষ্ট বিভিন্ন রাশির সমষ্টি 1 হলে হরগুলিকে 1 থেকে শুরু করে ক্রমাগত 3 দ্বারা গুণ করতে হবে যার প্রথম ও অন্ত্যহরকে যথাক্রমে 2 এবং $\frac{2}{3}$ দ্বারা গুণ করতে হবে।

মহাবীরের ভাষায় সূত্রটি নিম্নরূপ :

"রূপাংশকরাশীনাং রূপাদ্যাস্ত্রিগুণিতা হরা ক্রমশঃ।
দ্বিদ্বিত্র্যংশাভ্যস্তাবাদিমচরমৌ ফলে রূপে ॥"

1-কে 5টি একক ভগ্নাংশে পরিণত করতে হলে প্রথম পদ$=\frac{1}{2}$, শেষ পদ $=\frac{1}{2.3^{5-2}}=\frac{1}{2.27}=\frac{1}{54}$ এবং মধ্যবর্তী রাশিগুলি হবে $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3^2}$ এবং $\frac{1}{3^3}$

সুতরাং $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{54}$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{54}$$

2. যে-কোন ভগ্নাংশকে একক ভগ্নাংশে পরিণত কর।

$\frac{p}{q}$ প্রদত্ত ভগ্নাংশ ($p<q$) হলে, i এমন একটি ঐচ্ছিক রাশি যে $\frac{q+i}{p}$ একটি অখণ্ড রাশি এবং তা r-এর সমান হলে,

$\frac{p}{q}=\frac{1}{r}+\frac{t}{r.q}$। পুনরায় $\frac{t}{rq}$ রাশিতে পূর্বোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরবর্তী পদ পাওয়া যাবে। এভাবে পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা সমগ্র একক ভগ্নাংশ নির্ণয় করা যায়।

সূত্র ঃ প্রদত্ত ভগ্নাংশের হর কোন ঐচ্ছিক রাশির সঙ্গে যুক্ত করে লব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হলে একক ভগ্নাংশের প্রথম পদ পাওয়া যায়। ঐচ্ছিক রাশিকে পূর্বের ভাগফল ও হরের গুণফল দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভগ্নাংশে পূর্বোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরবর্তী একক-ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। সমগ্র একক-ভগ্নাংশটি না পাওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

উদাহরণ ঃ $\frac{7}{8}$-কে একক ভগ্নাংশে পরিণত কর।

পূর্বোক্ত নিয়মে প্রথম পদ$=\frac{8+6}{7}=2\rightarrow\frac{1}{2}$

" " দ্বিতীয় পদ$=\frac{8+1}{3}=3\rightarrow\frac{1}{3}$

" " তৃতীয় পদ$=\frac{1}{3.8}=\frac{1}{24}$

সুতরাং $\frac{7}{8}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{24}$

একক ভগ্নাংশ সম্পর্কিত আরো কয়েকটি সূত্র গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। 1-কে অযুগ্ম সংখ্যক একক ভগ্নাংশে প্রকাশ, প্রদত্ত একক ভগ্নাংশকে r-সংখ্যক ভগ্নাংশে প্রকাশ যার লবগুলি হবে a_1, a_2, a_3.......a_r, কোন একক ভগ্নাংশকে দুটি একক ভগ্নাংশের সমষ্টিরূপে প্রকাশ প্রভৃতি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহাবীরই প্রথম ভারতীয় গণিতজ্ঞ যিনি ল. সা. গু. বা নিরুদ্ধ-এর সাহায্যে ভগ্নাংশ-প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির কথা বলেছেন। নিরুদ্ধের সংজ্ঞা : "The product of the common factors of denominators and their resulting quotients is called Niruddha."

॥ কয়েকটি সূত্র ॥

মহাবীর চতুর্ভুজকের আয়তন নির্ণয়ের দুটি সূত্র দিয়েছেন। একটি স্থূল ও অপরটি সূক্ষ্ম। সূত্রটি উদ্ধৃত করা হলো :

ভুজকৃতিদলঘনগুণদশপদনবহৃৎ ব্যাবহারিকং গণিতম্।
ত্রিগুণং দশপদভক্তং শৃঙ্গাটকসূক্ষ্মঘনগণিতম্ ॥

অর্থাৎ প্রান্তিকীর বর্গের অর্ধ করার পর ঘন করে দশ দ্বারা গুণ করে বর্গমূল করে নয় দ্বারা ভাগ করলে স্থূল আয়তন পাওয়া যাবে। আর একে তিন দ্বারা গুণ ও দশের বর্গমূল দ্বারা ভাগ করলে সূক্ষ্ম আয়তন পাওয়া যাবে।

$$\text{সুতরাং স্থূল আয়তন}=\frac{\sqrt{\left(\frac{a^2}{2}\right)^3.10}}{9}=\frac{\sqrt{10}.a^3}{18\sqrt{2}}$$

$$\text{সূক্ষ্ম আয়তন}=\frac{\sqrt{10}.a^3}{18\sqrt{2}}.\ \frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{a^3}{6\sqrt{2}}$$

[এখানে a = চতুস্তলকের প্রান্তিকী]

চতুস্তলকের ন্যায় গোলকের আয়তন নির্ণয়েরও দুটি সূত্র গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যাসার্ধঘনার্ধগুণা নব গোল ব্যাবহারিকং ফলম্।
তদ্‌দশমাংশং নবগুণমশেষসূক্ষ্মং ফলং ভবতি ॥

অর্থাৎ ব্যাসার্ধের ঘন-র অর্ধেককে নয় দ্বারা গুণ করলে স্থূল আয়তন পাওয়া যায় এবং একে নয়-দশমাংশ দ্বারা গুণ করলে সূক্ষ্ম আয়তন পাওয়া যায়।

$\text{স্থূল আয়তন}=r^3.\ \frac{9}{2}=\frac{3}{2}\pi r^3$ [যেহেতু $\pi=3$ মহাবীরের মতে]

$$\text{সূক্ষ্ম আয়তন}=r^3.\ \frac{9}{2}.\ \frac{9}{10}=\frac{81r^3}{20}$$

মহাবীর $\pi=\sqrt{10}$ সূক্ষ্ম মনে করেন বলে, সূক্ষ্ম আয়তন $=1{\cdot}3\pi r^3$

মহাবীর কর্তৃক নির্ণীত গোলকের আয়তন বর্তমানে প্রচলিত আয়তন $\frac{4}{3}\pi r^3$-এর প্রায় কাছাকাছি।

ইতিমধ্যে সমবায় ও বিন্যাসের প্রাচীনত্বের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। নিঃসন্দেহে জৈন গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন,—"মেরু-প্রস্তর" তাঁদের রচনা। কিন্তু সমবায়ের সাধারণ সূত্রটির জন্য আমরা মহাবীরের নিকট ঋণী। সে-কারণে বিশ্বগণিতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অবশ্যই নির্দিষ্ট হবে। সমবায়ের সাধারণ সূত্র :

$$nCr=\frac{n\,(n-1)\,(n-2)\ \ldots(n-r+1)}{1.\ 2.\ 3.\ 4\ldots\ldots r}$$

॥ জ্যামিতি ॥

জ্যামিতিতে মহাবীরের উল্লেখযোগ্য অবদান তেমন কিছু নাই বললেই চলে। পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের পথ অনুসরণ ছাড়া মহাবীর আর কিছু করেননি। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম উপবৃত্ত প্রসঙ্গের উত্থাপন। ব্রহ্মগুপ্তের মত তিনিও বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন। এবং তিনিও চতুর্ভুজটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত কিনা উল্লেখ করেননি। মহাবীর পাঁচ প্রকার চতুর্ভুজের উল্লেখ করেছেন :

1. 'সম'—চারটি বাহুই সমান অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র ও রম্বস।
2. 'দ্বি-দ্বিসম'—বিপরীত বাহুযুগল সমান অর্থাৎ আয়তক্ষেত্র ও সামন্তরিক।
3. "দ্বিসম'—দুটি বাহু সমান অর্থাৎ সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম।
4. 'ত্রিসম'—তিনটি বাহু সমান অর্থাৎ তিন বাহু সমান বিশিষ্ট ট্রাপিজিয়াম।
5. 'বিষম'—বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ।

মহাবীর ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন,—

$$A=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)s-d)}$$

[s=অর্ধপরিসীমা]

এবং $A=\frac{1}{2}$ (ভূমি + সম্মুখীন বাহু) × উচ্চতা।

বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$

এরূপ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল = ফলং শ্রুতিগুণার্ধম্ $=\frac{1}{2}\times d_1\times d_2$

[d_1, d_2=কর্ণ]

মহাবীর কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের পরিব্যাসের সূত্রটি ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা স্পষ্ট।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রে মহাবীরের বিস্তৃত আলোচনা আছে। তিনি ত্রিভুজকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন,

(1) 'সম'—সমবাহু ত্রিভুজ।

(2) 'দ্বিসম'—সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

(3) 'বিষম' (scalene)—বিষমবাহু ত্রিভুজ।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের দু'রকম সূত্রই গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়।

(1) $A=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

(2) $A=\frac{1}{2}\times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

সমবাহু ত্রিভুজের স্থূল ক্ষেত্রফল $= \frac{a}{2} \cdot a = \frac{a^2}{2}$

এবং সূক্ষ্ম ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি ও বাহু নির্ণয়ের সূত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, এর উচ্চতা ভূমিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। তাঁর পরিব্যাসের সূত্রটি,

$$r = \frac{\text{বাহুগুলির গুণফল}}{2 \times \text{উচ্চতা}}$$

মহাবীর সর্বপ্রথম ত্রিভুজে অন্তর্লিখিত বৃত্তের এবং ব্যাসের কথা বলেন। কিন্তু অন্তঃকেন্দ্রটি ত্রিভুজের কোণগুলির সমদ্বিখণ্ডের উপর অবস্থিত হবে কিনা, এ-বিষয়ে কিছু জানতে পারা যায় না।

তিন বা ততোধিক সমবৃত্ত পরস্পর স্পর্শ করে যে স্থান সীমাবদ্ধ করে, তার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য নারায়ণ পণ্ডিতও অনুরূপ সূত্র দিয়েছেন।

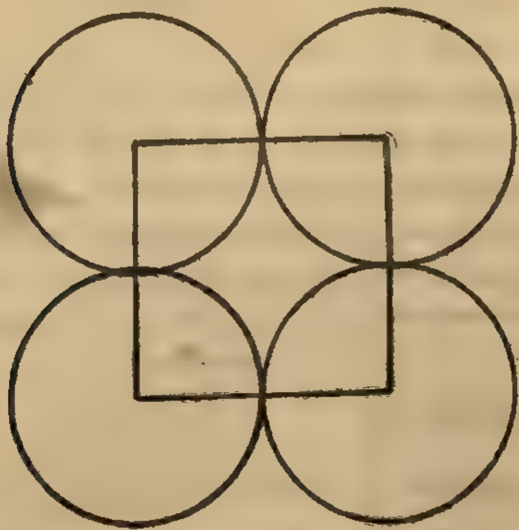

চিত্র—21

d যদি বৃত্তের ব্যাস হয়,

তা হলে চারটি সমবৃত্ত কর্তৃক সীমাবদ্ধ স্থানের ক্ষেত্রফল $= d^2 - \frac{\pi d^2}{4}$

আবার, তিনটি বৃত্তের ক্ষেত্রে অনুরূপ সীমাবদ্ধ স্থানের ক্ষেত্রফল = ব্যাস-বাহু বিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $=\frac{1}{2}\times$ (যে কোনো বৃত্তের ক্ষেত্রফল)

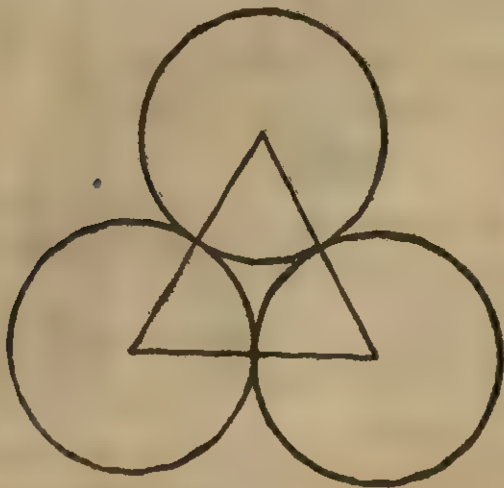

চিত্র—22

ভারতীয় গণিতে মহাবীর সর্বপ্রথম উপবৃত্তের পরিধি ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রয়াস পান। অবশ্য জ্যামিতির এই বিশেষ দিকটিতে গ্রীক গণিতজ্ঞরা বহুদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে অ্যাপেলোনিয়াসের নাম সর্বাগ্রগণ্য। সেই তুলনায় মহাবীর যে খুব কৃতিত্বপূর্ণ কিছু করেছিলেন তা বোধ হয় না। তবে ভারতীয় গণিতে যে এ-বিষয়ে তাঁর স্থান সর্বপ্রথম, সন্দেহ নাই। যাই হোক, তিনি উপবৃত্তকে 'আয়তবৃত্ত' বলে আখ্যাত করেন। a ও b উপবৃত্তের প্রধান অক্ষ ও উপাক্ষ হলে অর্থাৎ 'আয়াম' ও 'ব্যাস' হলে,

$$\text{পরিধি}=2\left(a+\frac{b}{2}\right)$$

এবং $\text{ক্ষেত্রফল}=\text{পরিধি}\times\frac{b}{4}=\frac{1}{4}b.\ 2\left(a+\frac{b}{2}\right)=\frac{1}{2}b\left(a+\frac{b}{2}\right)$

কিন্তু তাঁর এই সূত্র দুটি শুদ্ধ নয়। এ-বিষয়ে গ্রীক গণিতজ্ঞ অ্যাপোলোনিয়াসের তুলনা মেলা ভার। অধ্যাপক এম. রঙ্গাচার্য a ও b-কে অর্ধ-অক্ষ (Semi-axes) ধরে পরিধি সম্পর্কিত সূত্রটি সংশোধন করেছেন।

$$\text{পরিধি}=\sqrt{24b^2+16a^2},$$

আবার, e যদি উৎকেন্দ্র হয়, তাহলে $b^2 = a^2(1-e^2)$ বসিয়ে এবং $\sqrt{10} = \pi$ লিখে সূত্রটির আর একটি রূপ পাওয়া যায়,—

$$\text{পরিধি} = 2\pi a\left(1-\frac{3}{5}e^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

একথা সত্য, ভারতীয় গণিতের তিন মহারথী আর্যভট-ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্করের প্রতিভার সঙ্গে মহাবীরের তুলনা চলে না। কিন্তু তিনি ছিলেন নবম-দশম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ এবং দু-একটি ক্ষেত্রে নতুন পথের প্রবর্তক।

॥ সংযোজন ॥

খ্রীষ্টীয় যুগে যে-সব জৈন ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়েছে, তাতে গণিত বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়। বেশীর ভাগ গ্রন্থই মহাবীরের কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছে। **'ধবলা-টীকা'**-র রচয়িতা **বীরসেন** রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা জগতুঙ্গদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বীরসেন মহাবীরের কিছু পূর্ববর্তী। ধবলা টীকায় গণিত বিষয়ে নানা আলোচনা দেখা যায়। গ্রন্থটি অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত বলে অনুমান করা হয়। **'ত্রিলোক-প্রজ্ঞপ্তি'** নামে আর একটি গ্রন্থ অন্তত দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে ধরা হয়। এই গ্রন্থের প্রথম চারটি **"মহাধিকার"**-এ অনেক গাণিতিক সূত্র দেখতে পাওয়া যায়,—জ্যামিতির বৃত্ত, ট্রাপিজিয়াম ও চোঙ সম্পর্কিত এবং বীজগণিতে শ্রেণী সম্পর্কিত। নেমিচন্দ্রের **'ত্রিলোকসার'** ও **'গোম্মতসার'** গ্রন্থ দুটিতেও প্রাচীন জৈন গণিতের নানান পরিচয় রয়েছে।

বীরসেন π-এর মান নিম্নরূপ দিয়েছেন :

ব্যাসং ষোড়শগুণিতং ষোড়শসহিতং ত্রিরূপরূপৈর্ভক্তম্।

ব্যাসং ত্রিগুণিতং সূক্ষ্মাদপি তদ্‌ভবেৎ সূক্ষ্মম্ ।।

গণিতের ভাষায়,

$$\pi = \frac{16d+16}{113} + 3d, \quad d = \text{ব্যাস}।$$

ডঃ টি.এ. সরস্বতী 16-এর উপস্থিতি অযৌক্তিক বলেছেন। তিনি বলেন

$$16 \text{ না থাকলে } \pi = \frac{355}{113}$$

॥ দ্বিতীয় আর্যভট ॥

আর্যভট সমস্যা আলোচনার সময় আমরা এই আর্যভটের উল্লেখ করেছি। ইনি সেই আর্যভট যিনি "বৃদ্ধ আর্যভট"-এর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংস্কার করার অভিপ্রায়ে "মহাসিদ্ধান্ত" রচনা করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি; নতুন কিছু তিনি করতে পারেন নি। কেবল গতানুগতিক ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন মাত্র।

তাঁর 'মহা-সিদ্ধান্ত' বা 'আর্যসিদ্ধান্ত' বা 'আর্যভটসিদ্ধান্ত' অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মধ্যগতি এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অতি প্রিয় বিষয় অনির্ণেয় সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এমন কি দ্বিতীয় আর্যভট এই সমীকরণের সংস্কার করে সমাধানের একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন। সে কারণে তাঁর কুট্টকাধ্যায় সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। তাঁর অয়নগতি সংক্রান্ত চিন্তার উল্লেখ গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। আর্যভটের ন্যায় তিনিও বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের এক কৌশল উদ্ভাবন করেন। অবশ্য দুই আর্যভটের এই পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত গাণিতিক বিষয়গুলিই আলোচিত হয়েছে। পাটী-গাণিতিক প্রক্রিয়া,—প্রাথমিক চার নিয়ম, শূন্যের ব্যবহার, বর্গমূল ও ঘনমূল, ভগ্নাংশ, ত্রৈরাশিক ও দ্বিঘাত সমীকরণ প্রভৃতির আলোচনা দেখা যায়।

তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের এবং শ্রীধরের ট্রাপিজিয়ামের উচ্চতা নির্ণয় বিষয়ক সূত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমালোচনা যথার্থ না হলেও এতে কাকতালীয়ের মতো ফল ফলেছিল। একটি কর্ণ প্রদত্ত হলে সামন্তরিক ও রম্বসের দ্বিতীয় কর্ণ নির্ণয়ের সূত্র তিনি দিয়েছেন,—

সমচতুরস্রেঽর্ধসমে বাহুীষ্টশ্রবণ বর্গোনাৎ।
সর্বভুজবর্গযোগমূলং কর্ণো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ বাহুগুলির বর্গের সমষ্টি থেকে কর্ণের বর্গ বিয়োগ করে বর্গমূল করলে রম্বস ও সামন্তরিকের দ্বিতীয় কর্ণ পাওয়া যাবে।

ABCD সামন্তরিকের (চিত্র-23) CE এবং DF উচ্চতা, এবং AC ও BD দুটি কর্ণ।

এখন, $AC^2 = AE^2 + CE^2 = (AB+BE)^2 + BC^2 - BE^2$

$$BD^2 = BF^2 + DF^2 = (AB-BE)^2 + BC^2 - BE^2$$

$$\therefore AC^2+BD^2=(AB+BE)^2+(AB-BE)^2+2BC^2-2BE^2$$
$$=2AB^2+2BE^2+2BC^2-2BE^2$$
$$=2AB^2+2BC^2$$

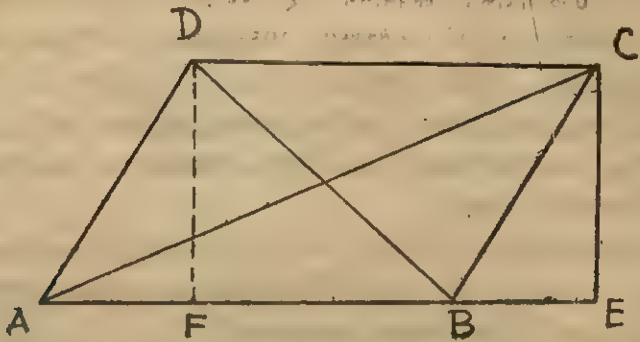

চিত্র—23

$$\therefore \quad AC^2=2AB^2+2BC^2-BD^2$$

বা $AC=\sqrt{2AB^2+2BC^2-BD^2}$, যখন $BD=$ প্রথম কর্ণ।

আবার, $BD^2=2AB^2+2BC^2-AC^2$

বা, $BD=\sqrt{2AB^2+2BC^2-AC^2}$, যখন $AC=$ অপর কর্ণ।

দ্বিতীয় আর্যভট রম্বসের ক্ষেত্রফল দিয়েছেন—

শ্রুতিঘাতঃ সমচতুরস্রে অর্দ্ধিতঃ ফলং স্যাৎ।

d_1 এবং d_2 কর্ণ হলে,

$$A=\frac{1}{2}.d_1.d_2$$

এখানে, রম্বসের কর্ণদ্বয় যে পরস্পর সমকোণে ছেদ করে তার প্রমাণ রয়েছে।

॥ শ্রীপতি ॥

শ্রীপতি দ্বিতীয় আর্যভটের পরবর্তী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। সম্ভবত তিনি দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম নাগদেব এবং পিতামহের নাম ভট্টকেশব। তিনি সম্ভবত কাশ্মীরের অধিবাসী এবং অলবিরুনীর ভারতভ্রমণের সময় জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়।

তাঁর রচিত মোট চারখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তিনখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক ও একখানি গণিত সম্পর্কিত। **"ধীকোটিকরণ"** গ্রন্থটি প্রথম আর্যভটের-আর্যভটীয় অবলম্বনে রচিত এবং লল্লের নির্দেশ অনুসারে সংশোধিত। এটির রচনাকাল 1039 খ্রীষ্টাব্দ। **'ধ্রুবমানস'** গ্রন্থটি মুঞ্জালের 'লঘুমানস' অবলম্বনে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটির প্রণয়নকাল 1056 খ্রীষ্টাব্দ। **গণিততিলকের** বিষয়বস্তু গণিত। শ্রীপতির **'সিদ্ধান্তশেখর'** গ্রন্থটি 1039 খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত।" (প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিংহতিলক সুরী 'গণিত তিলক'-এর একটি ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীপতি গণিত-তিলকে বীজগণিত ও জ্যামিতি অন্তর্ভুক্ত করেননি।

দ্বিতীয় আর্যভট ও শ্রীপতি কোন্ সর্তে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ অঙ্কন সম্ভব সে-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শ্রীপতি তাঁর সিদ্ধান্তশেখরে এই সর্তের সরাসরি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি ত্রিভুজের উল্লেখ করেননি।

> **চতুর্ভুজায়ামখিলস্ত বা স্যাদবক্রবাহোরধিকা (?) ভুজাচ্ছেৎ।**
> **উনসমো বেতরবাহুযোগো জ্ঞেয়ং তদক্ষেত্রমুদারধীভিঃ ॥**

—চতুর্ভুজের সরল বাহুগুলির সমষ্টি বৃহত্তমটির চেয়ে ছোট বা সমান হলে, জ্ঞানীরা জানেন যে এটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র নয়।

সিদ্ধান্তশেখর গ্রন্থে **'ভুজ'** প্রদত্ত হলে কিভাবে মূলদ সমকোণী ত্রিভুজের **'কোটি'** ও **'অতিভুজ'** নির্ণয় করতে হবে তার সূত্রও দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের আলোচনাও আছে।

শ্রীপতির পর আর কোন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় গণিতজ্ঞের নাম পাওয়া যায় না। তবে দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যে ভাস্করের পূর্ববর্তী কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু গণিতে বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁদের উল্লেখযোগ্য বিশেষ অবদান নাই। তবুও নিঃসন্দেহে এটুকু বলা যায় ওই সময় দক্ষিণ ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত ছিল এবং তার সঙ্গে গণিতের চর্চাও হতো।

একাদশ অধ্যায়

"Gentleman", he said, ' that is surely true, it is absolutely paradoxical ; we cannot understand it, and we don't know what it means, but we have proved it, and therefore, we know it must be the truth."

—Kasner and Newman.

॥ ভাস্করাচার্য ॥

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে 'ত্রয়ী'-র অন্যতম ভাস্কর বা দ্বিতীয় ভাস্কর। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বেদবিদ ও দৈবজ্ঞ। দক্ষিণ ভারতের সহ্য পর্বতের পাদদেশে বিজ্জড়বিড় অর্থাৎ বিজাপুর নামক স্থানে 1114 খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ভাস্কর পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। বেদজ্ঞ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুনিপুণ পিতার নিকট পাঠ গ্রহণ ক'রে ক্রমে ভাস্কর জ্ঞানের নানান বিভাগে কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু 'লীলাবতী' সম্পর্কে একটি উপকথা ছাড়া তাঁর ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

ভাস্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি '**সিদ্ধান্ত-শিরোমণি**'। আর্যভটীয়-এর ন্যায় এটি কোন গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত,—**লীলাবতী, বীজ-গণিত, গ্রহগণিত** ও **গোলাধ্যায়**। লীলাবতী অংশে পাটীগাণিতিক আলোচনা, বীজগণিতে কুট্টক, বর্গ-প্রকৃতি প্রভৃতির আলোচনা আছে। অন্য দুটি অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা আছে। গোলাধ্যায়ের একটি অংশে নিঃসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা আছে এবং সেখানে ভাস্কর নিজেকে '**সুকবি**' বলে আখ্যাত করেছেন। এই প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে গতানুগতিক সংস্কৃত-কাব্য-রীতির অনুবর্তন দেখা যায়; মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় মহাকবি কালিদাসের কাব্যোৎকর্ষ স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবিনয়ে ভাস্কর জানিয়েছেন 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' রচনায় তাঁর বিশেষ মৌলিকতা নাই। পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের গ্রন্থ থেকে এ-গ্রন্থের উপাদান

সংগৃহীত হয়েছে এবং তাঁর ভূমিকা কেবলমাত্র সঙ্কলকের। আচার্য ভাস্করের উল্লেখ থেকেই আমরা শ্রীধর ও পদ্মনাভের বীজগণিত বিষয়ে অবগত হই। তা না হলে বীজগাণিতিক হিসাবে রাঢ়ের শ্রীধরের নামটুকুও জানতে পারতাম না, আর পদ্মনাভ তো অবলুপ্ত হয়ে গেছেন! তাঁর পরিচয়টুকু আজ ভাস্করের কৃপায় আমরা পেয়েছি, কিন্তু শ্রীধরের বীজগণিত ও পদ্মনাভের গ্রন্থ অবলুপ্ত হওয়ায় ভাস্কর এঁদের কাছে কতটুকু ঋণী তার মূল্যায়ন আজ সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের ভাস্কর সবিনয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু কেন যে নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ মহাবীরের নাম উল্লেখ করেননি, সে বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। গণিত-সার-সংগ্রহের অনেক অঙ্ক ভাস্কর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সত্যসত্যই অঙ্কগুলি মহাবীরের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত কিনা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ, আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, প্রাচীনকাল থেকে বহু অঙ্ক প্রায় অবিকল চলে আসছে। হয়তো ভাস্কর এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকবেন। তা হলেও যিনি ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর ও পদ্মনাভের গণিত বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন, তিনি কিভাবে মাত্র আড়াইশ' বছর পূর্ববর্তী মহাবীর বিষয়ে কিছু জানতেন না—এটি বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা। অথচ উভয়েই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। তবে কি মধ্যযুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকৃত অবস্থাটি তাঁর মনঃপূত ছিল না? কিন্তু গোলাধ্যায়ের একস্থানে জৈন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ লল্লের যুক্তি যে-ভাবে খণ্ডন করেছেন, তাতে জৈন গণিত বিষয়ে তাঁর ধারণা উচ্চ ছিল বলেই মনে হয়।

বিনয়বশত ভাস্কর 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'-কে সঙ্কলন গ্রন্থ বললেও ওই গ্রন্থের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি যেভাবে সহজ ও সুন্দর ভাষায় জটিল গাণিতিক সূত্র ও তথ্য সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তথ্যসমূহ এমন সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করেছেন, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। তা ছাড়া গণিতে তিনি অনেক নতুন অধ্যায়ের সূচনাও করেছেন এবং পূর্ববর্তী অনেক সূত্র ও পদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কার করে গণিতে সাধারণীকরণের গুরুত্ব এনেছেন। সত্যই ভাস্কর আপন প্রতিভায় ভাস্বর।

।। লীলাবতী-উপকাহিনী ।।

সিদ্ধান্ত-শিরোমণির লীলাবতী অধ্যায়ের নামকরণ বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে ওই-কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক পটভূমি আছে কি না

তার প্রামাণিক উৎস আমাদের জানা নাই। এরূপ প্রচলিত আছে লীলাবতী ভাস্করের কন্যার নাম। ভাগ্যবিড়ম্বিত স্নেহের কন্যার নাম গ্রন্থটির সঙ্গে জড়িত করে ভাস্কর সামান্য সান্ত্বনা পেয়ে থাকলে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নাই। কাহিনীটি বিবৃত করা হলো:

ভাস্কর ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ, আবার শ্রেষ্ঠ দৈবজ্ঞও। কন্যার ঠিকুজি গণনা করে তিনি জানতে পারলেন তার বিবাহিত-জীবন অতি স্বল্প। কিন্তু উপায় কি? তবে কি কন্যার বিবাহ দেবেন না? অসম্ভব। সমাজে অনূঢ়া কন্যা রাখা বিধি নয়,—সামাজিকতায় কলঙ্ক-স্বরূপ। এই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি জ্যোতিষের সূক্ষ্ম গণনায় মনোনিবেশ করলেন। একটি পথ তিনি খুঁজে পেলেন। যদি কন্যার বিবাহ একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট মুহূর্তে দেওয়া যায়, তা হলে এই ঘোর দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ক্রমে কন্যা বয়স্থা হয়ে উঠল, এবং যথারীতি তিনি তার বিবাহের আয়োজন করলেন। সঠিক ও যথার্থ মুহূর্তটি জানবার জন্য তিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। নিউটনের সূর্য-ঘড়ি ও জল-ঘড়ির মত এটি একটি বালুকা-ঘড়ি। একটি পাত্রে বালুকা রেখে তার নীচে ছিদ্র দিয়ে বালুকা পড়তে দেওয়া হলো। অন্য একটি পাত্রে বালুকা-ঘড়ি থেকে বালি জমা হতে থাকল।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ,—ভাস্কর কর্তৃক বিধির বিধান পাল্টে দেওয়ার মত আয়োজন সম্পূর্ণ। কিন্তু তা কি সম্ভব?

Man proposes, God disposes—বিধির বিধান খণ্ডনের কোন উপায় মানুষের হাতে নাই। লীলাবতীর ক্ষেত্রেও সে-নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হলো না। যবনিকার অন্তরালে বিধাতার মুচকি হাসি কি ভাস্কর লক্ষ্য করেছিলেন?

বিবাহের পূর্ব দিন। অসামান্য পিতার নির্মিত এই কাল নির্ধারণের বালুকা-ঘড়ি দেখার জন্য লীলাবতী কৌতূহলী হলো। হায়! বালিকা লীলাবতী, কেন তোমার এমন কৌতূহল হলো? সালঙ্কারা লীলাবতী ঝুঁকে পড়ল কেমন করে বালুকা-কণা ধীরে ধীরে ছিদ্রপথে বহির্গত হচ্ছে। কালপুরুষ এই সুযোগ নিলেন। লীলাবতীর অজ্ঞাতে খসে পড়ল ক্ষুদ্র একটি মুক্তাখণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির বালুকা-কণায় হারিয়ে গেল। ঘড়ি আর সূক্ষ্ম সময় নির্দেশ করল না। বিবাহ অশুভ মুহূর্তেই অনুষ্ঠিত হলো সবার অজ্ঞাতে। আর বিধাতাও তাঁর কার্যটি সিদ্ধি করলেন।

লীলাবতী বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলো। ভাস্করের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হয়তো সাময়িকভাবে নিজ প্রতিভা ও গণনার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রতিভাবান পুরুষেরা বিপদে কাতর হলেও আত্মহারা হন না। অনুমান করা যায় অনুসন্ধানে যখন সব ব্যাপার জানলেন, তখন হয়তো কপালে করাঘাত করে বলে উঠেছিলেন,—"বিধির বিধান!"

লীলাবতী নাটকের পরবর্তী দৃশ্য সম্ভবত এরকম ছিল: গণিতাচার্য ভাস্কর কন্যাকে সস্নেহে নিজের কাছে রেখে পাঠদান করেছিলেন। লীলাবতীও গণিতে যথেষ্ট পারদর্শিনী হয়ে পিতার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

এ-কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। বরং আভ্যন্তরীণ টুকরো টুকরো তথ্য থেকে মনে হয় লীলাবতী একটি কাল্পনিক নাম। এমন কি এ-নামের গ্রন্থও অপ্রতুল নয়। নেমিচন্দ্র তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'লীলাবতী'।

॥ লীলাবতীর বিষয়বস্তু ॥

পাটীগণিত এ-অংশের আলোচ্য বিষয় হলেও ভারতীয় রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী জ্যামিতি,—বিশেষত সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত সমস্যা ও কিছু কিছু পরিমিতি এখানে আলোচিত হয়েছে। পাটীগণিতের ছাত্ররা যাতে বীজগাণিতিক সমীকরণের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেহেতু এখানে কুট্টকের অবতারণা করা হয়েছে, তবে সংক্ষিপ্তাকারে। একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের আলোচনাও এই অধ্যায়ে দেখা যায়।

ভাস্কর স্বয়ং লীলাবতীর কোন বিভাগ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালের ভাষ্যকারগণ লীলাবতীর বিষয়বস্তুকে তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলি (1) পরিভাষা ; (2) সঙ্কলিত-ব্যবকলিত, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল শূন্য-পরিকর্ম ; (3) ব্যস্তবিধি, ত্রৈরাশিক ; (4) মিশ্র-ব্যবহার ; (5) শ্রেঢ়ী-ব্যবহার ; (6) ক্ষেত্র-ব্যবহার ; (7) খাত-ব্যবহার ; (8) চিতি ; (9) ক্রকচ-ব্যবহার ; (10) রাশি-ব্যবহার ; (11) ছায়া-ব্যবহার ; (12) কুট্টক, ও (13) অঙ্কপাশ-ব্যবহার।

॥ বীজগণিতের বিভাগ ॥

বীজগণিত অংশ এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি,—(1) ধন-বিবরণ, (2) শূন্য-বিবরণ, (3) বর্ণ-বিবরণ, (4) করণী-বিবরণ, (5) কুট্টক-বিবরণ,

(6) বর্গ-বিবরণ (7) একবর্ণ-বিবরণ, (8) মধ্যমাহরণ, (9) অনেকবর্ণ-সমীকরণ, (10) অনেকবর্ণ-মধ্যমাহরণ ও (11) ভাবিতা।

।। সমবায় ও বিন্যাস ।।

জৈন গণিতে সমবায় ও বিন্যাস 'বিকল্প' নামে পরিচিত। মহাবীর সমবায়ের সাধারণ সূত্র দিয়েছেন। ভাস্কর লীলাবতীর 'অঙ্কপাশ-ব্যবহার' অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভাস্করের কৃতিত্ব এই যে, তিনি বিষয়টির সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন এবং সাধারণ সূত্র প্রদান করেছেন।

ভাস্কর সর্বপ্রথম r-সংখ্যক বস্তুর মধ্যে k, l, প্রভৃতি ভিন্ন প্রকার বস্তু হলে তাদের বিন্যাস নির্ণয়ের সূত্র দিয়েছেন—$\dfrac{r!}{k!l!\ldots}$

উদাহরণ ঃ 5টি অঙ্ক দ্বারা গঠিত কোন সংখ্যার অঙ্ক-সমষ্টি 13, শূন্যকে সংখ্যা হিসাবে না ধরলে কতগুলি সম্ভাব্য সংখ্যা গঠন করা যায় ?

এই অঙ্কটি সমাধানের একটি সাধারণ সূত্র ভাস্কর দিয়েছেন। কিন্তু কোন প্রমাণ দেননি।

যদি কোন সংখ্যার অঙ্ক-সংখ্যা n, s সমষ্টি এবং $9+n>s$ হলে মোট অঙ্ক-সংখ্যার সূত্রটি ${}_{s-1}C_{n-1}$

সুতরাং $${}_{s-1}C_{n-1}=\frac{(s-1)\,(s-2)\ldots(s-n+1)}{(n-1)\,!}$$
$$=\frac{(s-1)\,!}{(s-n)\,!\,(n-1)\,!}$$

এই সূত্রে উপরের অঙ্ক থেকে n ও s-এর মান বসালে উত্তরটি 495 হয়।

।। ভাস্করীয় গণিতে শূন্য—0 ।।

গণিতে শূন্যের উৎপত্তি, তাৎপর্য ও ব্যবহার সম্পর্কে আমরা পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করব। এখানে শূন্যের তাৎপর্য ও ব্যবহার বিষয়ে ভাস্করের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

ব্রহ্মগুপ্ত যোগ, বিয়োগ ও গুণন প্রক্রিয়ায় শূন্যের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। মহাবীর শূন্য দ্বারা ভাগে ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু ভাস্কর ভুল করেন নি। কারণ, আধুনিক গণিতের অনন্ত বিষয়ে ধারণা তাঁর অনেকখানি স্বচ্ছ ছিল। তিনি

বলেছেন কোন রাশিকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল অনন্ত হয়। তাঁর প্রাসঙ্গিক সূত্রটি এরূপ :

যোগে খংক্ষেপ সমং বর্গাদৌ খং খভাজিতো রাশিঃ। খহরঃ স্যাৎ খগুণঃ খং খগুণশ্চিন্ত্যশ্চ শেষবিধৌ। শূন্যে গুণকে জাতে খং হারশ্চেদ্‌ পুনস্তদা রাশি। অবিকৃত এব জ্ঞেয়স্তথৈব খেনোনিতশ্চ যুতঃ।

অর্থাৎ কোন রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে একই থাকবে। শূন্যের সঙ্গে গুণে শূন্য হবে ; শূন্য দ্বারা ভাগ অশেষ হবে। শূন্যের বেলায় শূন্য হলেও শূন্য গুণনরূপে থেকে যাবে ; শূন্য ভাজকরূপে ধরলে অবিকৃত রাশি যা উহ্য আছে, তা অপরিবর্তিত থাকবে।

ভাস্কর প্রদত্ত দুটি উদাহরণে $\frac{a\times o}{b\times o}=\frac{a}{b}$ দেখা যায়। বলা বাহুল্য এখানে শূন্যকে অপরিমেয় ক্ষুদ্রতম রাশি হিসাবে ধারণা করা হয়েছে। আধুনিক গাণিতিক সঙ্কেতে লেখা যায়,—

$$\underset{\epsilon\to 0}{Lt}\ \frac{a\times\epsilon}{b\times\epsilon}=\frac{a}{b}$$

নিউটন ও লিবনিজের পাঁচশ' বছর পূর্বে ভাস্করের পক্ষে অপরিমেয় ক্ষুদ্রতম রাশির (Infinitesimal) চিহ্ন ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, আর তিনি তা করেন নি। কিন্তু সন্দেহ নাই তাঁর এ-সম্পর্কে ধারণা ছিল।

বীজগণিতাংশে শূন্য ও অনন্ত বিষয়ে ভাস্কর আলোচনা করেছেন। $\infty\pm k=\infty$ —এই বিবৃতির বর্ণনায় তিনি বলেছেন বিশ্বের সৃজন-কালে সমস্ত শক্তির অধিকারী শ্রীভগবান কোটি কোটি জীবের সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়-কালে সমস্ত জীব তাঁর দেহে লীন হয়। কিন্তু তাতে সেই সর্বশক্তিমানের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। ক্যান্টরের আটশ' বছর আগে অনন্ত বিষয়ে এ-ধারণা বিস্ময়ের বৈকি !

॥ করণী ॥

a, b, c ও d মূলদ রাশি হলে, $a+\sqrt{b}$ এবং $a+\sqrt{b}+\sqrt{c}+\sqrt{d}$-এর বর্গমূল নির্ণয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাস্কর, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্বদা সম্ভব নয় বলে ইঙ্গিত করেছেন। এরকম একটি উদাহরণ দিয়েছেন $10+\sqrt{32}+\sqrt{24}+\sqrt{8}$।

1. উদাহরণ : ত্রিভুজের বাহুদ্বয় $\sqrt{13}$, $\sqrt{5}$ এবং ক্ষেত্রফল 4 হলে তার ভূমি কত ?

ভাস্কর উত্তর দিয়েছেন 4 ; অন্য একটি উত্তর $2\sqrt{5}$ দেননি।

2. উদাহরণ : ত্রিভুজের বাহুদ্বয় $\sqrt{10}-\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ এবং ভূমি $\sqrt{18}-1$ হলে তার উচ্চতা কত ?

ভাস্করের উত্তর $\sqrt{2}-1$

॥ কয়েকটি উদাহরণ ॥

সৃজনশীল রস-সাহিত্য স্রষ্টারাই যে উচ্চ কল্পনার অধিকারী, আর কেউ নয়, এমন কথা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা সবাই বড় কাল্পনিক ছিলেন। প্রথমে একটি ভাব আসে ; তাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে প্রকৃষ্ট রূপ-দান করাই প্রতিভার অন্যতম প্রধান কাজ। ভাস্কর একদিকে যেমন ছিলেন কুশাগ্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন উচ্চ কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন রসস্রষ্টা। লীলাবতীতে এমন কতকগুলি অঙ্ক আছে যার কাব্যসৌন্দর্য উপেক্ষা করা যায় না। এফ. ক্যাজরি এই অঙ্কগুলি সম্পর্কে বলেছেন "pleasing poetic garb". লীলাবতী চিত্তাকর্ষক ও আনন্দজনক অঙ্কের জন্য বিখ্যাত। মনে হয় আচার্য ভাস্কর এই সত্যটি বিশ্বাস করতেন "It is only amusing oneself that one can learn".

1. উদাহরণ : বালে মরালকুলমূল দলানিসপ্ত
তীরে বিলাস ভরমন্থরগাণয়পশ্যম্
কুর্বংচকেলি কলহং কলহংসযুগ্মম্
শেষং জলে বদমরালকুল প্রমাণম্।

—বালিকা ! একদল রাজহংসের বর্গমূলের $\frac{7}{2}$ অংশ একটি দীঘির তীরে বিচরণ করছে, অবশিষ্ট দুটি জলে কেলি করছে। রাজহংসের সংখ্যা কত ?

রাজহংসের সংখ্যা x হলে, সর্তানুসারে,

$$\frac{7}{2}\sqrt{x}+2=x$$

এই দ্বিঘাত সমীকরণটি সমাধান করলে x-এর অখণ্ড মান 16 পাওয়া যায়।

2. উদাহরণ : একগুচ্ছ পদ্মফুলের মধ্য থেকে এক-তৃতীয়াংশ, এক-পঞ্চমাংশ ও এক-ষষ্ঠাংশ যথাক্রমে ভগবান শিব, বিষ্ণু ও সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করা হলো এবং দেবী ভবানীর উদ্দেশ্যে এক-চতুর্থাংশ নিবেদিত হলো। অবশিষ্ট 6টি ফুল পূজনীয় আচার্যকে প্রদান করা হলে, পদ্মফুলের সংখ্যা কত ?

এই অঙ্কটির সমাধানে ভাস্কর 'ইষ্টকর্ম' পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে অজ্ঞাত সংখ্যাটি x ধরে সমাধান করা হলো।

পদ্মফুলের সংখ্যা x হলে, সর্তানুসারে,

$$x-\left(\frac{x}{3}+\frac{x}{5}+\frac{x}{6}+\frac{x}{4}\right)=6$$

বা, $\frac{x}{20}=6$

বা, $x=120$

3. উদাহরণ : এক ঝাঁক মক্ষিকার অর্ধের বর্গমূল এবং $\frac{8}{9}$ অংশ মালতী পুষ্প বনে মধু সংগ্রহে গেল ; একটি মক্ষিকা পদ্মফুলের সুগন্ধে প্রলুব্ধ হয়ে সন্ধ্যাকালে পদ্মফুলের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় মক্ষিরাণীটি সেখানে গুণগুণ করে বেড়াতে লাগল। হে ভদ্রে, মক্ষিকার সংখ্যা কত ?

[উত্তর—72]

4. উদাহরণ : 100 (টাকার) 1 মাসের সুদ 5 (টাকা) হলে 16 (টাকার) 12 মাসের সুদ কত ? সুদ ও আসল প্রদত্ত হলে সময় নির্ণয় কর ; সময় ও সুদ প্রদত্ত হলে আসল নির্ণয় কর।

সুদ নির্ণয় :

অঙ্কটি কষতে দুটি পক্ষের কথা বলা হয়েছে,—'প্রমাণ-পক্ষ' ও 'ইচ্ছা-পক্ষ'। 'প্রমাণ-পক্ষে' কোন অজ্ঞাত রাশি থাকে না, কিন্তু 'ইচ্ছা-পক্ষে' অজ্ঞাত রাশি থাকে। প্রদত্ত অঙ্কটিতে,

প্রমাণ-পক্ষ :	100	1 মাস	5 (ফল)
ইচ্ছা-পক্ষ :	16	12 মাস	'0' বা x

উপরোক্ত দুটি পক্ষকে নিম্নরূপ ছকে সাজানোর রীতি ছিল :

100	16
1	12
5	0

প্রথম পক্ষে 5 (ফল), কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে নাই। সুতরাং তারা প্রতিস্থাপিত হবে :

100	16
1	12
0	5

ছকটির দ্বিতীয়ার্ধের বৃহত্তম সংখ্যা $=16\times12\times5=960$ এবং প্রথমার্ধের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা $=100\times1=100$

$$\therefore \text{ সুদ}=\frac{960}{100}=\frac{48}{5}=\left|\frac{48}{5}\right|$$

সময় নির্ণয় :

এখানে, প্রমাণ-পক্ষ :	100	1 মাস	5
ইচ্ছা-পক্ষ :	16	0 বা x	$\frac{48}{5}$

পূর্বের মত ছকে সাজিয়ে :

100	16
1	0
5	48_5

পূর্বের ন্যায় পক্ষান্তর ক'রে,—

100	16
1	0
48_5	5

এবার হরের পরিবর্তন ক'রে,—

100	16
1	0
48	5_5

প্রথমার্ধের বৃহত্তর সংখ্যা $=100\times1\times48=4800$

দ্বিতীয়ার্ধের ক্ষুদ্রতর সংখ্যা $=16\times5\times5=400$

$\therefore$ নির্ণেয় সময় $=\dfrac{4800}{400}=\left|\dfrac{4800}{400}\right|=12$ মাস

ত্রৈরাশিক, পঞ্চরাশিক প্রভৃতিতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও নিয়ম সম্পর্কে অন্যত্র

বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে ভাস্কর কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রটি বিবৃত করা হলো :

পঞ্চসপ্ত নবরাশিকাদিকেঽন্যোন্য পক্ষনয়নং ফলচ্ছিদাম্।
সংবিধায় বহুরাশিজে বধে স্বল্পরাশিবধভাজিতে ফলম্ ।।

ভাবার্থ : পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক, নবরাশিক বা ততোধিক রাশির ক্ষেত্রে 'ফল' ও 'ছিদ'-কে পরস্পরের পক্ষ থেকে মধ্যে স্থাপন করে বৃহত্তর সংখ্যাকে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায়।

5. উদাহরণ : যদিসম ভুবি বেণুর্দ্বিত্রিপাণিপ্রমাণো
গণক পবনবেগাদেকদেশে সভগ্নঃ
ভুবিনৃপমিত হস্তেষ্বংগলগ্নং তদগ্রং
কথয়কতিষু মূলাদেষভগ্নঃ করেষু।

অর্থাৎ সমতলে একটি 32 (ফুট) বাঁশ ঝড়ে ভেঙে পাদদেশ থেকে 16 (ফুট) দূরে মাটি স্পর্শ করল। হে গণক, বাঁশটি কত উচ্চে ভেঙেছিল ?

অঙ্কটি খুবই সহজ। স্কুল গণিতের সাহায্যেই কষা যায়। বলা বাহুল্য, এটি সমকোণী ত্রিভুজের ধর্মের প্রয়োগ মাত্র।

।। পরিমিতি ।।

গণিতের অঙ্গস্বরূপ পরিমিতির আলোচনাও ভাস্কর করেছেন। লীলাবতীর 201-তম শ্লোকটিতে বৃত্তের ক্ষেত্রফল, গোলকের পৃষ্ঠফল ও ঘনফলের সূত্র প্রদত্ত হয়েছে :

(1) বৃত্তের ক্ষেত্রফল$=$পরিধি$\times\frac{d}{4}=\frac{\pi d^2}{4}=\pi r^2$

এখানে, $d=$ব্যাস ও $r=$ব্যাসার্ধ

(2) গোলকের পৃষ্ঠফল$=$বৃত্তের ক্ষেত্রফল$\times 4=4\times\pi r^2=4\pi r^2$

(3) গোলকের ঘনফল$=$পৃষ্ঠফল$\times\frac{2r}{6}=\frac{4}{3}\pi r^3$

লীলাবতীর 217-তম শ্লোকে প্রিজম, চোঙ, পিরামিড ও শঙ্কু সম্পর্কীয় সূত্রও দেখতে পাওয়া যায়।

(1) যে পিরামিডের ভূমি আয়তক্ষেত্র, তার আয়তন$=\frac{a\times b\times h}{3}$। এখানে, a, b ও h যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা।

(2) শঙ্কুর আয়তন$=\pi\frac{d^2}{4}\cdot\frac{h}{3}$

॥ জ্যামিতি ॥

জ্যামিতিতে বৃত্ত ও গোলক বিষয়ে ভাস্করের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়াম ও চতুর্ভুজ বিষয়ে তাঁর তেমন লক্ষণীয় অবদান নেই বললেই চলে। তবে সমকোণী ত্রিভুজ ও সদৃশ ত্রিভুজের প্রাত্যহিক সমস্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে তাঁর বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও গোলকের পৃষ্ঠফল ও ঘনফলের সূত্র বিবৃত হয়েছে। আরো কয়েকটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাক।

॥ ত্রিভুজ ॥

প্রকৃতপক্ষে, ত্রিভুজ বিষয়ে ভাস্কর পূর্বসূরী ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর ও মহাবীরের সিদ্ধান্তের প্রায় কোন পরিবর্তন করেননি। এমন কি, ত্রিভুজের যে পরিলিখিত বৃত্ত থাকতে পারে এ-কথা ভাস্করের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তিনি সমকোণী ত্রিভুজের সাংখ্যিক সমাধানে সমকোণ সন্নিহিত একটি বাহু প্রদত্ত হলে অপর বাহুদ্বয় নির্ণয়ের এক নতুন পদ্ধতি দিয়েছেন। লীলাবতীর 141-তম শ্লোক থেকে জানতে পারা যায়, a প্রদত্ত ভুজ এবং m যে-কোন ঐচ্ছিক রাশি হলে,

$$\text{কোটি}=\frac{2am}{m^2-1},\ \text{এবং কর্ণ (অতিভুজ)}=\frac{2am^2}{m^2-1}-a$$

ত্রিভুজ বিষয়ে ভাস্কর অতিভুজের উপর বর্গ উপপাদ্যের সাংখ্যমানে প্রমাণ দিয়ে তাঁর প্রতিভার উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন। **'বীজগণিত'** অধ্যায়ে এ-বিষয়ে সূত্রটি হচ্ছে :

> দোঃ কোট্যন্তরবর্গেণ দ্বিঘ্নো ঘাতঃ সমন্বিতঃ।
> বর্গযোগসমঃ স স্যাদ্‌ দ্বয়োরব্যক্তয়োর্যথা ॥

দুটি বীজগাণিতিক রাশির মত ভুজ ও কোটির অন্তরের বর্গের সহিত উভয়ের গুণফলের দ্বিগুণ যুক্ত করলে উভয়ের বর্গের সমষ্টির সমান হবে।

ভাস্করের কাছ থেকে আমরা সূত্রটির ব্যাখ্যা পাইনি। : সুন্দর ব্যাখ্যা ও উদাহরণ পাই ভাষ্যকার কৃষ্ণ ও গণেশের কাছ থেকে।

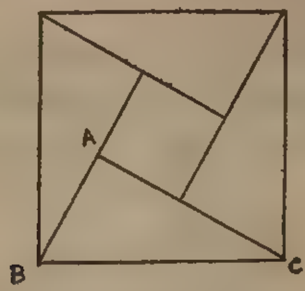

চিত্র—24

ABC সমকোণী ত্রিভুজ। উপরের চিত্রের মত চারটি সমান ও সদৃশ সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ বর্গের একটি বাহু হিসাবে ধরা হলো। তা হলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কেন্দ্রে ভুজ ও কোটির অন্তরের দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন হয়েছে।

প্রত্যেক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভুজ $\times$ কোটি

সুতরাং চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= 2 \times$ ভুজ $\times$ কোটি

$\therefore$ বৃহত্তর বর্গ $= ($ভুজ $-$ কোটি$)^2 + 2 \times$ ভুজ $\times$ কোটি

$= ($ভুজ$)^2 + ($কোটি$)^2$

এই প্রমাণটিকে ভারতীয় জ্যামিতিতে **'জ্যামিতিক-বীজগণিতীয়'** **(geometrico-algebraical)** প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

॥ ট্রাপিজিয়াম ॥

বৈদিক ও জৈন গণিতে ট্রাপিজিয়ামের উচ্চ আসন ছিল। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর আর সে-আসনটি রইল না। কিন্তু তা বলে এ-বিষয়ে গবেষণা একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। যুগ যুগ ধরে ট্রাপিজিয়াম বিষয়ে গণিতজ্ঞরা নানা সিদ্ধান্ত করে এর বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখ করেছেন। ভাস্কর সর্ব প্রথম ট্রাপিজিয়ামের সুনির্দিষ্ট নামকরণ করেছেন **'সমলম্বচতুর্ভুজ'**। আর ট্রাপিজিয়াম অঙ্কনের সর্তও লীলাবতীর 185-তম শ্লোকে দেখতে পাওয়া যায় :

ট্রাপিজিয়ামের একটি তির্যক বাহু ও সম্মুখীন বাহুর সমষ্টি ক্ষুদ্রতর তির্যক বাহু ও ভূমির সমষ্টি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হবে।

॥ বৃত্ত ॥

ভাস্কর কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বৃত্তের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, যদিও স্থূল বলে ভাস্কর উল্লেখ করেছেন। বৃত্তের পরিধি C, ব্যাস d এবং চাপ a-এর জ্যা c হলে,

$$c=\frac{4d(C-a)a}{5C^2/4-(C-a)a}$$

॥ ত্রিকোণমিতি ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ত্রিকোণমিতি পৃথক বিষয় হিসাবে অনুশীলিত হয়নি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই এর উদ্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বিশুদ্ধ গাণিতিক চিন্তার চেয়ে এর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। সামতলিক ও গোলীয় ত্রিকোণমিতি আবির্ভূত হলো কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য। সাইন-তালিকার উদ্ভব হলো গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতি-নির্ণয়ে সম্ভাব্য নির্ভুলতা আনয়নে। আর্যভট ত্রিকোণমিতির আবিষ্কারক নন। কারণ, তাঁরও পূর্বে সূর্য-সিদ্ধান্তে এ-বিষয়ের আলোচনা ও ব্যবহার আছে। বরাহমিহির পৌলিশ-সিদ্ধান্তে $(R\,Sin\,30)^2$, $(R\,Sin\,45)^2$ এবং $(R\,Sin\,60)^2$-এর মান দিয়েছেন যথাক্রমে $R^2/4$, $R^2/2$ এবং $3R^2/4$। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, লল্ল, দ্বিতীয় আর্যভট প্রভৃতি গণিতজ্ঞদের রচনায় কিছু-না-কিছু ত্রিকোণমিতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস্করের সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায়:

(1) $\text{Sin}\,(A\pm B)=\text{Sin}\,A\,\text{Cos}\,B\pm\text{Cos}\,A\,\text{Sin}\,B$

(2) $\text{Sin}\,\frac{A-B}{2}=\frac{1}{2}\sqrt{[(\text{Sin}\,A+\text{Sin}\,B)^2+(\text{Cos}\,A-\text{Cos}\,B)^2]}$

(3) $\text{Sin}\,18^\circ=\frac{\sqrt{5}-1}{4}.R$

(4) $\text{Sin}\,36^\circ=\sqrt{\frac{5R^2-\sqrt{5R^4}}{8}}$, R=বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

॥ কলন (Calculus) ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা প্রায় একই বিষয়সমূহের অনুবর্তন করে কেউ কেউ পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তের সামান্য কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন করেছেন মাত্র। এমন কি উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের কোন কোন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনাও করেছেন। যেমন, আর্যভটের ভূ-ভ্রমণবাদ উত্তরসূরীদের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়। দ্বিতীয় আর্যভট ও ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক আবিষ্কৃত বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ বিষয়েও সমালোচনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের 'প্রক্ষেপতত্ত্ব' কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তেমনি ভাস্করের অন্তর-কলন সম্পর্কীয় ধারণাটিও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। মধ্যযুগের গণিতজ্ঞরা গণিতে অনেক উচ্চতর গবেষণা করে নিউটন, লিবনিজ, গাউস প্রভৃতির পূর্বসূরীরূপে সম্মানিত হবার অধিকারী বটে, কিন্তু তাঁরাও ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের দুটি নতুন তত্ত্বের প্রতি কেন উদাসীন ছিলেন, তার কারণ নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। গ্রীক গণিতে সমাকলনের ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। ভাস্করও একই পদ্ধতিতে গোলকের ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয় করেন।

কিন্তু ভাস্করের বিস্ময়কর গাণিতিক প্রতিভার একটি নিদর্শন **অন্তর কলন** (Differential Calculas)-এর স্বরূপ আবিষ্কার। এই ধারণাটির জন্য বিশ্বগণিতে তাঁর পথিকৃৎ-এর সম্মান পাওয়া উচিত। গ্রহের প্রাত্যহিক গতি নির্ধারণের জন্য তিনি '**তৎকালিকা**' পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন,—দিনকে অতি ক্ষুদ্রসংখ্যা মুহূর্তে ভাগ করে প্রতি দুটি মুহূর্তে গ্রহাবস্থানের তুলনা করেছেন। '**তৎকালিক**' গতি বলতে বোঝায় সেই মুহূর্তের গতি।

এ-বিষয়ে সাইন অপেক্ষকের অন্তর-কলন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। তাঁর সূত্রটি :

বিবার্ধস্ত কোটি জ্যাগুণ স্ত্রিজ্যাহর : ফলং দোর্জ্যায়োন্তরং।

আধুনিক অন্তর-কলনের ভাষায় :—

$$d(\sin\theta)=\cos d\theta$$

Limit বা সীমা ছাড়া অন্তর-কলনের উন্নতি সম্ভব নয়। অথচ এই ধারণাটি নিউটন ও লিবনিজের পরবর্তীকালের। নিউটনের পাঁচশ' বছর আগে অন্তর-কলনের ধারণা যে বিশ্বের কোন গণিতজ্ঞের মনে স্থান পেতে পারে, এ-কথা সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। অবশ্য গ্রীক গণিতে যে এ-ধারণা ছিল না, তা নয়। কিন্তু ভাস্করের ধারণা যেন আরো স্পষ্ট,—আরো পরিচ্ছন্ন।

॥ সিদ্ধান্ত-শিরোমণির জনপ্রিয়তা ॥

ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের পর আর যদি কোন ভারতীয় গণিতগ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত-শিরোমণির নাম করতে হয় সর্বাগ্রে। বিভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি ভারতে সর্বত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশের ভাষ্য রচনাও বহু হয়েছে। আবুল ফজল লীলাবতী অংশের পার্শী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বীজগণিত অংশের অনুবাদ করেন উত্তা-উল্লা রুশহদি।

সংযোজন

॥ নারায়ণ পণ্ডিত ॥

প্রখ্যাত ও অল্পখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে অন্তত সাত-আটজন নারায়ণ পাওয়া যায়। আর্যভট সমস্যার মত এ-সমস্যা অত জটিল না হলেও বিভ্রান্তিকর। এঁদের মধ্যে নারায়ণ পণ্ডিতের গাণিতিক প্রতিভা উপেক্ষণীয় নয়।

নারায়ণ পণ্ডিতের পিতার নাম নৃসিংহ দৈবজ্ঞ। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহের (1351 88 খ্রীঃ) রাজত্বকালে ইনি বর্তমান ছিলেন। পাটীগণিত ও বীজগণিত বিষয়ে এঁর দুটি গ্রন্থ আছে,—'গণিত কৌমুদী' এবং 'বীজগণিতা-বতংশ'। পূর্বসূরী ভাস্কর কর্তৃক ইনি যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, এঁকে সঠিকভাবে আর্যভটীয়-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। 'গণিত কৌমুদী' গ্রন্থে তাঁর যুগের গণিত বিষয়ক জ্ঞানের বিস্তৃত ও পূর্ণ আলোচনা আছে। বীজগণিত গ্রন্থটি তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। এটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চিহ্ন-সূত্র, পাটীগণিতে শূন্যের ব্যবহার, অজ্ঞাত রাশির প্রক্রিয়া, করণী, চূর্ণন, বর্গ-প্রকৃতি, চক্রবাল-পদ্ধতির আলোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে সরল সমীকরণ প্রভৃতির আলোচনা দেখা যায়। দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই তিনি পূর্বসূরীদের অনুবর্তন করেছেন।

শ্রেণী বিষয়ক আলোচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখা যায় না। এমন কি π-এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা বিস্মিত করে।

নারায়ণ সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ের নিম্নরূপ সূত্র দিয়েছেন :

$$A^2=(a+b)^2-(a-b)^2+4ab$$

। শূন্য—0 ।

নারায়ণ শূন্যের তাৎপর্য ও তার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। 'গণিত কৌমুদী'-তে তিনি বলেছেন, যেহেতু পাটীগণিতে শূন্য দ্বারা ভাগ স্বীকৃত নয়, সেহেতু তিনি এখানে আলোচনা করছেন না। বীজগণিতে শূন্য দ্বারা ভাগের প্রয়োগ আছে বলে তিনি বীজগণিতে এ-সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

গুণের যাথার্থ নির্ণয়ের সূত্র দিয়েছেন নারায়ণ। কোন গুণফলের সত্যতা নির্ণয়ে তাঁর নিয়মটি খুব কার্যকরী। চার নিয়মের যাথার্থ নির্ণয় বিষয়ে এই লেখকের 'গণিতের কথা ও কাহিনী'-তে উদাহরণসহ আলোচনা আছে।

বৃত্তে অন্তর্লিখিত দুটি উপপাদ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। কিন্তু এ-বিষয়ে আলোচনার আগে ত্রিভুজ ও ট্রাপিজিয়াম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। নারায়ণ পূর্বসূরীদের ত্রিভুজ বিষয়ক সব গবেষণাই লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে আরো বিস্তৃতভাবে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি নতুন সূত্র উল্লেখ করা হলো ;

চতুরাহতদয়হতং ত্রিভুজভুজানাং বরং গণিতম্

—ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের গুণফলকে পরিব্যাসার্ধের চতুর্গুণ দ্বারা ভাগ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।

সুতরাং, $A=\frac{a}{2}$, উচ্চতা$=\frac{a}{2}$. $\frac{bc}{2r}=\frac{abc}{4r}$

[a, b ও c ত্রিভুজের তিনটি বাহু, r=পরিব্যাসার্ধ]

গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল$=3d^2=4.3.r^2=4\pi r^2$

গোলকের ঘনফল=পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল $\times\frac{\text{ব্যাস}}{6}=\frac{4.3\,r^3}{3}=\frac{4\pi r^3}{3}$

[এখানে $\pi=3$]

নারায়ণ প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞের সম্মান না পেলেও অন্তত বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের উপপাদ্যের উন্নতিসাধনে তাঁর এমন দু'একটি আবিষ্কার আছে যার

মূল্য অপরিসীম। এ-বিষয়ে তিনি ব্রহ্মগুপ্তের চেয়েও কয়েক পদ অগ্রসর হতে পেরেছেন, এটা কম গৌরবের নয়। তাঁর 'কর্ণত্রয়' উপপাদ্যটি হলো :

সর্বচতুর্বাহুনাং মুখস্য পরিবর্তনে যদা বিহিতে।
কর্ণস্তদা তৃতীয়ঃ পর ইতি কর্ণত্রয়ং ভবতি ॥

—কোন চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের উপর ও পার্শ্বের বাহু পরস্পর বিনিময় করে তৃতীয় কর্ণ পাওয়া যায়। সুতরাং কর্ণ তিনটি।

কর্ণত্রয়ীর সাহায্যে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি তাঁর একটি নতুন আবিষ্কার।

দ্বিগুণব্যাস বিভক্তে ত্রিকর্ণঘাতোঽথবা গণিতম্।

—কর্ণত্রয়ীর গুণফলকে পরিব্যাসের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।

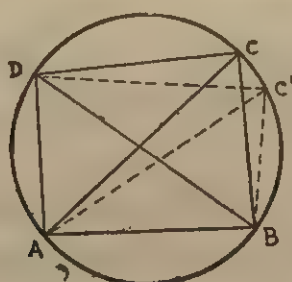

চিত্র—25

চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $=\triangle ACD+\triangle ACB$

$$=\frac{AC.\ AD.\ CD}{4r}+\frac{AC.\ BC.\ AB}{4r}$$

$$=\frac{AC}{4r}\left[BC'.\ AD+DC'.\ AB\right]$$

[এখানে r=পরিব্যাসার্ধ]

[এখানে, C'=শীর্ষবিন্দু, DC এবং BC পরস্পর বিনিময় দ্বারা]

টলেমীর উপপাদ্য অনুসারে,

$BC'.\ AD+DC'.\ AB=AC'.\ BD$

$\therefore$ চতুর্ভুজ $ABCD = \frac{AC}{4r}(AC'.BD)$

$$= \frac{AC.\ AC'.\ BD}{2d}$$

নারায়ণ পরিব্যাসার্ধের সূত্র দিয়েছেন,—

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\text{কর্ণের গুণফল} \times \text{তির্যক বাহুর গুণফল}}{\text{উচ্চতার গুণফল}}}$$

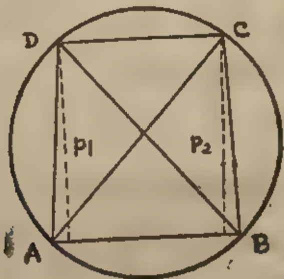

চিত্র—26

ত্রিভুজ ADB থেকে, $r = \frac{AD.\ BD}{2p_1}$

এবং ত্রিভুজ ACB থেকে, $r = \frac{AC.\ BC}{2p_2}$

$$\therefore\quad r^2 = \frac{AD.\ BD.\ AC.\ BC}{4p_1p_2}$$

$$\text{বা, } r = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{AC.\ BD.\ AD.\ BC}{P_1P_2}}$$

$$\text{অর্থাৎ পরিব্যাসার্ধ} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\text{কর্ণের গুণফল} \times \text{তির্যক বাহুর গুণফল}}{\text{উচ্চতার গুণফল}}} \quad \cdots(1)$$

আবার, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলের পরিপ্রেক্ষিতে পরিব্যাসার্ধের একটি সূত্র পাওয়া যায়:

$$\text{পরিব্যাসার্ধ} = \frac{\text{তিনটি কর্ণের গুণফল}}{4A} \quad \ldots(2)$$

[A= চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল]

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

"The early history of the mind of men with regard to mathematics leads us to point out our own errors; and in this respect it is well to pay attention to the history of mathematics."

—De Morgan

॥ ভাষ্যকার-পরিচয় ॥

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় গণিতের স্বর্ণ-যুগ। ইউরোপে এই সময়টি ছিল গাণিতিক অবক্ষয়ের যুগ। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, মহাবীর ও ভাস্করের সঙ্গে তুলনীয় এমন গণিতজ্ঞ ইউরোপের গণিতের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর পর যেখানে ইউরোপে গাণিতিক আবিষ্কারের বন্যা বয়ে গেছে, সেখানে ভারতে দেখা গেছে চরম দুর্দিন। দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন গণিতজ্ঞের কিছু আবিষ্কার ছাড়া সারা ভারতে যেন গণিত-চর্চা হয়নি বললেই চলে। কেন এরূপ অবক্ষয় হলো, তার দুটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে: (1) মধ্যযুগ বিশ্ব-ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ বলে কথিত। মনে হয়, এই যুগ-বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতীয় গণিতের অবক্ষয়। ইউরোপ এই যুগ-বৈশিষ্ট্যের কবলে পড়েছিল। কিন্তু রেনেশাঁর প্রেরণায় নতুন উদ্দীপনা ও চেতনা পেয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পেরেছিল। ভারত পারেনি। পারেনি,—কারণ (2) দশম শতাব্দীর পর মুসলমান-আক্রমণে এ-দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল বিষয়েরই স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় মনীষা প্রধানত রক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করায় নব নব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ পায়নি। উত্তরভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারত অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব অঞ্চল বলে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে গণিত-চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় গণিতে দক্ষিণ ভারতের অবদান কম নয়। প্রথম ভাস্কর, মহাবীর,

ভাস্কর প্রভৃতি অতি উচ্চশ্রেণীর গণিতজ্ঞদের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতে। আর্যভটের দক্ষিণ ভারতে জন্ম নিয়ে বির্তক আছে। আর আধুনিক যুগের বিশুদ্ধ গণিতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা রামানুজমের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতেই। জল, বায়ু, মাটি ও ওই অঞ্চলের মানসিক প্রবণতা খুব সম্ভব গাণিতিক প্রতিভা বিকাশের অনুকূলে। বাংলার মাটি যেমন কাব্যপ্রতিভা বিকাশের অনুকূল, পাঞ্জাব যেমন ক্ষাত্র-শক্তি বিকাশের অনুকূল, দক্ষিণ ভারতও তেমনি গাণিতিক প্রতিভা বিকাশের অনুকূল বলে মনে হয়। ভারতীকৃষ্ণ তীর্থজীও তার আর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

গাণিতিক প্রতিভার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যে কোন আঞ্চলিক তথা ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব আছে কি না, এ-সম্পর্কে বিতর্ক আছে। গণিতজ্ঞ ও মনোবিদরাও এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না। তবে প্রখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ ফেলিক্স ক্লেইন (Felix Klein) গাণিতিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,—"It would seem as if a strong naive space intuition were an attribute of the Teutonic race, while the critical, purely logical sense is more developed in the Latin and Hebrew races."

॥ পৃথূদকস্বামী ॥

প্রধানত ভাষ্যকার হিসাবে এঁর খ্যাতি। ইনি নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। পিতার নাম মধুসূদন শ্রীভট্ট। ইনি ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাষ্যকার। ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত ও খণ্ডখাদ্যকের উপর এঁর ভাষ্যই প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে ধরা হয়। আর্যভটের ভূ-ভ্রমণবাদ সমর্থন করে ইনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি, তাঁর ভাষ্যে যে-সব উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, তার অনেকগুলি তাঁর নিজস্ব বলে মনে করা হয়। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীপতির গ্রন্থে পৃথূদকস্বামীর উল্লেখ আছে। এ থেকে অনুমিত হয়, তিনি শ্রীপতির পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী এই দু'শ বছর ধরে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা প্রধানত ভাষ্যরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তবে তারই মধ্যে যে কোন মৌলিক আবিষ্কার হয়নি, একথা বলা যায় না। যথাস্থানে আমরা আধুনিক উচ্চতর গণিতের কয়েকটি আবিষ্কারের পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা করব।

॥ পরমেশ্বর ॥

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার পরমেশ্বর। ইনি খুব সম্ভব 1360 খ্রীষ্টাব্দে কেরালার দক্ষিণ মালাবারের 'আলত্তুর' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গোত্রের নাম ছিল ভৃগু। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর গুরুর নাম রুদ্র। নারায়ণ ও মাধব নামে আরো দু'জন গুরুর নাম জানতে পারা যায়।

পরমেশ্বর প্রায় 30 খানি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর মৌলিক রচনার যেমন অভাব নাই, তেমনি আর্যভট, প্রথম ভাস্কর ও ভাস্করের উপর মূল্যবান ভাষ্য-গ্রন্থেরও অভাব নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'দৃক'-পদ্ধতি আবিষ্কারে তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ ও গণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতির উদ্ভব। অবশ্য 'পরহিত'-পদ্ধতির সংস্কারের মধ্যে এই পদ্ধতির সূত্র নিহিত আছে। 55 বছর ধরে অনলস পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা ক'রে তিনি এই পদ্ধতি 1431 খ্রীষ্টাব্দে লোকগোচরে আনেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো :

(1) দৃগ্‌গণিত, (2) গোলদীপিকা, (3) গ্রহণমণ্ডন, (4) ভটদীপিকা, (5) লঘুভাস্করীয়, (6) কর্মদীপিকা, (7) সিদ্ধান্ত-দীপিকা (8) লঘুমানসের ভাষ্য, বিবরণ প্রভৃতি।

পরমেশ্বরের গাণিতিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তাঁর পুত্র দামোদর। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রিয় শিষ্য নীলকণ্ঠের লেখা থেকে জানা যায় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর লেখার কিছু কিছু উদ্ধৃতি কেবল নীলকণ্ঠের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

নীলকণ্ঠ সোমযাজী (প্রথম নীলকণ্ঠ)

শৈব নীলকণ্ঠ কেরালার শ্রীকুণ্ডপুর বা শ্রীকুণ্ডগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর 'সিদ্ধান্তদর্পণ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি 1443 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নীলকণ্ঠের পদবী সোমযাজী, সোমসুত, সোমসুত্বন প্রভৃতি। তিনি ছিলেন গার্গ্য-গোত্রীয় ভট্ট ব্রাহ্মণ। পিতার

নাম জাতবেদ, খুল্লতাতের নামও তাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শঙ্কর। তাঁর স্ত্রীর নাম আর্যা এবং রাম ও দক্ষিণামূর্তি নামে তাঁর দুটি পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আর্যভটীয় ভাষ্যের বহু স্থানে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্করের উল্লেখ করেছেন। নেতৃনারায়ণ ছিলেন নীলকণ্ঠের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এমন কি আর্যভটীয় ভাষ্য রচনার প্রেরণা তিনি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। নেতৃনারায়ণ ও তাঁর পরিবারের কেরালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে। বিদ্বান ও বিদ্বোৎসাহী হিসাবে এই পরিবার বিখ্যাত।

নীলকণ্ঠের প্রথম গুরু রবি। তাঁর কাছে তিনি বেদান্ত ও প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ নেন। কিন্তু প্রকৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করেন দৃগ্‌গণিতের আবিষ্কারক পরমেশ্বরের পুত্র দামোদরের কাছে। এমন কি ছোটবেলায় গুরুগৃহে তিনি গুরুর গুরু পরমেশ্বরের কাছেও সামান্য পাঠ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শুধু গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সে কারণে তাঁকে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে "ষড়্‌-দর্শনী-পারঙ্গত" বলে আখ্যাত করা হয়েছে। মীমাংসা, ছন্দসূত্র, ব্যাকরণ, অভিধান, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তাঁর রচনায় আছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ থেকে শুরু করে আর্যভটীয়, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক, বৃহৎসংহিতা, সূর্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত-শেখর, লঘুমানস প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গোবিন্দস্বামিন, পরমেশ্বর, দামোদর, মাধব প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে নীলকণ্ঠ ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী।

নীলকণ্ঠ রচিত সব গ্রন্থের আবিষ্কার এখনো সম্ভব হয়নি। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো : (1) **গোলসার**, (2) **সিদ্ধান্তদর্পণ**, (3) **ছায়াগণিত**, (4) **তন্ত্রসার সংগ্রহ**, (5) **মহাভাষ্য** (আর্যভটীয়-ভাষ্য), (6) **গ্রহণ নির্ণয়**, (7) **গ্রহণাদিগ্রন্থ** প্রভৃতি।

নীলকণ্ঠ আর্যভটীয়-ভাষ্যের নাম দিয়েছেন **মহাভাষ্য**। সত্যই এটিকে মহাভাষ্য বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, জটিল ও দুরূহ আর্যভটীয় গ্রন্থের এমন বিস্তৃত ব্যাখ্যা বোধ হয় আর নাই। উদাহরণস্বরূপ আর্যভট পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতটি কেন 'আসন্ন' বলে অভিহিত করেছিলেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠ বলছেন : **"প্রকৃত মানের পরিবর্তে কেন এখানে আসন্ন মান দেওয়া হয়েছে? আমি ব্যাখ্যা করব। কারণ প্রকৃত মান দেওয়া যাবে না। যে-মানে ব্যাস**

পরিমাপ করলে ভাগশেষ থাকে না, সে-মানে পরিধি পরিমাপ করলে নিশ্চিত ভাগশেষ থাকে। একইভাবে যে-এককে পরিধি পরিমাপ করলে ভাগশেষ থাকে না, সে-এককে ব্যাস পরিমাপ করলে আবার ভাগশেষ থাকে। প্রক্রিয়াটির বার বার সম্পাদনে আমরা ক্ষুদ্রতম ভাগশেষ পেতে পারি বটে, কিন্তু ভাগশেষহীন হবে না। ইতি ভাবঃ।"

আর্যভট বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন $\frac{1}{2}$. পরিধি. $\frac{\text{ব্যাস}}{2}$। কিন্তু কিভাবে আর্যভট এই সিদ্ধান্তে এলেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নীলকণ্ঠের ভাষ্যে।

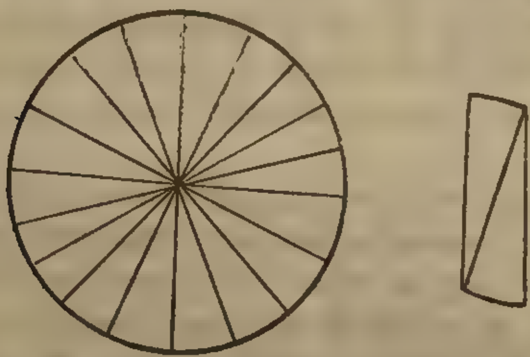

চিত্র—27

উপরের চিত্রের মত একটি বৃত্তকে বহু সূচ্যাকারক্ষেত্রে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই সূচ্যাকারক্ষেত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা হবে, ততই ত্রিভুজসমূহের ভূমি সরলরেখায় পরিণত হবে। এখন, এরূপ ক্ষুদ্র দুটি সূচীকে পরস্পর উল্টো ভাবে স্থাপন করলে একটি আয়তক্ষেত্র উৎপন্ন হবে যার একটি বাহু বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান হবে, আর সূচীর ভূমি হবে অন্য একটি বাহু। এভাবে বৃত্তটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রের সমষ্টিরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এভাবে একটি মাত্র আয়তক্ষেত্র গঠিত হবে যার একটি বাহু বৃত্তের অর্ধ-পরিসীমা এবং অন্য বাহুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ। এই যুক্তির দ্বারা বৃত্তের ক্ষেত্রফল সূত্র হয়—
$\frac{1}{2}$ পরিসীমা × $\frac{1}{2}$ ব্যাস।

॥ কয়েকটি পরিবারের কথা ॥

চতুর্দশ শতাব্দীর আর দু'জন ভাষ্যকার হচ্ছেন গদাধর ও তদীয় ভ্রাতা বিষ্ণু। এঁরা ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী। গদাধর ভাস্করের লীলাবতী ও বীজগণিতের

ভাষ্য রচনা করেন এবং বিষ্ণু শ্রীধরের গণিতের ন্যায় **'গণিত-সার'** রচনা করেন। এই গ্রন্থে ত্রিশতিকার অনেক উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্ররূপে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা প্রধানত ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও টীকা রচনার মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন।

জ্ঞানরাজ গোদাবরী ও বিদর্ভের সঙ্গমস্থলে পার্থপুরে 1503 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্কলন গ্রন্থ **'সিদ্ধান্ত-সুন্দর'**-এর রচয়িতা হিসাবে তাঁর সমধিক খ্যাতি। ভাস্করের বীজগণিতের উপরেও তাঁর ভাষ্য আছে। জ্ঞানরাজের সুযোগ্য পুত্র **সূর্যদাস**ও ভাস্করের বীজগণিতের উপর ভাষ্য রচনা করেন। **'গণিতামৃতকূপিকা'** নামে একটি পাটীগণিত গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। জ্ঞানরাজের শিষ্য **ঢুণ্ডিরাজ**ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষ্য রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর আরব সাগর তীরবর্তী নন্দীগ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ পরিবারের নাম ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয়। এই পরিবারের **গণেশ দৈবজ্ঞ** ছিলেন সত্যকার মৌলিক গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রচিত ভাস্করের লীলাবতী ভাষ্য **'বুদ্ধিবিলাসিনী'** পাটীগণিতের একটি ক্লাসিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। গণেশের পিতার নাম **কেশব** ও এক ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম **নৃসিংহ**। উভয়েরই জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান আছে। তাঁর এক ভাগিনা **লক্ষ্মীদাস**ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত গোদাবরীর উত্তর তীরস্থ গোলগ্রামের আর এক ব্রাহ্মণ পরিবার জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থানরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। গণেশের শিষ্য **দিবাকর** ছিলেন এই পরিবারের শীর্ষে। দিবাকরের পাঁচ পুত্র সুযোগ্য পিতার তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দিবাকরের পাঁচ পুত্রের নাম,—**কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মল্লারি, কেশব ও বিশ্বনাথ**। এঁরা সকলেই, বিশেষ করে মল্লারী ও বিশ্বনাথ কালক্রমে ভাষ্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কয়েক পুরুষ ধরে এই পরিবারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কৃষ্ণের পুত্র **নৃসিংহ** এবং নৃসিংহের চারপুত্র **দিবাকর, কমলাকর, গোপীনাথ ও রঙ্গনাথ** এই গাণিতিক ঐতিহ্য বহন করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেন। সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-বিবেকের গ্রন্থকার কমলাকর ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত অধিকার অর্জন করা ছাড়াও আরবীয় ও পারসীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইউক্লিড ও পারসীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি স্থাপন করে

তিনি ভাস্করের সমালোচনা করেন। রঙ্গনাথ 'মিতভাষিণী' নামে লীলাবতীর ভাষ্য রচনা করেন।

পূর্বপুরুষদের বৃত্তি অবলম্বন করে মধ্যপ্রদেশের ইলাচপুর নিবাসী বল্লাল আর একটি পারিবারিক গাণিতিক ঐতিহ্য স্থাপন করেন। কীর্তিবান পাঁচ পুত্রের পিতা বল্লাল গোলগ্রাম-নিবাসী দিবাকরের মতই ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ও রঙ্গনাথ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অধিক খ্যাতি অর্জন করেন। কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ছিলেন দিবাকরের পুত্র বিষ্ণুর শিষ্য। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রধান জ্যোতিষীর আসন অলঙ্কৃত করতেন। ভাস্করের বীজগণিতের উপর 'নবাঙ্কুর' ও লীলাবতীর উপর 'কল্পলতাবতার' টীকা রচনা করেন। রঙ্গনাথ সূর্য সিদ্ধান্তের উপর 'গূঢ়ার্থপ্রকাশ' নামে এক সহজ ও সুন্দর বিবরণ প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। রঙ্গনাথের পুত্র মুনীশ্বর ছিলেন ভাস্করের একজন প্রধান অনুরাগী ও সমর্থক। 'মরীচি' নামে সিদ্ধান্তশিরোমণির একখানি টীকা ও 'পাটীসার' নামে একখানি পাটীগণিত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। কমলাকর ভাস্করের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করায় তিনি প্রতিবাদ করেন।

উপরের আলোচনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও রীতি অনুযায়ী জ্ঞান গুরু থেকে শিষ্য এবং পিতা থেকে পুত্রের মাধ্যমে বাহিত হয়ে চলে আসছে। ডঃ কে. ভি. শর্মা তাঁর **A History of the Kerala School of Hindu Astronomy** গ্রন্থে এই ঐতিহ্য বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরকম একটি ধারা হচ্ছে : গোবিন্দ ভট্টতিরি (1237—95)→শিষ্য : পরমেশ্বরের পিতামহ (13-14 শতাব্দী)→ নাতি ও শিষ্য : পরমেশ্বর (1360—1455)→পুত্র : দামোদর (পঞ্চদশ শতাব্দী) →শিষ্য : নীলকণ্ঠ সোমযাজী (1443—1545)→শিষ্য : জ্যেষ্ঠদেব (1500—1600)→শিষ্য : অচ্যুত পিষারটি (1500—1621)।

॥ সোয়াই জয় সিং ॥

গণিতের ইতিহাসে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজরাজড়াদের স্থান আছে বটে, কিন্তু কোন রাজ-রাজড়া গাণিতিক আবিষ্কার করেছেন এমনটি দেখা যায় না। সিরাকুজের রাজা হীরন ও তাঁর পুত্র গেলন বিশ্ববন্দিত গ্রীক গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গাণিতিক গবেষণায় উৎসাহদাতা ছিলেন টলেমী-রা; রাশিয়ার

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণ ছিলেন অয়লারের ন্যায় গণিতজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক; জার্মানীর ফার্ডিনান্ড ছিলেন গাউসের শিক্ষা ও কর্মজীবনের উৎসাহদাতা; আর নেপোলিয়ান তো ল্যাপলাস, মার্গেনে, লেজেণ্ডার প্রমুখ গণিতজ্ঞদের সমাদর ও আনুকূল্য করতেন। এইরকম আরো গণিতজ্ঞ রাজানুকূল্য পেয়েছেন,—আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম নাই। ইতিপূর্বে আমরা মহাবীরের কথা বলেছি; মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে কেরালা রাজ্যের অনেক জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ রাজানুকূল্য পেয়েছেন। এমন কি, মুসলমান শাসনকর্তারাও অনেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদদের সমাদর করেছেন। অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু ভারতে হিন্দু রাজা-রাজড়াদের মধ্যে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদের অভাব দেখা যায় না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যে কয়েকজন রাজা-মহারাজা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করেছেন, তাঁরা কেউই তেমন বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। মনে হয়, একদিকে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা, আর অপর দিকে রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ ইত্যাদি পরিচালনা,—এই দুই মেরুর মধ্যে সমতা স্থাপন করা একান্তই অসম্ভব। অন্তত জয় সিং-এর গাণিতিক গবেষণা ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন থেকে এরূপই মনে হয়।

॥ জয় সিং-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

ঔরংজেবের বিখ্যাত সেনাপতি জয় সিং-এর নাম সর্বজনবিদিত। দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 1667 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন আমাদের আলোচ্য জয় সিং-এর জন্ম হয়নি। আমাদের আলোচ্য জয় সিং যিনি সোয়াই জয় সিং নামে অধিক পরিচিত, তিনি 1686 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর মাত্র তেরো বছর বয়সে 1699 খ্রীষ্টাব্দে অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হিসাবে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁর সময় লেগেছিল, এবং প্রথম দিকে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর 1708 খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমগ্র রাজ্যের অধিকার লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হন। শাসনকর্তা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও পণ্ডিত হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। রাষ্ট্রনীতিতে প্রখর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি ওই সময়ে ম্যাকিয়াভেলি নামে অভিহিত হতেন। 1719 খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ শাহ কর্তৃক আগ্রা ও মালবের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানীর নাম জয়নগর বা জয়পুর। বলা বাহুল্য,

তাঁর নাম অনুসারেই এই নামকরণ হয়। তাঁর সময়ে জয়পুর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে তিনি একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মানমন্দিরের গুরুত্বের কথা না বললেও চলে।

অতি অল্প বয়স থেকেই জয়সিং গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন, এবং সম্ভবত জগন্নাথ পণ্ডিতের প্রভাব তাঁর উপর খুবই কার্যকরী ছিল। যাই হোক, অবিরাম অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নীতি ও নিয়মাদি আয়ত্ত করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচলিত সারণী ত্রুটিপূর্ণ বলে তিনি স্বয়ং এই ত্রুটি সংশোধন ও সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দিল্লী মানমন্দিরে সাত বছর যাবৎ নক্ষত্র ও গ্রহাদি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ, রাজ্যশাসন আর সেই সময়কার বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত আবহাওয়ায় কীভাবে তিনি এই সময় পেয়েছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়!

প্রকৃত সত্যানুসন্ধান ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর গোঁড়ামি ছিল না, আর তিনি বিশেষ কোন গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় জ্ঞানীগুণীদের অনুসরণ ও তাঁদের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি গ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। গ্রীক, ইউরোপীয় ও আরবী-ফার্সী বহু গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, এবং কিছু কিছু সংস্কৃত ও ফার্সী অনুবাদ করিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। তাঁর রাজসভায় ইউরোপীয় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ ছিল। ভারতের প্রধান প্রধান পাঁচটি শহরে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি। জয়পুর, মথুরা, বারাণসী, উজ্জয়িনী ও দিল্লীতে যে-সব বৃহদাকার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আছে, সেই প্রসঙ্গে টড বলেন **"monuments that irradiate a dark period of Indian History."***

।। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান ।।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও পরীক্ষালব্ধ গবেষণার মধ্যে শেষেরটির প্রতি জয় সিং-এর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ দেখা যায়। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে তিনি কেবল পারদর্শিতাই দেখাননি,—এ-বিষয়ে তাঁর স্বভাবজাত প্রবণতা ছিল বলে মনে হয়। তিনি যে-সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছিলেন, তাতে পূর্ব প্রচলিত যন্ত্রপাতির সংস্কার ও উন্নতিসাধন অবশ্যই আছে, কিন্তু কেবলমাত্র নকল

* Annals and Antiquities of Rajast' han—(Vol-II)—J. Tod. Page-360.

করা বা অনুকরণ করার প্রবৃত্তি ছাড়া মৌলিকতা বা প্রতিভার স্বাক্ষর কিছু নাই বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। একথা সত্য, তাঁর উপর ইসলামিক জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু ইসলামিক প্রভাব কেবলমাত্র জয় সিং-এর উপর কেন, পাশ্চাত্য জোতিবিজ্ঞানীদের উপরেও দেখা যায়। ইস্তানবুল মানমন্দিরের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সৈয়দ হোসেন নাসির বলেন,—

"......it is of great importance in that most likely it is to some extent on the basis of the Istanbul observatory as well as the earlier ones of Samarqund and Maraghah that the first major observatories of the West such as those of Brahe and Kepler were constructed and supplied with similar instruments." * বস্তুতপক্ষে, মধ্যযুগে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে মুসলমান পণ্ডিতদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। কম-বেশী ইউরোপ ও ভারত তাঁদের কৃতিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম সমালোচক জি. আর. ক্যে সাহেবের মন্তব্য পড়লে মনে হয় যেন তিনি জয় সিং-এর প্রতিভার মৌলিকতা আমল দিতে চান না। তিনি বলেন,—"The instruments themselves are evolved from the types used by the Muslims, and Jai Singh's inspiration was avowedly of Muslim origin."** ক্যে সাহেবের গ্রন্থটি পড়লে মনে হয় যেন জয় সিং-এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগম্য সবই আরব, গ্রীক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাওয়া, আর ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন ঐতিহ্যই নেই। তাঁর মতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা "derived the fundamentals of their astronomical science from the greeks."*** ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে গ্রীক প্রভাব নেই, তা নয়। কিন্তু ঋগ্বেদ-বেদাঙ্গজ্যোতিষ-সূর্যসিদ্ধান্ত-আর্যভট-বরাহমিহির-ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্করের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রীকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সার কথা শিখেছিলেন বললে বোধ করি শিশুদেরও হাসি পাবে।

* Islamic Science—Seyyed Hossein Nasr, Page—114

** The Astronomical observations of Jai Singh—G. R. Kaye, Page—88

*** The Astronomical observations of Jai Singh—G. R. Kaye, Page—84

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যন্ত্রের ব্যবহার প্রাচীনকাল অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগ থেকেই দেখা যায়। ঋগ্বেদে অত্রিমুনি তুরীয় যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। অথর্ববেদে শঙ্কু যন্ত্রের উল্লেখ আছে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ঘটীযন্ত্র ও শঙ্কু-র সাহায্যে সময় পরিমাপ হতো। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতে যন্ত্রাদি বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা আছে। তুরীয়, ঘটীযন্ত্র, জলযন্ত্র বা কপালযন্ত্র, শঙ্কু, চক্র, চাপ, ধনু, যষ্টি, পীঠ, কর্তরী, ফলকযন্ত্র, স্বয়ংবহযন্ত্র এবং গোলযন্ত্র তাদের কয়েকটির নাম। আমাদের মনে হয়, চক্রযন্ত্র ও ফলকযন্ত্র খুব সম্ভব যন্ত্ররাজ বা অ্যাস্ট্রোলাব-এর (Astrolabe) পূর্বরূপ। এই সম্পর্কে S. N. Sen বলেন,—'Bhāskara II describes a versatile *Phalaka Yantra* which is essentially a circle or *Cakra* which possibly served the propose of an astrolabe* এইসব উল্লেখ থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের রীতি ও ঐতিহ্য ভারতে অতি প্রাচীন। সুতরাং, জয় সিং যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য '*Inspiration*' আরবদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, রীতি ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হননি, এমন কি ভাস্কর কর্তৃকও প্রভাবিত হননি, —একথা মেনে নেওয়া কষ্টকর। জয়সিং-এর মানমন্দির সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড: নাসিরও স্বীকার করেছেন তাতে 'elements of Hindu astronomy' আছে। জয় সিং কর্তৃক বিশালকায় যন্ত্রাদির নাম :

(1) সম্রাট যন্ত্র : ভারতের চারটি শহর দিল্লী, জয়পুর, বারাণসী ও উজ্জয়িনীতে এই যন্ত্র নির্মিত হয়।

(2) জয় প্রকাশ : দুইটি শহর জয়পুর ও দিল্লীতে নির্মিত হয়।

(3) রাম যন্ত্র : এটিও দুইটি শহর জয়পুর ও দিল্লীতে নির্মিত হয়।

(4) দিগংশযন্ত্র : তিনটি শহর বারাণসী, উজ্জয়িনী ও জয়পুরে স্থাপিত হয়।

(5) দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্র : এটিও তিনটি শহর জয়পুর, বারাণসী ও উজ্জয়িনীতে আছে।

(6) নাড়িবলয় যন্ত্র : জয়পুর, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতে স্থাপিত হয়।

(7) বৃত্তি ষষ্ঠাংশক : দিল্লী ও জয়পুরে নির্মিত হয়।

(8) মিশ্র যন্ত্র : কেবলমাত্র দিল্লীতে স্থাপিত হয়।

---

* A Concise History of Science in India—D. M. Bose, S. N. Sen, & B. V. Subbarayappa, Page—125

(9) রাশি বলয় : কেবলমাত্র জয়পুরে স্থাপিত হয়।

(10) কপাল : কেবলমাত্র জয়পুরে স্থাপিত হয়।

জয় সিং নির্মিত ও উদ্ভাবিত সব যন্ত্রাদির বর্ণনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র একটি যন্ত্র বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। বৃহদাকার যন্ত্রাদির মধ্যে সম্রাট যন্ত্র শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি সম-সময় নির্দেশক সূর্যঘড়ি ('equal hour sundial')। ভারতের চারটি প্রধান শহর দিল্লী (1710-24), জয়পুর (1734), বারাণসী (1680-1737) ও উজ্জয়িনীতে (1728-34) নির্মিত হয়। এই যন্ত্রের আকার সব জায়গায় একই রকম হলেও, মাত্রাগুলি কিন্তু সমান নয় অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় পার্থক্য আছে। সবচেয়ে বড়টি জয়পুরে নির্মিত হয়, আর সবচেয়ে ছোটটি বারাণসীতে। জয়পুরে নির্মিত যন্ত্রটির উচ্চতা 75 ফুট 3 ইঞ্চি এবং বারাণসীতে নির্মিত যন্ত্রটির উচ্চতা 16ফুট 11½ ইঞ্চি। যাঁরা ভ্রমণপ্রেমী তাঁরা প্রায় সবাই দিল্লী ও বারাণসীর মানমন্দিরে এই যন্ত্রটি দেখে থাকবেন। এমন কি, অনেকেই যে এই যন্ত্রের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছেন, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল দেখলে এই যন্ত্রের গুরুত্ব বোঝা যায় না, উপযুক্ত 'গাইড' থাকলে সম্ভব। অথবা সামান্য পড়াশুনা করলে বোঝা যায়।* আমরা এখানে প্রথমে যন্ত্রটির একটি স্কেচ ও পর পৃষ্ঠায় জ্যামিতিক চিত্র দিয়েছি। দ্বিতীয় চিত্রটি অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে এর প্রধান প্রধান অংশের বিবরণ দেওয়া হলো :

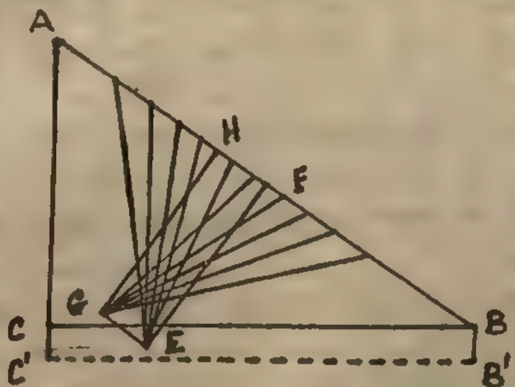

চিত্র—28a

সম্রাট যন্ত্র একটি বিষুবৃত্তীয় ঘড়িবিশেষ (equinoctial dial)। এর

* বিস্তারিত বিবরণ Kaye-এর Astronomical observations of Jai Singh, Page—33-58 দ্রষ্টব্য।

সমকোণী শঙ্কুর অতিভুজ পৃথিবীর অক্ষের সমান্তরাল এবং শঙ্কুর উভয় দিকে বৃত্তের পাদ (Quadrant) আছে যা নিরক্ষীয় তলের সহিত সমান্তরাল। প্রত্যেক পাদের প্রান্ত ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেণ্ডে অংশাঙ্কিত। কিন্তু জয় সিং-এর সময় ঘটি ও পল*-এ অংশাঙ্কিত ছিল। শঙ্কুর প্রত্যেক প্রান্তে দুটি করে ট্যানজেন্ট স্কেল (tangent scale) আছে।

চিত্র—28b

দ্বিতীয় জ্যামিতিক চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শহরে নির্মিত সম্রাট যন্ত্রের মাত্রাগুলি নিম্নরূপ :

স্থান	উচ্চতা		ভূমি	অতি-ভুজ	ব্যাসার্ধ	পাদের প্রস্থ	কোণের আসন্ন মান
	AC′	AC′	BC	AB	GH—EF	GE	∠ABC
দিল্লী	60′4″	68′0″	113′6″	128′6″	49′6″	7′7½″	28°37′
জয়পুর	75′3″	89′9″	146′11″	174′0″	49′10″	9′3⅜″	26°53′
বারাণসী	16′11½″	23′3¾″	35′10″	39′8½″	9′1⅜″	5′10″	25°14′
উজ্জয়িনী	18′6″	22′0″	43′6″	47′6″	9′1″	—	25°10′

যন্ত্ররাজ বা অ্যাস্ট্রোলাব প্রকৃতপক্ষে মুসলমান জ্যোতির্বিদরা আবিষ্কার -

* 1 পল = 24 সেকেণ্ড ; 1 ঘটি = 60 পল = 24 মিনিট

করেননি। আরবী ভাষায় এই যন্ত্রের অস্তিত্ব তৃতীয় থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে দেখা যায়। মাশাল্লাহের গ্রন্থের প্রভাবেই চসার The Conclusions of the Astrolabe লেখেন। আলী ইবন ঈশা, অলবিরুণী, নাসির অল-দীন অল-তুষী প্রমুখ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদরাও অ্যাস্ট্রোলাব সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করেন। বস্তুত মুসলমান জ্যোতির্বিদরাই এই যন্ত্রটির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য আনেন বলে অনুমান করার কারণ আছে। জয় সিং এই যন্ত্র নির্মাণ করেন এবং তা আকারে বৃহৎ। খুব সম্ভব জয় সিং ভারতীয় ও ইসলামিক প্রভাবের সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্কর এই যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মহেন্দ্র সূরী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ণয় নয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে সময় পরিমাপ, পাহাড়ের উচ্চতা এবং কূপের গভীরতা পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোন শাখায় উন্নতি তথা গবেষণা ও আবিষ্কার করতে গেলে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে অবহিত হতে হয়। জয় সিং এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এটাই বোধ করি তাঁর আধুনিক বিজ্ঞান মানসিকতা ও বিজ্ঞান সচেতনতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর গোঁড়ামি না থাকায় ইউক্লিড, হিপারকাস, টলেমী প্রমুখ গ্রীক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ এবং ইসলামিক জ্যোতির্বিদ নাসির অল-দীন অল-তুষী, উলুঘ বেগ, মৌলানা চাঁদ প্রভৃতির গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে টলেমীর **অ্যালমাজেস্ট**-এর অনুবাদ করেন এবং নাম দেন **সম্রাট সিদ্ধান্ত**। উলুঘ বেগের **জীজ**-এর সংশোধন করেন। প্রসঙ্গক্রমে '**জীজ**' শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে একটি তথ্য পরিবেশন না করে পারা গেল না। 'The word Zīj entered into Arabic from Pahlvi and into Pahlvi from Sanskrit. It means originally 'straight lines' and is connected with the lines created on a field when the field is ploughed with the help of a cow or a bull.' * যাই হোক, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে de la Hire, Flamsteed ও Napier-এর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর রাজসভায় জগন্নাথ পণ্ডিত, মুহম্মদ শরীফ, মুহম্মদ মুহদি, ফাদার অঁাদ্রে স্ট্রোবেল, ফাদার ক্লদ বোভিয়ের, ডন পেড্রো ডি সিলভা প্রমুখ পণ্ডিতগণ সমাদৃত হতেন।

---

* Islamic Science—S. H. Nasr, Page—98

জয় সিং-এর কৃতিত্ব ও অবদানের কথা বলতে গেলে সেই সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁর সময় ছিল ভারতের ইতিহাসে অধঃপতন, অবক্ষয় ও অস্থিরতার যুগ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কিভাবে বিশাল মোঘল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙে গেল, তা কারো অজানা নয়। এই যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে কোন মৌলিক গবেষণা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যা করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর সময়ে ইউরোপে আধুনিক বিশ্বের ধারণা গড়ে উঠছিল সত্য। তখন কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালেলিও ও নিউটনের তত্ত্ব ও তথ্যাদি ক্রমশ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ-দের মনে সংক্রমিত হচ্ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন ইউরোপ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই দিক থেকেই এরূপ গবেষণার অনুকূল ছিল, বিশেষত শাসনকর্তাদের আনুকূল্য ছিল,—যদিও কোপারনিকাস ও গ্যালেলিও তাঁদের সৌরকেন্দ্রিক পরিকল্পনার জন্য নিগৃহীত হয়েছিলেন। 1743 খ্রীষ্টাব্দে জয় সিং-এর মৃত্যু হয়। টড-এর ভাষায় "**his wives, concubines, and *Scions* expired with him on his funeral pyre**".* এতে অনেকে মজা পেতে পারেন বটে, কিন্তু দিল্লী, জয়পুর, বারাণসী, উজ্জয়িনী ও মথুরার মানমন্দির এখনো বিরাজ করছে, তাঁর বিজ্ঞানকে জীবিত রেখেছে।

॥ দুর্লভ তিনখানি গ্রন্থ ॥

ভাস্করের পর ভারতীয় গণিতে আর নতুন কিছু হয়নি, কেবল চর্বিত-চর্বণ হয়েছে মাত্র বললে ভুল হবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন তিনটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের গাণিতিক মূল্য অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে 'যুক্তিভাষা', 'করণ পদ্ধতি' ও 'সদরত্নমালা'-র নাম উল্লেখযোগ্য। চারখানি গ্রন্থ আবিষ্কারের জন্য আমরা **Charles M. Whish**-এর নিকট ঋণী। উপরোক্ত তিনখানি ছাড়া অন্যটি 'তন্ত্রসংগ্রহ'। এই গ্রন্থগুলিতে আধুনিক গণিতের এমন উচ্চতর গবেষণা লিপিবদ্ধ আছে যা আমাদের বিস্মিত করে এবং আমরা গর্বিত হই এই ভেবে যে, নিউটন-লিবনিজ-গাউসের গাণিতিক ধারণা এ-দেশের গণিতজ্ঞরা কয়েক শতাব্দী পূর্বে উপলব্ধি করে উচ্চতর গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু তবুও আমাদের মোহভঙ্গ হয়নি। আমাদের ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির প্রতি এখনো আমরা তেমন শ্রদ্ধাশীল নই। এখনো আমরা আমাদের নিজস্ব ধারাটি হৃদয়ঙ্গম করে আধুনিকী-

* Annals and Antiquities of Rajasthan—(vol—II)—J. Tod, Page—368

করণ করতে অগ্রসর হইনি। অধ্যাপক সি. টি. রাজাগোপাল ও তাঁর ছাত্র-সহকর্মীদের ধন্যবাদ যে, তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এইসব ভারতীয় গণিতজ্ঞদের ফসল আধুনিক গাণিতিক ভাষায় আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে টি. এস. কুপ্পন্নশাস্ত্রী, টি. এ. সরস্বতী ও আর. সি. গুপ্তের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

॥ যুক্তিভাষা বা গণিত ন্যায় সংগ্রহ বা গণিত যুক্তিভাষা ॥

এই অমূল্য গ্রন্থটির রচয়িতা হিসাবে জ্যেষ্ঠদেবকে ধরা হয়। জ্যেষ্ঠদেব 1500—1610 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে গণিত ও জ্যোতি-র্বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ টি. এ. সরস্বতী যুক্তিভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন: "The chief merit of the yuktibhāṣā is that it preserves for us the rationales and proofs developed in the school, whereas the other schools either did not have them or did not preserve them." যুক্তিভাষার নিম্নলিখিত উচ্চতর সূত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায়:—

(1) $f(x+\theta)=f(x)+\theta f'(x)+\frac{\theta^2}{2!}f''(x)....$

Taylor series নামে বিখ্যাত এই সূত্রটির আবিষ্কর্তা মাধব।

(2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-.......$

এবং $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-...$

সাইন ও কোসাইন শ্রেণী-র সূত্র দুটি মাধবের ভাষায় নিম্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে:

নিহত্য চাপবর্গেণ চাপম্ তত্তৎফলানি চ।
হরেৎ সমূলযুগ্বর্গৈস্ত্রিজ্যাবর্গহতৈঃ ক্রমাৎ॥
চাপম্ ফলানি চাধোধোন্যস্যোপর্যুপরি ত্যজেৎ।
জীবাপ্ত্যৈ, সংগ্রহো 'স্যৈব বিদ্বান-ইত্যাদিনা কৃতঃ॥
নিহত্য চাপবর্গেণ রূপম্ তত্তৎফলানি চ।
হরেদ্ বিমূলযুগ্বর্গৈস্ত্রিজ্যাবর্গহতৈঃ ক্রমাৎ॥

কিন্তু ব্যাসদলেনৈব দ্বিঘ্নেনাপ্তম্ বিভাজ্যতাম্ ।
ফলান্তথোধঃ ক্রমশো ন্যাসোপর্যুপরি ত্যজেৎ ॥
শরার্থৈ, সংগ্রহো ’স্যৈব স্তেনস্ত্রী-ত্যাদিনা কৃতঃ ।

মাধবের সূত্র অবলম্বন করে অনেকেই আধুনিক গাণিতিক পরিভাষায় সাইন ও কোসাইন শ্রেণীর রূপ দিয়েছেন। ‘গণিত জগৎ’ পত্রিকায় ডঃ অমূল্যকুমার বাগের একটি প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য ডঃ বাগের মূল প্রবন্ধটি **Indian Journal of History of Science (May, 1976, vol—11)**-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এখানে ডঃ বাগের প্রবন্ধটি ‘গণিত জগৎ’ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে উদ্ধৃত করলাম।

ক্ষুদ্র চাপ s এবং ব্যাসার্ধ r-এর জন্য যদি n-তম **জীবা** ও শর-কে t_n এবং t_n^1 দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তা হলে—

$$t_n=\frac{s^{2n}s}{(2^2+2)(4^2+4)(6^2+6)\cdots[(2n)^2+2n]\,r^{2n}}$$

$(n=1, 2, 3,\ldots)$

$$\therefore\quad t_1=\frac{s^3}{3!\,r^2},\quad t_2=\frac{s^5}{5!\,r^4},\ \ldots\ldots$$

তা হলে মাধব কর্তৃক বিবৃত নিয়মানুযায়ী,—

$$\text{জীবা}=(s-t_1)+(t_2-t_3)+(t_4-t_5)+\ldots\ldots$$

$$=s-\frac{s^3}{3!\,r^2}+\frac{s^5}{5!\,r^4}\ldots\ldots(1)$$

এবং

$$t_n^1=\frac{s^{2n}r}{(2^2-2)(4^2-4)\cdots[(2n)^2-2n]\,r^{2n}}$$

$(n=1, 2, 3,\ldots\ldots)$

$$\therefore\quad t_1^1=\frac{s^2}{2!\,r},\quad t_2^1=\frac{s^4}{4!\,r^3},\ldots\ldots$$

$$\therefore\quad \text{শর}=(r-t_1^1)+(t_2^1-t_3^1)+\ldots\ldots$$

$$=r-\frac{s^2}{2!\,r}+\frac{s^4}{4!\,r^3}\ldots\ldots(2)$$

(1) ও (2)-এ $s=rx$ বসালে, আমরা নিউটন আবিষ্কৃত শ্রেণী দুটি পাই,

$$\text{Sin } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \cdots$$

এবং

$$\text{Cos } x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \cdots$$

নিউটন কর্তৃক আবিষ্কৃত উপরোক্ত সূত্র দুটির আবিষ্কারকও সঙ্গমগ্রামের মাধব। ইনি খুব সম্ভব 1340—1425 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। মাধব গ্রেগরী-লিবনিজের এই সূত্রটিও আবিষ্কার করেন :

$$\text{চাপ tan } x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \ldots\ldots (|x| \leqslant 1)$$

লিবনিজ π এর নিম্নরূপ মান দিয়েছেন :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \ldots$$

পাই (π)-এর অনুরূপ মানটিও মাধব কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং যুক্তিভাষা গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। ক্রিয়াকর্মকরী গ্রন্থে এই উদ্ধৃতি দেখা যায় :

ব্যাসে বারিধি-নিহতে রূপহৃতে ব্যাস সাগরাভিহতে

ত্রি-শরাদি-বিষমসংখ্যা-ভক্তম্ ঋণম্ স্বম্ পৃথক ক্রমাৎ কুর্যাৎ।

অর্থাৎ ব্যাসকে 4 দ্বারা গুণ কর। তা থেকে পর পর ব্যাসের চতুর্গুণের অযুগ্ম সংখ্যা (3, 5 ইত্যাদি) দ্বারা ভাজিত ভাগফলগুলি যথাক্রমে বিয়োগ ও যোগ কর।

যদি কোন বৃত্তের পরিধি C হয়, এবং ব্যাস D হয়, তা হলে,

$$C\ (i.e.\ \pi D) = 4D - \frac{4D}{3} + \frac{4D}{5} \cdots\cdots$$

$$\text{বা, } \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \cdots\cdots$$

॥ করণ পদ্ধতি ॥

এই গ্রন্থটির রচয়িতা এক অজ্ঞাত সোমযাজি। তিনি খুব সম্ভব ত্রিচুরের অন্তর্গত শিবপুরমের পুতুমান বা পুতুবান পরিবারভুক্ত ছিলেন। গ্রন্থটি দশটি

অধ্যায়ে বিভক্ত। সম্ভবত এটি 1732 খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। **'করণ-পদ্ধতি'** পুতুমান সোময়াজির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ হলেও তিনি অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের আবিষ্কৃত সূত্র ও পদ্ধতির আলোচনার জন্য যুক্তিভাষার ন্যায় এরও গুরুত্ব আছে। করণ পদ্ধতিতে $\pi = \frac{31,415,926,536}{10,000,000,000}$।
এই গ্রন্থে কেমন করে ক্রমিক বিভাজনের সাহায্যে π-এর আসন্ন মান পাওয়া যায় তার আলোচনা আছে। π-এর মানগুলি হবে—

$$\frac{3}{1}, \frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113}, \frac{67783}{21576}, \frac{68138}{21689} \text{ প্রভৃতি}$$

॥ সদরত্নমালা ॥

রাজকুমার শঙ্কর বর্মা এই গ্রন্থটির রচয়িতা। তিনি 1800—1838 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থটি ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সর্বশেষ শ্লোক থেকে জানা যায় এটি 1823 খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। বিখ্যাত **'পরহিত'** পদ্ধতি উদ্ভাবনের কারণটিও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শুধু তাই নয়, তারিখটির জন্যও আমরা এই গ্রন্থটির নিকট ঋণী।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের প্রায় সব ঐতিহাসিকই এরূপ মত পোষণ করেন যে, ভাস্করের পর অর্থাৎ 1150 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে গণিতচর্চা হয়নি বললেই চলে। কথাটি সর্বাংশে সত্য না হলেও ঐতিহাসিকদের এই সিদ্ধান্তে বিশেষ দোষারোপ করা যায় না। কারণ, ঐতিহাসিকরা সাধারণত প্রাপ্ত গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেই সবকিছু বিচার করেন। মধ্যযুগে সুদূর দক্ষিণভারতে যে-সব গাণিতিক গবেষণা হয়েছিল, তা প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়, আর অংশত আঞ্চলিক ভাষায়। আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকেই সংস্কৃত জানেন না, আর আঞ্চলিক ভাষায় কোন-কিছু লেখা বা পড়া তো অনেকের মতে পণ্ডশ্রম মাত্র। এ-হেন পরিস্থিতিতে মধ্যযুগের ভারতীয় গণিতের অনেক-কিছু অনালোকিত ও অনালোচিত অবস্থায় পড়ে আছে। এইসব মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও রচনাগুলি পরিশ্রম করে সম্পাদনা, অনুবাদ ও আধুনিক গণিতের ভাষায় রূপ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, এতে সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের এক গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সংস্কৃত ও গণিত বিভাগের একান্ত সহযোগিতায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে।

সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা তাঁরা যেন শুধুমাত্র অলংকার, বেদান্ত বা কাব্য-সাহিত্যের গবেষণায় নিজেদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ না করে প্রাচীন ভারতীয় গণিতের অবহেলিত ও উপেক্ষিত দিকটির প্রতি যথাযথ নজর দেন, সাহিত্য-বিজ্ঞান সব শ্রেণীর মানুষের জিজ্ঞাসা মেটাবার প্রয়াস পান।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের অনেক মূল্যবান সম্পদ এখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে। এ-বিষয়ে পণ্ডিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের যেমন সে-সব অনুবাদ, আধুনিক গণিতের ভাষায় প্রকাশ ও সম্পাদনার দায়িত্ব আছে, তেমনি আবার শিক্ষিত জনসাধারণ যাঁদের বাক্স-তোরঙ্গ-সিন্দুক ও বাজে কাগজের বস্তার মধ্যে এখনো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বন্দী হয়ে আছে এবং যা অবলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী, তাঁরা যদি উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে প্রকাশে সাহায্য করেন, তা হলে আমাদের জাতির গৌরব বৃদ্ধি পায়। কেরালার গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ কে. ভি. শর্মা লিখেছেন,—'A Competent and critical analysis, in terms of modern mathematics, of the writings of Kerala astronomers and mathematicians, written in Malayalam script, may be expected to throw light on the advances, down the centuries, made in these disciplines, in one remote corner of India.' ডঃ শর্মার এই উক্তি কেবল কেরালার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ভারতের সর্বত্র যেখানে যা এখনো অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তা প্রকাশ পেলে আমাদের গৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষ করে, সোয়াই জয় সিং-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও গণিতে প্রেরণার উৎস, তাঁর গবেষণার বিস্তারিত তথ্যাদি এবং জগন্নাথ পণ্ডিতের কর্মকৃতি ইত্যাদির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

"It is India that gave us the ingenious method of expressing all numbers by means of symbols, each symbol receiving a value of position, as well as an absolute value; a profound and important idea which appears so simple to us now that we ignore its true merit…"—L. Hogben

॥ দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতি ॥

স্থানিক-মান আবিষ্কার সংখ্যা লিখনে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মাত্র দশটি অঙ্ক,—এক থেকে নয় এবং শূন্য দ্বারা সংখ্যা-লিখন-প্রণালী মানব-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে নিঃসন্দেহে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনি সরল। যাবতীয় সংখ্যা-লিখন অঙ্কের স্থানিক-মান দ্বারা সম্ভব। এই পদ্ধতি বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত। আজ আমরা যে পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখি, বিশ্বের তাবৎ শিশুরা আজ যে পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন শিক্ষা করে, তা আমাদের প্রাচীন গণিতজ্ঞদের আবিষ্কার। প্রাচীনকালে বিশ্বের নানা স্থানে যে সংখ্যা-লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল, আজ আর সে-সব কথা কেউ জানে না; গণিতের ইতিহাসে কেবল তারা অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে মাত্র।

আঞ্চলিক ভাষা ও লিপি উদ্ভবের ফলে আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যা-লিখনের নানা প্রকার লিপি দেখতে পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতেও লিপি পার্থক্য ছিল। এ-বিষয়ে অলবিরুণী লিখেছেন, **"As in different parts of India, the letters have different shapes, the numerical signs, too, which are called aṅka, differ."** লিপি-পার্থক্য স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে। কিন্তু গণিতের মূল নীতি বদলায় নি। সংখ্যা-লিখনে দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়নি ভারতে।

দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে স্থানিক-মান দ্বারা সংখ্যা-লিখনের প্রচলন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। 346 সম্বৎ অর্থাৎ 595 শতাব্দীর গুর্জর দানপত্রে, 646 খ্রীষ্টাব্দের বেলহারি শিলালিপি, 972

শতাব্দীর অমোঘবর্ষের দানপত্রে এই রীতির প্রচলন প্রমাণ করে। ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই পদ্ধতির প্রচলন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। নীচের চিত্রে তার নমুনা দেখানো হলো :

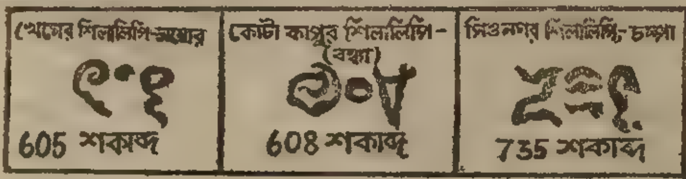

চিত্র—29

উপরের চিত্র থেকে জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের বাইরে বিন্দু (•) ও বৃত্তাকার শূন্য (0) সমেত দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে স্থানিক-মান দ্বারা সংখ্যা-লিখন প্রচলিত ছিল। শ্রীবিজয়, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া, জাভা (অর্থাৎ বর্তমান ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইত্যাদি) প্রভৃতি দেশে এই পদ্ধতির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

আজ আর আমাদের জানার কোন উপাদান বা সাক্ষ্য নাই কে বা কারা এই বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছিলেন। কোন এক প্রতিভাধর ঋষি ? বা দেশের কোন গণিত-সমিতি ? সঠিক উত্তর আমাদের জানা নাই। কিন্তু অদ্যাবধি যে-সব উপাদান ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের নিরিখে বলা যায়, ভারতে এই পদ্ধতি অন্ততপক্ষে প্রথম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এ-সব অনুমান। তবুও ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সংখ্যা-নামগুলি বিচার করলে মনে হয় ভারতে দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন ও স্থানিক-মানের ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল।

দশটি অঙ্ক দিয়ে সংখ্যা-লিখন মহাকাব্য-পুরাণ ইত্যাদি প্রায় সব গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে **মহাভারত**, পিঙ্গলের **ছন্দসূত্র**, **বিষ্ণুপুরাণ**, **অগ্নিপুরাণ**, **বায়ুপুরাণ** ও জৈন **আগমশাস্ত্র**, **অর্থশাস্ত্র** প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। দশগুণোত্তর সংখ্যা-লিখন প্রণালীর গুরুত্ব ভারতীয়রা বেশ ভালভাবেই বুঝতেন। বায়ুপুরাণে একে ব্রহ্মার আবিষ্কার বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

এষা সংখ্যাকৃতা সংখ্যা ঈশ্বরেণ স্বয়ম্ভুবা।

গণনা বিনিবৃত্তৈষা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ মানুষী ॥

মহাভারতেও এই পদ্ধতির অসংখ্য পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি,—

আধুনিক কম্পুটার বিজ্ঞানের অতি দ্রুত গণনার ইতিহাসের পরিচয়ও নল ও ঋতুপর্ণ রাজার এক কাহিনী থেকে জানতে পারা যায়। এ-বিষয়ে লেখকের "গণিতের ললিত পাঠে" সামান্য আলোচনা আছে। যাই হোক,—পাণ্ডবদের বনবাসকালে দুর্যোধন প্রভৃতিরা গরু দেখার ছল করে পাণ্ডবদের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য গিয়েছিলেন। তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে বেদব্যাস এই কথা লিখলেন,—

দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ লক্ষয়ামাস পার্থিবঃ॥
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপসৃতাস্তপি।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কা (? ক) লয়ামাস তা অপি।
অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্।
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দন॥

অনুবাদ: "তখন তিনি শতে শতে ও হাজারে হাজারে গরু দেখিলেন। অঙ্ক (অঙ্কৈঃ) এবং চিহ্ন (লক্ষৈঃ) দ্বারা রাজা সেই সকলের পরিচয় জানিলেন। অনন্তর নূতন বৎসসমূহকে অঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে দমনার্হ ও বালবৎসসমূহকে পৃথকভাবে গণনা করিলেন। তিন বৎসর বয়স্ক গোসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। এইরূপে স্মারণ করিয়া কুরুনন্দন গোপালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"

শুক্লযজুর্বেদেও এমনি সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সামান্য একটু উদ্ধৃতি ও অনুবাদ দেওয়া যাক:

"বসবস্ত্রয়োদশাক্ষরেণ ত্রয়োদশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষং রুদ্রাশ্চতুর্দশাক্ষরেণ চতুর্দশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষমাদিত্যাঃ পঞ্চদশাক্ষরেণ পঞ্চদশং স্তোমমুদজয়ংস্তমুজ্জেষমদিতিঃ ষোড়শাক্ষরেণ ষোড়শং স্তোমমুদজয়ন্তমুজ্জেষং প্রজাপতিঃ সপ্তদশাক্ষরেণ সপ্তদশং স্তোমমুদজয়ন্তমুজ্জেষং।"

অনুবাদ: "বসুগণ ত্রয়োদশ অক্ষর ছন্দে ত্রয়োদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে স্তোম জয় করব। রুদ্রদেবগণ চতুর্দশ অক্ষর ছন্দে চতুর্দশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করব। আদিত্য দেবগণ পঞ্চদশ অক্ষর ছন্দে পঞ্চদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করব। প্রজাপতি সপ্তদশ অক্ষর ছন্দে সপ্তদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে ছন্দে স্তোম জয় করব।" [বিজন বিহারী গোস্বামী]

মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্'-এ শতকিয়া গণনার একটি চিত্র দেখতে

পাওয়া যায়। যদিও এখানে দশগুণোত্তর পদ্ধতির কোন ইঙ্গিত নাই, তবুও এই সাবলীল গণনার মধ্যে দশগুণোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য যদি মহেশ্বর-নন্দন কার্তিকেয় নিতান্ত শিশু না হতেন, তা হলে হয়তো মহাকবি দশগুণোত্তর পদ্ধতির ক্রমটি অনুসরণ করতেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি উদ্ধৃত হলো :

একো নব দ্বৌ দশ পঞ্চ সপ্তেত্যজীগণন্মাত্মমুখং প্রসার্য।
মহেশ কণ্ঠোরগজদন্তপঙ্‌ক্তিং তদঙ্কগঃ শৈশবমৌগ্ধ্যমৈশিঃ॥

অনুবাদ : "মহেশ্বরনন্দন কখনো পিতার ক্রোড়ে গিয়া বালসুলভ সৌন্দর্য বিস্তার করিতে করিতে তদীয় কণ্ঠস্থিত ভুজঙ্গগণের দশনপঙ্‌ক্তি এক, নয়, দুই, দশ, পাঁচ, সাত এইরূপ গণনা করিতেন।"

হায় মহাকবি, আপনি যদি কার্তিককে সাপের দাঁত গুণতে না দিয়ে পিতার রুদ্রাক্ষের মালা গুণতে দিতেন! তা হলে হয়তো দশগুণোত্তর পদ্ধতি প্রচলন সময়ের একটা নির্দিষ্ট ও প্রামাণ্য সাল-তারিখ আমরা পেয়ে যেতাম। কিন্তু "পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ-সাল"। তা-ই হচ্ছিল বহুকাল। যাই হোক, আজ আমাদের যে-কোন সংখ্যা-লিখনে কোন অসুবিধা হয় না। অতি সহজ ও সরল এই পদ্ধতিটির গুরুত্বও আজ আর অনুভূত হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ লাপলাস এ-প্রসঙ্গে বলেন : "The idea of expressing all quantities by nine figures (digits) whereby is imperted to them both an absolute value and one by position is so simple that this very simplicity is the reason for our not being sufficiently aware how much admiration it deserves."

॥ সংখ্যা শব্দ পদ্ধতি ॥

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে ভারতে এক প্রকার সংখ্যা লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এতেও দশগুণোত্তর স্থানিক মান পদ্ধতির প্রয়োগ আছে। কিন্তু ওই রীতিতে অঙ্কে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় না; বস্তু, প্রাণীর নাম বা ধারণা-বিশেষ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। যেমন, 'চন্দ্র', 'পৃথিবী', দ্বারা 1, 'নেত্র' দ্বারা 2, আবার শূন্য (0) বোঝাবার জন্য 'আকাশ', 'সম্পূর্ণ' ব্যবহৃত হতো। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ছন্দশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই রীতির

প্রচলন দেখা যায়। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থাদি ছন্দে লিখিত হতো বলে এই পদ্ধতিতে বড় বড় সংখ্যা-লিখনের বেশ সুবিধা ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিরা জন্মতারিখ ও রচনাকাল বোঝাবার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

সংখ্যা প্রকাশে বিভিন্ন শব্দের মাত্র কয়েকটি প্রদত্ত হলো :

0= শূন্য, খ, গগন, অম্বর, আকাশ, অভ্র, ব্যোম, অনন্ত, পূর্ণ ইত্যাদি।

1= আদি, শশী, ইন্দু, বিন্দু, চন্দ্র, কলা, ধরা, সোম, শশাঙ্ক ইত্যাদি।

2= যম, যমল, অশ্বিন, দর্শ, লোচন, নেত্র, অক্ষি, দৃষ্টি, চক্ষু, নয়ন, বাহু, কর, কর্ণ, কুচ, ওষ্ঠ, জানু, যুগল, কুটুম্ব ইত্যাদি।

3= রাম, গুণ, ত্রিগুণ, লোক, ত্রিজগৎ, ভুবন, কাল, ত্রিকাল, হরনেত্র, অগ্নি, অনল, বৈশ্বানর, তপন, কৃশানু, বহ্নি ইত্যাদি।

4= বেদ, শ্রুতি, সমুদ্র, সাগর, জলধি, কেন্দ্র, বর্ণ, আশ্রম, যুগ, বন্ধু, গতি ইত্যাদি।

5= বাণ, শর, শাস্ত্র, সায়ক, ভূত, পর্ব, পাণ্ডব, তত্ত্ব, ভাব, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি।

6= রস, অঙ্গ, কায়, রাগ, ঋতু, অরি, দর্শন, কারক, কুমারবদন, লেখ ইত্যাদি।

7= পর্বত, সলিল, অচল, অদ্রি, নগ, গিরি, ঋষি, মুনি, অত্রি, স্বর, ধাতু, অশ্ব, কলত্র, দ্বীপ, মাতৃকা ইত্যাদি।

8= বসু, নাগ, অহি, গজ, দন্তি, অনুষ্টুপ, সর্প, মঙ্গল ইত্যাদি।

9= অঙ্ক, নন্দ, গ্রহ, ছিদ্র, নিধি, দ্বার, কেশব, দুর্গা, পদার্থ ইত্যাদি।

10= দিশ, দিক, দিশা, আশা, অঙ্গুলি, ককুভ, রাবণশির, অবতার ইত্যাদি।

এই পদ্ধতি ব্যবহারের ইতিহাস খুব প্রাচীন। সংহিতা, উপনিষদ, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ, শ্রৌত সূত্র প্রভৃতিতে এই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পৌলিশ-সিদ্ধান্তের একটি উদ্ধৃতিতে এক বৃহৎ সংখ্যা নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে :

খ-খ-অষ্ট-মুনি-রাম-অশ্বি-নেত্র-অষ্ট-শর-রাত্রিপাঃ=1582237800

এখানে, খ=0 অষ্ট=8, মুনি=7, রাম=3, অশ্বি=2, নেত্র=2, শর=5 এবং রাত্রিপাঃ=1

[অনুরূপে, **নগ-শিলীমুখ-বাণ-ভুজঙ্গম বহ্নি-রসেষু-গজাশ্বিন**

=2856338557]

ডান এবং বাম উভয় দিক থেকেই লিখন পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে ডান দিক থেকে বাম দিকে সংখ্যা-লিখনই সর্বসম্মত পদ্ধতিরূপে স্বীকৃত হয়। খুব সম্ভব দশগুণোত্তর স্থানিক মান পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই এ রকম হয়। আর এর ফলে অঙ্কনাম বামতো গতি-র উদ্ভব।

॥ সংখ্যা বর্ণ পদ্ধতি ॥

সংস্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের ইতিহাস প্রাচীন। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে এর ব্যবহার দেখা না গেলেও সপ্তম শতাব্দীতে এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন দেখা যায়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ আর্যভট এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক রূপদান করেন।

সংখ্যা-শব্দ পদ্ধতি অতি প্রাচীন। এই পদ্ধতির নানান অসুবিধা থেকেই অনুরূপ একটি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক রচনা এবং তার সূত্রসমূহের সৌষ্ঠব সংক্ষিপ্ততার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। পুরাতন সংখ্যা-শব্দ পদ্ধতিতে এই সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখা যেত না। ছন্দে লিখিত বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক গ্রন্থে সংখ্যা প্রকাশের জন্য অনেক সময় একাধিক শ্লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ত। **সংখ্যা-বর্ণ** আবিষ্কার এই অসুবিধা দূরীকরণে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু এই পদ্ধতির অন্য অসুবিধাও আছে। যা হোক, এই পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি গ্রীস ও আরবেও প্রচলিত ছিল। গ্রীকরা $\alpha=1$, $\beta=2$, $F=3$, $\Delta=4$ ইত্যাদি মনে করত। কিন্তু গ্রীক ও আরবদের মত ভারতে এই পদ্ধতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না; গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

আর্যভট তাঁর আর্যভটীয় গ্রন্থের **'দশগীতিকা'** অধ্যায়ে সংখ্যা-বর্ণ ব্যবহারের সূত্র দিয়েছেন:

বর্গাক্ষরাণি বর্গেঽবর্গেঽবর্গাক্ষরাণি কাৎ ঙ্মৌ যঃ।
খদ্বিনবকে স্বরা নব বর্গেঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা ॥

"অর্থাৎ ক থেকে বর্গাক্ষরবর্গ (স্থান), (য থেকে) অবর্গাক্ষর অবর্গ (স্থানে বসবে যাতে) ঙ্‌ ও ম মিলে য (হয়)। নয়টি বর্গ ও নয়টি অবর্গ (মিলে) শূন্যোপলক্ষিত আঠারটি স্থানে স্বরবর্ণ থাকবে। পরের স্থানগুলি এই প্রকার।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আর্যভটের ক্ষুদ্র গ্রন্থটি মোটেই সহজ নয়। এমন

কি অনেক পণ্ডিতও এই গ্রন্থের সব শ্লোকের সম্যক অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে পারেন না। উপরের শ্লোকটি তেমন একটি দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে। তাই,—জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আর্যভট আবিষ্কৃত সংখ্যা-বর্ণ পদ্ধতির সামান্য আলোচনা করা যাক।

এই পদ্ধতিতে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত স্পর্শবর্ণগুলির মান যথাক্রমে 1 থেকে 25 পর্যন্ত ধরা হয়। আর 'য' থেকে 'হ' পর্যন্ত অবর্গীয় বর্ণগুলির মান যথাক্রমে 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ও 100 ধরা হয়। স্বরবর্ণগুলি 10-এর ঘাতে প্রকাশিত হয়। 'য' থেকে 'হ' পর্যন্ত অবর্গ-স্থানগুলি 'অ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত নয়টি স্বরবর্ণ দ্বারা নিরূপিত হয়।

আর্যভটের মতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরবর্ণে কোন প্রভেদ থাকবে না। "অসম্পৃক্ত স্বরবর্ণের সংখ্যা খ্যাপনের অধিকার নেই। এরা শুধু অঙ্কস্থান এবং বর্গ ও অবর্গ-স্থান নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।" (প্রা. ভা. গ. চ.)

এবার এর একটি তালিকা দেওয়া যাক :

ঔ		ও		ঐ		এ		৯		ঋ		উ		ই		অ	
অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব

উপরে অ=অবর্গ-স্থান, ব=বর্গ-স্থান। মোট আঠারো স্থান, নয়টি বর্গ-স্থান ও নয়টি অবর্গ-স্থানে ভাগ করা হয়েছে। অযুগ্ম-স্থানে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয় এবং 'য' থেকে 'হ' পর্যন্ত অবর্গ বর্ণগুলি অবর্গ-স্থানে ব্যবহৃত হয়। প্রথম 'বর্গ-অবর্গ' জোড় দ্বারা প্রথম বর্গ ও অবর্গ স্থান দুটি গঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য স্থানগুলি গঠিত হয়েছে। প্রথম জোড়ের একক-দশক স্থান অ-দ্বারা, দ্বিতীয় জোড়ের শতক-সহস্র স্থান ই-দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। এইভাবে অন্যান্য জোডগুলিও অপর স্বরবর্ণের দ্বারা নিরূপিত হয়। লক্ষণীয়, স্থান-নির্দেশ ছাড়া স্বরবর্ণগুলির নিজস্ব কোন মান নাই। কোন সংখ্যা-বর্ণে স্বরবর্ণ সংযুক্তির তাৎপর্য হচ্ছে দশগুণোত্তর পদ্ধতি অনুসারে সে-বর্ণের স্থান নিরূপণ করা। দু-একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি আর একটু পরিষ্কার করা যাক :

'ঘৃ' বর্ণটি বিশ্লেষণ করলে (ঘ+ঋ) পাওয়া যায়। আচার্য আর্যভটের সংখ্যা-বর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করলে বলা যায়, এখানে ঘ-এর মান 4 এবং ঋ স্বরবর্ণ দ্বারা নিযুত-স্থান সূচিত হচ্ছে।

সুতরাং ঘৃ$=4\times10^{6}$

অনুরূপে খ্যুঘৃ$=2+10^{4}+3\times10^{5}+4\times10^{6}=4,320,000$

কারণ, খ্যুঘৃ=খ্+উ+য+উ+ঘ+ঋ$=2\times10^4+3\times10^5+4\times10^6$

[এখানে খ=2, উ=10000, য=3, উ=100000, ঘ=4, এবং ঋ=1000000]

বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করাই এই পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা। কিন্তু একটি অসুবিধার জন্য এই পদ্ধতি কখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। বাপ রে—বাপ! কার সাধ্য সংখ্যা প্রকাশের জন্য যে অর্থহীন শব্দ গঠিত হয় তার উচ্চারণ করে!!! দৈত্য-দানব-রাক্ষসাদির দন্তপঙ্ক্তিও এরকম কোন কোন শব্দ উচ্চারণকালে রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ। যেমন, এই শব্দটি,—cha ya gi yi ngu shu chchlr=চ য় গি য়ি ঙু শু ছল্ৃ।

॥ কটপয়াদি পদ্ধতি ॥

এটিও সংখ্যা-লিখনের আর একটি সাঙ্কেতিক পদ্ধতি। খুব সম্ভব আর্যভট এই পদ্ধতি জানতেন। দক্ষিণ ভারতে এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন দেখা যায়। কিংবদন্তী অনুযায়ী চতুর্থ শতাব্দীর **প্রথম বররুচি** এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। তাঁর **'চন্দ্র-বাক্য'** বা **'বররুচি-বাক্য'** এই পদ্ধতিতে রচিত। **পরহিত** পদ্ধতির আবিষ্কারক **হরিদত্ত** তাঁর **'গ্রহচার নিবন্ধ'** গ্রন্থে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। প্রথম ভাস্কর **'লঘুভাস্করীয়'**-তে এর সার্থক প্রয়োগও দেখিয়েছেন। আর্যভটের পদ্ধতির মত এটিও ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। সামান্য পরিবর্তনসহ এই পদ্ধতির কমপক্ষে চারটি প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান লেখকের **গণিতের কথা ও কাহিনীতে, ও গণিতের ললিত পাঠে** দুটি রূপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণ ও পঞ্চমবর্ণ দ্বারা যথাক্রমে 1 থেকে 9 এবং 0 (শূন্য) সূচিত করা হয়। এই পদ্ধতিতেও স্বরবর্ণের কোন মান নাই এবং তার খুশী মত ব্যবহার চলতে পারে; যুক্তাক্ষরের মানটি গৃহীত হয়।

আর্যভটীয় পদ্ধতির সঙ্গে এর একটি বিশেষ পার্থক্য যে, এখানে **অর্থহীন** শব্দের পরিবর্তে **অর্থবহ** শব্দ গঠিত হয়। এখানেও ডান দিক থেকে লেখার রীতি ছিল। যেমন,—

ভবতি=ভ-ব-তি=446=644,

এখানে, ভ=4, ব=4 এবং ত=6

ভদ্রলোকে=6431=1346 "অঙ্ক নাম্ বাম তো গতি"-র অনুসরণ এখানেও দেখা যায়।

॥ শূন্য—0 ॥

শূন্য আবিষ্কার বিশ্বগণিতের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সামান্য এই একটি চিহ্ন গণিতের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে কি অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব তখনই যখন আমরা শূন্য আবিষ্কার-পূর্ব গণিতের অবস্থাটি স্মরণ করি। আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে অসামান্য এই আবিষ্কার ভারতেই হয়েছিল, এবং ভারতীয় গণিতজ্ঞ ও দার্শনিকরা এ-বিষয়ে সমান ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক হলস্টেডের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে : **"The importance of the creation of the Zeromark can never be exaggerated. This giving to airy nothing, not merely a local habitation and a name, a picture, a symbol, but helpful power, is the characteristic of the Hindu race whence it sprang. It is like coining the Nirvāna into dynamos. No single mathematical creation has been more potent for the general on-go of intelligence and power."** [মোটা হরফ লেখকের]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে শূন্য ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে পিঙ্গল বিয়োগ অর্থে শূন্য ব্যবহার করেছেন, হয়তো সে-সময় শূন্য সংখ্যা-রূপে পরিগণিত হয়নি। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ভারতীয়রা সেই প্রাচীন কাল থেকে শূন্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

বকশালী পাণ্ডুলিপির উদাহরণের মধ্যে শূন্যের ব্যবহার দেখা যায় ; পৌলিশের সিদ্ধান্তে শূন্য ব্যবহার আছে। পৌলিশ সিদ্ধান্তে শূন্যকে সংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর জিনভদ্রগণি বিশাল সংখ্যার (224, 400, 000 000) উল্লেখ করে বলেছেন **'বাইশ, চুয়াল্লিশ এবং আটটি শূন্য"** এবং 3,200,400,000 000-এই সংখ্যার ক্ষেত্রে **"বত্রিশ, দুটি শূন্য, চার, আটটি শূন্য"** বলায় এই সিদ্ধান্ত করা যায় ওই সময় শূন্য অর্থে 'কিছু-না' বোঝাতনা। অপরপক্ষে, শূন্য তখন সাংখ্যিক রূপও পেয়েছিল। জিনভদ্র প্রদত্ত পাটীগণিতের একটি প্রক্রিয়া থেকে আরো প্রমাণিত হয় শূন্য তখন সংখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। যেমন,— $241960\frac{407150}{483920}=241960\frac{40715}{48392}$।

আর্যভট-শিষ্য প্রথম ভাস্কর তাঁর **'মহাভাস্করীয়'**গ্রন্থে শূন্য দ্বারা বিয়োগের বিষয় আলোচনা করেছেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকাল

থেকেই ভারতে শূন্যের ব্যবহার ছিল এবং এর সাংখ্যিক রূপটিও তাঁদের অজ্ঞাত ছিলনা।

শূন্যের ক্রমবিকাশে এর দুটি রূপ দেখা যায়: একটি বিন্দু (॰) রূপ ও অপরটি বৃত্তীয় রূপ (o)। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে বিন্দুরূপটি (॰) দেখা যায়; সুবন্ধুর বাসবদত্তায় শূন্যের এই রূপটিই বর্ণিত হয়েছে। আবার পাটীগণিতে পঞ্চরাশিক ও সপ্তরাশিক প্রভৃতি অঙ্কের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতরাশির পরিবর্তে শূন্যের বৃত্তীয় রূপটি (0) দেখা যায়। ভাস্করের সুদকষা অঙ্কেও এটি দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহির্ভারতের শিলালিপিতেও শূন্যের বিন্দু ও বৃত্তীয়—দুটি রূপই পরিলক্ষিত হয়। কালক্রমে বিন্দু দ্বারা ঋণাত্মক সংখ্যা সূচিত হতো বলে বোধ হয় শূন্যের এই রূপটি পরিত্যক্ত হয় এবং বৃত্তীয় রূপটি স্বীকৃতি লাভ করে।*

এই অধ্যায়ে ভারতে সংখ্যা-লিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শূন্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। প্রাচীন ভারতে আরো কয়েক প্রকার সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু তার মধ্যে দশগুণোত্তর রীতিতে স্থানিক-মান পদ্ধতিই সর্বজনীনতা লাভ করেছে। অন্য পদ্ধতিগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তবুও এই সব পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের চিন্তা-ভাবনা ও মনীষার সঙ্গে পরিচিত হই।

* শূন্যের গাণিতিক ও অন্যান্য তাৎপর্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

"Arithmetic has been the queen and the hand maiden of the Sciences from the days of the astrologers of Chaldea and the high priests of Egypt to the present days of relativity, quanta, and the adding machine."

—Kasner and Newman

॥ পাটীগণিতের বিষয়বস্তু ॥

বৈদিক সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই ভারতে পাটীগণিতের উদ্ভব। "বৈদিক ঋষিগণ গণিত বলিতে সাধারণতঃ পাটীগণিত ও জ্যোতিষকে বুঝিতেন।" কিন্তু পাটীগণিত বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা অনেক পরবর্তী কালে হয়েছে। প্রাচীনতম যে গ্রন্থটিতে পাটীগণিত বিষয়ে আলোচনা আছে, তা হলো বকশালী পাণ্ডুলিপি। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত এ-বিষয়ে কোন পৃথক গ্রন্থ রচনা করেননি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে পাটীগণিতের কিছু নিয়ম ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত অবতারণা করেছেন মাত্র। শ্রীধরের পর থেকে পাটীগণিত বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। **ত্রিশতিকা, গণিত-সার-সংগ্রহ, গণিত-তিলক, লীলাবতী, গণিত-কৌমুদী, পাটী-সার** প্রভৃতিতে পাটীগণিতের আলোচনা আছে। এ-সব গ্রন্থে ব্রহ্মগুপ্ত কথিত কুড়িটি **'পরিকর্ম'** ও আটটি **'ব্যবহার'** নানা ধরনের অঙ্কের উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। তালিকাটি অবশ্য নবম শতাব্দীর ভাষ্যকার পৃথূদকস্বামীকৃত ব্রহ্মগুপ্তের নয়।

॥ পরিকর্ম ॥

(1) সংকলিত (যোগ), (2) ব্যবকলিত (বিয়োগ), (3) গুণন, (4) ভাগাহার, (5) বর্গ, (6) বর্গমূল, (7) ঘন, (8) ঘনমূল, (9—13) পঞ্চ-জাতি, (14) ত্রৈরাশিক, (15) ব্যস্ত-ত্রৈরাশিক, (16) পঞ্চরাশিক, (17) সপ্তরাশিক, (18) নব রাশিক, (19) একাদশ রাশিক, (20) ভাণ্ড ও প্রতিভাণ্ড।

॥ ব্যবহার ॥

(1) মিশ্রক (মিশ্রণ), (2) শ্রেঢ়ী (শ্রেণী), (3) ক্ষেত্র, (4) খাত, (5) চিতি, (6) ক্রাকচিক, (7) রাশি, ও (8) ছায়া।

ভাস্করের লীলাবতী ও বীজগণিতের বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলির বেশীর ভাগের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় গণিতে বিষয়বস্তুর একটি ঐতিহ্য আছে। অবশ্য প্রতিভাধর সৃজনশীল গণিতজ্ঞদের গ্রন্থে দু'একটি সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়।

॥ প্রাথমিক চার নিয়ম ॥

যখন কালি-কলম-কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি, তখনও মানুষ গাণিতিক গণনা করেছে। বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস রোমান সৈন্যদের হাতে নিহত হবার সময় মাটিতে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বিভোর ছিলেন,—একথা অনেকের জানা। প্রাচীন কালে ভারতেও ধূলোর সাহায্যে মাটিতে বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর গাণিতিক গণনা করা হতো। তাই এক সময় ভারতীয় গণিতে গণনা অর্থে "ধূলি-কর্ম" বোঝাত। পাটীগণিত দুটি পদের সমষ্টি,—**পাটী+গণিত**। **পাটী** শব্দের অর্থ কাষ্ঠখণ্ড (বোর্ড) আর **গণিতের** অর্থ গণনা। পাঠশালায় পড়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের '**পাটী**' শব্দটি অপরিচিত নয়। একগুচ্ছ তালপাতার পাটী নিয়ে তারস্বরে অ, আ, ক, খ ও একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ লেখা ও পড়ার কথা তাঁদের আজও মনে পড়তে পারে।

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ প্রাথমিক চার নিয়ম। কিন্তু ভারতীয় গণিতে আটটি প্রাথমিক নিয়ম স্বীকৃত। অবশ্য প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এ-সব নিয়মের উল্লেখ নাই। আর্যভট দুটি নিয়মের বর্ণনা করেছেন,—বর্গমূল ও ঘনমূলের। ব্রহ্মগুপ্ত ঘনমূলের নিয়ম-পদ্ধতি দিয়েছেন। কোথাও কোথাও অতি সংক্ষেপে যোগ-বিয়োগের উল্লেখ থাকলেও কোন গণিতগ্রন্থে এদের বিস্তৃত আলোচনা নাই। গুণনের অনেক পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও বিস্তৃত আলোচনা নাই। ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন ও ঘনমূল সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। এর প্রধান কারণ এগুলি এমনি প্রাথমিক পর্যায়ের যে, আর্যভটীয় বা ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের মত

গ্রন্থে এদের আলোচনার সুযোগ থাকে না। হায়, পাঠশালার ছেলেদের জন্য রচিত যদি কোন গ্রন্থ পাওয়া যেত !

সমস্ত গাণিতিক প্রক্রিয়াই দুটি প্রক্রিয়া যোগ-বিয়োগের রূপ-বৈচিত্র্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। **মহাভাস্করীয়** প্রণেতা প্রথম ভাস্করের মতে পাটীগণিতে চারটি প্রাথমিক নিয়ম স্বীকৃত হলেও সব প্রক্রিয়াগুলিকে দুটি শ্রেণী **'হ্রাস'** ও **'বৃদ্ধি'**-রূপে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাস্করের এই সংশ্লেষণী মন্তব্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করার মত। বস্তুত, এই মন্তব্যটির মধ্যে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মনীষার চরম উৎকর্ষের পরিচয় নিহিত আছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

॥ যোগ ॥

যোগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ অতি প্রাচীন কোন গণিত বা জ্যোতিষ গ্রন্থে নাই। কিন্তু যোগ অর্থে সর্বত্রই অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,—**সঙ্কলিতা, সঙ্কলন, মিশ্রণ, সম্মেলন, সংযোজন, প্রক্ষেপণ,** যুতি ইত্যাদি। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় আর্যভট প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না বলেই হয়তো এই অতি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ করে থাকবেন। তিনি বলেছেন, **বহু সংখ্যাকে একীকরণের নাম যোগ।** তাঁর সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ :

সংখ্যাবতাং বহূনামেকীকরণং তদেব সঙ্কলিতম্।

ভাস্কর এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য একই স্থানের অঙ্কগুলিকে প্রত্যক্ষ বা বিপরীত পদ্ধতিতে যোগ করতে বলেছেন। তাঁর সূত্র :

"কার্য্যঃ ক্রমাদুৎক্রমতোঽথবাঙ্কযোগো"

অর্থাৎ "সংখ্যাগুলির যোগ তাহাদের স্থানের অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে।" ভাস্কর যোগের উদাহরণ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ বা বিপরীত পদ্ধতির অর্থ ও ব্যাখ্যা দেন নি। পরবর্তীকালের বিখ্যাত ভাষ্যকার গঙ্গাধর এর আভাস দিয়ে বলেছেন :

"অঙ্কনাম্ বামতোগতিরিতি বিতর্কেণ একস্থানাদি যোজনম্ ক্রমঃ উৎক্রমস্তু অন্ত্যস্থানাদি যোজনম্।"

এই উদ্ধৃতাংশ থেকে জানা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ ও বিপরীতের অর্থ যথাক্রমে **ক্রম** ও **উৎক্রম**।

॥ প্রত্যক্ষ বা ক্রম পদ্ধতি ॥

এই পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত যোগ-পদ্ধতির কোন পার্থক্য নাই। এই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াটি ডানদিক থেকে শুরু হয়। প্রথমে একক-স্থান-এর অঙ্কগুলি যোগ করে যোগফল লেখা হয়; তারপর দশক-স্থান-এর অঙ্কগুলি যোগ করে যদি একক-স্থানের অঙ্কের যোগফলে দশক-স্থানের কোন অঙ্ক থাকে তা-ও যোগ করে লেখা হয়। অর্থাৎ এটিই যোগ-প্রক্রিয়ার আধুনিক পদ্ধতি।

॥ বিপরীত বা উৎক্রম পদ্ধতি ॥

একে বিপরীত বা উৎক্রম পদ্ধতি বলার কারণ এই পদ্ধতিতে ডানদিক থেকে যোগ করার পরিবর্তে বামদিক থেকে শুরু করা হয়। এই পদ্ধতিতে অন্ত্য-স্থানের অঙ্কসমূহ যোগ করে নীচে লেখা হয়। তারপর পরবর্তী স্থানের অঙ্কসমূহ যোগ করে পূর্ব ফলটি সংশোধিত করা হয়। যেমন,—মনে করা যাক, অন্ত্য-স্থানের অঙ্কসমষ্টি 18 এবং পরবর্তী স্থানের অঙ্কসমষ্টি 11 হলে, অন্ত্য-স্থানের সমষ্টি সংশোধিত করে 18-এর জায়গায় 19 লেখা হবে। 8 মুছে 9 লেখা তখনকার দিনে তেমন কঠিন ছিল না। কারণ, প্রাচীন ভারতে কাগজ-কলমে লেখার প্রচলন ছিল না; ধুলা অথবা চকখড়ি দিয়ে পাটীতে লেখার প্রচলন ছিল।

॥ বিয়োগ ॥

দ্বিতীয় আর্যভট, ভাস্কর ও জ্ঞানরাজপুত্র সূর্যদাস বিয়োগের প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূর্যদাসই প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, এই প্রক্রিয়ায় বিপরীত পদ্ধতিটি সহজ। বিয়োগ অর্থে ব্যুৎকলিত, ব্যুৎকলন, শোধন, পাতন, অন্তর ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় আর্যভট বিয়োগের এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন,—

যত্তপাত্তং সর্বধনাৎ তদ্ব্যবকলিতং তু শেষকং শেষম্।

অর্থাৎ 'সর্বধন' থেকে কিছু সংখ্যা নিয়ে নেওয়াকেই বিয়োগ বলে এবং অবশিষ্টকে 'শেষ' বলে। বলা বাহুল্য, 'শেষ' মানে বিয়োগফল।

॥ প্রত্যক্ষ পদ্ধতির একটি উদাহরণ ॥

সূর্যদাস (1000 – 360) এই উদাহরণটি নিয়ে ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন যেহেতু 0-থেকে 6 বিয়োগ করা যায় না, সেহেতু 0-স্থানে 10 ধরে নিতে হবে। কারণ, একক-স্থান থেকে ঊর্ধ্বক্রমে সব অঙ্কই 10-এর গুণিতক।

॥ গুণন ॥

ভারতীয় গণিতে গুণন-প্রক্রিয়ার অন্তত সাত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত গোমূত্রিকা, ভেদ, খণ্ড ও ইষ্ট এই চার ধরনের পদ্ধতির কথা বলেছেন। ভাস্কর পাঁচ প্রকারের উল্লেখ করেছেন। গুণনের এতগুলি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে, গুণন-পদ্ধতিতে জটিলতা বেশী, আর ভুলের সম্ভাবনাও বেশী। প্রাচীন ভারতে গুণন অর্থে **হনন**, **বধ**, **ক্ষয়** ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর ও তাঁদের উত্তরসূরীরা অনেকেই **'হনন'** শব্দটি গুণন অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য **'গুণন'**, শুল্বসূত্রে **'অভ্যাস'**, আর বকশালী পাণ্ডুলিপিতে **'পরম্পরকৃতক'** শব্দগুলিও দেখা যায়।

॥ গোমূত্রিকা পদ্ধতি ॥

আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত কেন যে এই পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করেছিলেন, তার কোন সঙ্গত কারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। গোমূত্রের অর্থ অতি স্পষ্ট। কিন্তু পদ্ধতিটির সঙ্গে এর কি গভীর সম্পর্ক থাকতে পারে বলা দুঃসাধ্য। এই পদ্ধতিতে অবশ্য যে ছক ব্যবহৃত হয়, তা সর্পিলাকার গোমূত্রের মত। কিন্তু বাইরের আকার দেখে একটি পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ঐতিহাসিকরাও এ-বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেননি,—কি ইংরেজী কি বাংলায় কোন আলোচনা নাই। ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদার তাঁর 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' গ্রন্থে একইভাবে বলেছেন, "গোমূত্রিক বলতে গরুর মূত্রের মত ইতস্তত: বিক্ষিপ্তাকারে যে পদ্ধতিতে গুণ করা হয় তাকে গোমূত্রিক পদ্ধতি বলা হয়।" কিন্তু আমার মনে হয় ঐতিহাসিকদের এই ধারণাটি ঠিক নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'গোমূত্র' শব্দটি আছে। এ-বিষয়ে আলোচনা শেষ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এবার এই পদ্ধতিতে কিভাবে গুণ করা হয়, তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

উদাহরণ : 1132×123

এই পদ্ধতিতে নিম্নরূপ ছক ব্যবহৃত হতো :

1	1	1	3	2					
2		1	1	3	2				
3			1	1	3	2			

1	1	3	2		
	2	2	6	4	
		3	3	9	6
1	3	9	2	3	6

সুতরাং নির্ণেয় গুণফল=139236

॥ ইষ্টপদ্ধতি ॥

ব্রহ্মগুপ্ত কথিত এই পদ্ধতিকে বীজগাণিতিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে সুবিধামত কোন ঐচ্ছিক রাশি যোগ বা বিয়োগ করে গুণফল নির্ণয় করা হয়। ব্রহ্মগুপ্ত এই পদ্ধতির সংজ্ঞায় বলেছেন,—

গুণয়ো রাশিগু´ণকাররাশিনেষ্টাধিকোনকেন গুণঃ।
গুণয়োষ্টবধো ন যুতো গুণকেহভ্যধিকোনকে কার্যঃ ॥

ভাবানুবাদ ঃ গুণকের সঙ্গে কোন ইষ্টরাশি যোগ বা বিয়োগ করে তা দিয়ে গুণ্যকে গুণ করবে। তারপর ওই ইষ্টরাশি দ্বারা গুণ করে আগের ফলে যোগ বা বিয়োগ করবে।

উদাহরণ ঃ

(1) $145\times 15=145\times(15+5)-145\times 5=2900-725=2175$

(2) $145\times 15=145\times(15-5)+145\times 5=1450+725=2175$

॥ আংশিক গুণন পদ্ধতি ॥

সপ্তম শতাব্দী থেকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। গুণ্য বা গুণকের দুই বা ততোধিক আংশিক বিভাজন দ্বারা এই পদ্ধতিতে গুণন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতি বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। আসলে এটি আধুনিক গণিতের বিচ্ছেদ নিয়ম।

উদাহরণ ঃ

(1) $12\times 135=(4+8)135=4\times 135+8\times 135=1620$

(2) $11\times 144=(6+3+2)144=6\times 144+3\times 144+2\times 144$
$=864+432+288=1584$

॥ কপাট-সন্ধি পদ্ধতি ॥

ব্রহ্মগুপ্ত গুণনের চার প্রকার পদ্ধতির কথা বলেছেন বটে, কিন্তু এই পদ্ধতির কথা বলেননি। অথচ এটি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এমনকি ভারতের বাইরে আরব জগতেও এর জনপ্রিয়তা ছিল। আলখোয়ারিজমি, অল হাসার, অল কলসাদী প্রভৃতি আরব গণিতজ্ঞদের গ্রন্থেও এই পদ্ধতিটি দেখতে

পাওয়া যায়। আরবে এই পদ্ধতিটি 'অল অমল অল হিন্দি', 'তারিখ অল হিন্দি' নামে পরিচিত ছিল। শ্রীধর ও দ্বিতীয় আর্যভটের গ্রন্থে পদ্ধতিটি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীধরাচার্য এই পদ্ধতির সংজ্ঞায় বলেছেন যে, গুণকের নীচে গুণ্য বসিয়ে পরপর প্রত্যক্ষ বা বিপরীত পদ্ধতিতে গুণককে সরিয়ে গুণফল নির্ণয় করার নাম কপাট-সন্ধি পদ্ধতি। শ্রীধরের সঙ্গে শ্রীপতির বেশ মিল আছে। শ্রীপতির সংজ্ঞাটি এরূপ :

বিন্যস্ত গুণ্য গুণকাখ্যরাশে—রধঃ কপাটদ্বয় সন্ধি যুক্ত্যা
উৎসার্য-হন্যাত ক্রমশো হনুলোমৎ, বিলোম মাহো-উত্ততৎস্থমেব।

দ্বিতীয় আর্যভট বলেছেন, গুণ্যের শেষ বা অন্ত্য অঙ্ক দ্বারা পরপর গুণ করার নাম **কপাট-সন্ধি**।

এই পদ্ধতির প্রয়োগে দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়,—(*i*) গুণ্য ও গুণকের আপেক্ষিক অবস্থান ও (ii) গুণ্যের অঙ্ক মুছে সেই স্থানে গুণফলের অঙ্কের সংস্থাপন।

উদাহরণ :

145×15

এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলির (গুণ্য ও গুণকের) অবস্থান নিম্নরূপ :

$$\begin{array}{l} \;\;15 \\ 145 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} \;\;\;\;15 \\ 1475 \end{array}$$

(a) গুণ্যের প্রথম অঙ্ক 5 দ্বারা গুণকের অঙ্কগুলি গুণ করা হলো। সুতরাং $5 \times 5 = 25$; 25-এর 5-কে গুণকের 5-এর নীচে বসানো হলো, আর হাতে 2 থাকল। আবার $5 \times 1 = 5$; এবার 5-এর সঙ্গে হাতের 2 যোগ করলে 7 হয়। অতএব গুণকের 5-কে **'হনন'** করে তার জায়গায় 7 বসল। 5 মুছে 7 বসানো সে-যুগে যে অসুবিধাজনক ছিলনা তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে '→' চিহ্ন দ্বারা গুণ্য ও গুণকের **নতুন অবস্থান** দেখানো হয়েছে।

(b) দ্বিতীয় ধাপে গুণকটিকে **একঘর** বামদিকে সরিয়ে নতুন অবস্থানটি সাজিয়ে নিতে হবে।

$$\begin{array}{l} \;\;15 \\ 1475 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} \;\;\;15 \\ 1675 \end{array}$$

(c) ঠিক আগের মত আবার গুণ করে $4 \times 5 = 20$ হলো ; হাতে থাকল 2।

পুনরায় $4\times1=4$, আর হাতের 2 যোগ করে 6 হলো। এই 6 গুণ্যের 4-কে 'হনন' করে তার স্থান দখল করল।

(d) গুণকটিকে আবার একঘর বামদিকে সরালে নতুন অবস্থান হবে :

$$\begin{array}{l} 1\,5 \qquad\quad 1\,5 \\ 1\,6\,7\,5 \longrightarrow 2\,1\,7\,5 \longrightarrow 2\,1\,7\,5 \end{array}$$

(e) পূর্বের মত $1\times5=5$; $5+6=11$। অতএব 6 মুছে তার জায়গায় 1 বসালে 1 হাতে থাকে। আবার $1\times1=1$, $1+1=2$; সুতরাং এই 2 বামদিকে বসল। এবার গুণ্যকে 'হনন' করে কেবল 2175 লেখা হলো।

অপরিচয়সূত্রে পদ্ধতিটি দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। সামান্য অভ্যাস করলেই সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। পাস্কাল তো তাই বলেছেন, "habit is the second nature." কপাট-সন্ধি প্রণালী থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে 'গুণন' অর্থে কেন প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা 'হনন', 'বধ', 'ক্ষয়' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন।

॥ কপাট-সন্ধি (দ্বিতীয় প্রকার) ॥

এই পদ্ধতি সত্যিকার কপাট-সন্ধি কিনা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। 'গণিত-মঞ্জরী'-র লেখক গণেশ কিন্তু এটিকে কপাট-সন্ধি বলে অভিহিত করেছেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও এই পদ্ধতি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, —ইউরোপেও এই পদ্ধতির প্রচলন দেখা দিয়েছিল। এর উদ্ভব ও প্রচার সম্পর্কে D. E. Smith তাঁর History of Mathematics-এ বলেছেন,—"It was likely developed in India, for it appears in Ganesh's commentary on the Līlāvati and in other Hindu works. From India it seems to have moved northward to China, appearing there in an arithmetic of 1593. It also found its way into Arab and Persian works, where it was the favourite method for many generations."

গণেশ কৃত 'গণিত-মঞ্জরী"-তে পদ্ধতিটির নিম্নরূপ সূত্র পাওয়া যায় :

গুণ্যে যতগুলি অঙ্ক আছে ততগুলি ঘর কাট (উল্লম্বভাবে) এবং গুণকে যতগুলি অঙ্ক আছে ততগুলি ঘর কাট (অনুভূমিকভাবে)। তির্যক রেখা

দ্বারা ঘরগুলি বিভক্ত কর। গুণকের অঙ্কগুলি দ্বারা গুণ্যের প্রতিস্থানের অঙ্ক গুণ করে ফলগুলি তির্যক ঘরে স্থাপন কর। তির্যক-রেখা-পথের উভয় দিক যোগ করলে গুণফল পাওয়া যায়।

উদাহরণ ঃ 125×15

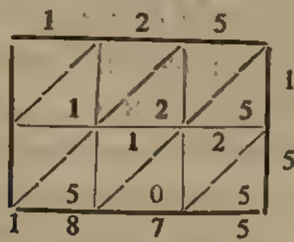

ডানদিক থেকে : প্রথম অঙ্ক$=5$; দ্বিতীয় অঙ্ক$=5+2+0=7$; তৃতীয় অঙ্ক$=2+1+5=8$ এবং অন্ত্য অঙ্ক$=1$। সুতরাং গুণফল$=1875$। গণেশের লীলাবতী ভাষ্য 'বুদ্ধিবিলাসিনী'-তেও সূত্রটি দেখতে পাওয়া যায়।

॥ স্থান-খণ্ড পদ্ধতি ॥

স্থান খণ্ডিত করে অর্থাৎ গুণ্য বা গুণকের অঙ্কের স্থানচ্যুতি দ্বারা গুণন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় বলে এই পদ্ধতির এরকম নাম। ভারতে সপ্তম শতাব্দীর আগে থেকেই এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতিতে গুণ্য ও গুণকের অঙ্কের বিন্যাস নানা রকম হতে পারে। এখানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখানো হলো।

উদাহরণ ঃ 125×15

```
(i)  125                         (ii)  15   15   15
      15                                1    2    5
    ----                              -------------
      15  =1×15                         15        75
       30 =2×15                          3         0
        75=5×15                        -------------
    ----                                18        75
    1875
                                          =1875
(iii) 125        1 2 5
        1          5
      -------------------
                 6 2 5
               1 2 5
               -------
               1 8 7 5
```

॥ ভাগ ॥

প্রাথমিক চার নিয়মের মধ্যে ভাগ-প্রক্রিয়া যে নিঃসন্দেহে জটিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে যোগ-বিয়োগ-গুণ এই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি কিরূপ জটিল ও কঠিন বলে বিবেচিত হতো তার বর্ণনা Smith তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন,—"The operation of division was one of the most difficult operations in the ancient logistica, and even in the 15th century it was commonly looked upon in the commercial training of the Italian boy as a hard matter." ইটালীয় বালকের পক্ষে প্রক্রিয়াটি যত কঠিনই হোক না কেন, ভারতীয় বালকেরা কমপক্ষে সতেরো-আঠারো শ'বছর আগে এটি তেমন কঠিন বলে বিবেচনা করত না। জৈন ধর্মগ্রন্থ **'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র'**-এ সাধারণ গুনিতকের অপসারণ দ্বারা ভাগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও এ-সময় ভারতীয় গণিতজ্ঞদের এটি অজানা ছিল বলে মনে হয় না। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত অবশ্য এ-বিষয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁদের বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের সূত্র থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় প্রাথমিক এই নিয়মটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

ভারতীয় গণিতে ভাগ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ শ্রীধরের পর থেকে প্রায় সব গণিতজ্ঞরাই দিয়েছেন। শ্রীধর তাঁর ত্রিশতিকায় বর্তমান পদ্ধতির ন্যায় সাধারণ গুনিতক অপসারণের পর ভাজ্যকে ভাজক দ্বারা ভাগের উল্লেখ করেছেন; মহাবীর ঠিক একই কথা বলেছেন। তাঁর **'গণিত সার সংগ্রহ'**-এ ভাজ্যের নিম্নে ভাজক বসিয়ে গুনিতক অপসারণ দ্বারা ভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর সূত্রটি :

বিন্যস্য ভাজ্যমানং তস্যাধঃস্থেন ভাগাহারেণ।
সদৃশাপবর্তাবিধিনা ভাগং কৃত্বা ফলং প্রদেৎ ॥

দ্বিতীয় আর্যভট, ভাস্কর ও নারায়ণ পণ্ডিত তো এই পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিবৃত করেছেন। আর ভাগাহার যে গুণনের বিপরীত প্রক্রিয়া এই সত্যটিও তাঁদের অজানা ছিল না।

যোগ-বিয়োগ-গুণের মত প্রাচীন ভারতে ভাগেরও অনেক পারিভাষিক

শব্দ ছিল। ভাগের অর্থে 'ভাগহার', 'ভাজন', 'ছেদন,' 'হরণ', প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা ভাগশেষকে বলেছেন 'লব্ধি'।

গুণনের 'কপাট সন্ধি' পদ্ধতির সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন একটি ভাগহার পদ্ধতি নিয়ে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত এই প্রক্রিয়ার সাথে একটু পরিচয় করে নেওয়া যাক।

উদাহরণ ঃ $1620 \div 12$

a) 1 6 2 0 $\quad$ 1
$\quad$ 1 2 $\quad$ ভাগফল-রেখা

b) বাম থেকে প্রক্রিয়া শুরু : $1 \times 1 = 1$, এবং $1 - 1 = 0$; সুতরাং ভাজ্যের 1 মুছে নতুন ভাজ্য হলো 620। আবার $2 \times 1 = 2$, এবং $6 - 2 = 4$; এবার নতুন ভাজ্যের (620) 6 মুছে অর্থাৎ 'হরণ' করে 4 বসানো হলো।

b)-প্রক্রিয়াটির পর ভাজ্য-ভাজকের নতুন অবস্থান হলো :

$\quad$ 4 2 0
1 2

c) এবার ভাজককে ডানদিকে এক-ঘর সরাতে হবে। তাহলে নতুন অবস্থান হলো :

4 2 0 $\quad$ 1
1 2 $\quad$ ভাগফল রেখা

d) এখন 42-কে 12 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল 3 হয়; এই 3 গেল ভাগফল-রেখায় এবং 42-কে 'হরণ' করে তার জায়গায় ভাগশেষ অর্থাৎ 'লব্ধি' 6 বসল। ফলে পরিবর্তিত ভাজ্য-ভাজক অবস্থান হলো :

$\quad$ 6 0 $\quad$ 13
1 2 $\quad$ ভাগফল-রেখা

e) আগের মতো আবার ভাজককে এক-ঘর ডানদিকে সরিয়ে পরবর্তী নতুন অবস্থান পাওয়া গেল :

6 0 $\quad$ 13
1 2 $\quad$ ভাগফল-রেখা

f) এখন 60-কে 12 দ্বারা ভাগ করলে 5 পাওয়া যায়, এবং তা গেল ভাগফল-রেখায়। আর 60 এর 'হরণ' সম্পূর্ণ হলো বলে ভাজ্য-ভাজক গেল মুছে। অতএব, ভাগফল পাওয়া গেল—135।

পুনরুক্তি হলেও বলতে হয়, আপাত প্রক্রিয়াটি জটিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু হাল্কাভাবে না পড়ে যদি একটু মনোযোগ দিয়ে প্রক্রিয়াটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়, তা হলে তেমন জটিল বলে মনে হবে না। অবশ্য অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও লভ্য প্রাচীন ভারতের গণিতগ্রন্থগুলির কোনটাই খুব প্রাথমিক পর্যায়ের নয়। সে রকম কোন গ্রন্থ বা টীকা-ভাষ্য আবিষ্কৃত হলে প্রক্রিয়াটির আরো সাবলীল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

॥ ভগ্নাংশ ॥

ইতিপূর্বে পাঠক-পাঠিকার ভগ্নাংশের সাথে সামান্য পরিচয় হয়েছে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও গণিতজ্ঞদের আলোচনায় আমরা ভগ্নাংশ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। বহু প্রাচীনকালে ঋগ্বেদ ও তার পরবর্তী যুগ থেকেই ভারতে ভগ্নাংশের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অবশ্য প্রাচীন সভ্য দেশ মিশর, ব্যাবিলন, চীনেও ভগ্নাংশের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতে ঋগ্বেদে ভগ্নাংশ সম্পর্কিত অনেক শব্দ দেখা যায়। যেমন, ত্রিপদ, শফ, কুষ্ঠ, ত্রি-অষ্ট ইত্যাদি; বেদাঙ্গ জ্যোতিষে "কলা দশ সবিংশ নাড়িকা স্যাৎ"-এর মধ্যে $10\frac{1}{20}$ ভগ্নাংশটি বোঝানো হয়েছে। শুল্বসূত্রে ভগ্নাংশের বহুল অস্তিত্ব আছে। এমন কি, জৈন গ্রন্থাদিতেও ভগ্নাংশের বহু উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি'-তে $2\frac{42\frac{1}{2}}{183}$, $4\frac{51\frac{1}{2}}{183}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশগুলি দেখতে পাওয়া যায়। জিনভদ্রগণি প্রাকৃতভাষার মাধ্যমে $241960\frac{40715}{48392}$ ভগ্নাংশটি এভাবে প্রকাশ করেছেন,—

"কল লথ্ক ছগং ইয়াল সহস্‌সা নব সয়া সঠ্‌হিয়া। সুরেষবণেউ অংসং চউ সুন্নগ সত্ত এগ পণ। ছেউ চউ অট্‌ঠ তিগ নব ছগা য বাহে স উত্তরকুসুস।" (প্রা. ভা. গ. চ.)

উপরের সামান্য আলোচনা থেকে বলা যায়, এবং নিঃসন্দেহেই বলা যায় খ্রীষ্টপূর্ব শতকে ভারতে ভগ্নাংশের বেশ ভাল রকমই প্রচলন ছিল। কিন্তু তা থাকলেও, এর গাণিতিক রূপটি তখন তেমন স্পষ্ট ছিল না। ভগ্নাংশের প্রকৃত গাণিতিক রূপ ধরা পড়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ আর্যভটের পর থেকে। ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্কর ইত্যাদি গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন, শ্রেণীবিভাগ করেছেন, প্রক্রিয়ার বর্ণনাও করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর চার ধরনের

ভগ্নাংশের কথা বললেও শ্রীধর ও মহাবীর কিন্তু ছ'ধরনের ভগ্নাংশের কথা বলেছেন। এই প্রকারগুলি হলো : (a) ভাগ, (b) প্রভাগ, (c) ভাগাপবাহ, (d) ভাগানুবন্ধ, (e) ভাগমাতৃ ও (f) ভাগ-ভাগ।

এবার ছ'টি বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

॥ ভাগ ॥

বস্তুত এই শ্রেণীর ভগ্নাংশের সঙ্গে আমরা সবাই খুব ছোটবেলা থেকেই পরিচিত। এমন কি এর প্রক্রিয়াটিও আমাদের সবার জানা। আধুনিক গণিতের ভাষায় এই ভগ্নাংশটির রূপ এরকম :

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} \pm \frac{e}{f} \pm \ldots\ldots$$

এই ভগ্নাংশিক প্রক্রিয়াটি দু-রকমভাবে করা যেতে পারে : (a) সমহরে পরিণত করে, আর (b) প্রথম লব × দ্বিতীয় হর ± দ্বিতীয় লব × প্রথম হর এ-ভাবে।

॥ প্রভাগ ॥

দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশিক রাশির মধ্যে 'এর' থাকলে, তাকে 'প্রভাগ' শ্রেণীর ভগ্নাংশ বলে। এটির যে এখনো প্রচলন আছে, তা আর না বললেও চলে। এই শ্রেণীর ভগ্নাংশের গাণিতিক রূপ এরকম :

$$\frac{a}{b} \text{ এর } \frac{c}{d} \text{ এর } \frac{e}{f}$$

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে লবে লবে এবং হরে হরে গুণ করতে হয়। ভাস্কর এই প্রক্রিয়ার সূত্র দিয়েছেন :—

লবালবঘ্নশ্চ হরাহরঘ্না ভাগপ্রভাগেষু সবর্ণনং স্যাৎ।

॥ ভাগাপবাহ ॥

কোন অখণ্ড সংখ্যা থেকে খণ্ডসংখ্যা বিয়োগ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে 'ভাগাপবাহ'। আধুনিক গণিতের ভাষায় বলা যায় $\left(a-\frac{b}{c}\right)$ হচ্ছে ভাগাপবাহের

গাণিতিক রূপ। এই ভগ্নাংশটি নিয়ে ব্রহ্মগুপ্তের পর প্রায় সব গণিতজ্ঞই আলোচনা করেছেন।

॥ ভাগানুবন্ধ ॥

শ্রীধরাচার্য থেকে শুরু করে প্রায় সব গণিতজ্ঞই এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য ভাস্করের আলোচনা অধিকতর বিস্তারিত বলে মনে হয়। 'ভাগানুবন্ধ' দু'রকমের হতে পারে,—

(1) $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}$ এর $\frac{a}{b}+\frac{e}{f}$ এর $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right.$ এর $\left.\frac{a}{b}\right)+\ldots\ldots$

(2) $\left(a+\frac{b}{c}\right)$

এর প্রক্রিয়াটি ভাস্করের ভাষায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ এরূপ :

"যে কোন পূর্ণসংখ্যা হরের দ্বারা গুণ করিলে লবটি যোগ চিহ্ন বা বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত হয়, যদি অংশগুলি তাহার সহিত যোগ বা বিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহার কোন অংশ দ্বারা যদি রাশিটি বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে ভগ্নাংশের যোগে বা বিয়োগে নিম্নস্থিত হরকে হরের দ্বারা গুণ করিতে হয় এবং লবকে বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হরের দ্বারা গুণ করিতে হয়।" (অঙ্কভাবনা, প্রথম সংখ্যা ১৯৭৫)

॥ ভাগমাতৃ ও ভাগ-ভাগ ॥

এই দুটি শ্রেণীর ভগ্নাংশের বিষয়ে শ্রীধর ও মহাবীরের আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ-ভাগের গাণিতিক রূপ : $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}$

॥ ভগ্নাংশের নিয়ম সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আর্যভটের গ্রন্থে ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ-গুণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া না গেলেও ব্রহ্মগুপ্তের পর এ-বিষয়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা আলোচনা করতে ভোলেননি। কেবল প্রাথমিক চার নিয়মই নয়, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল নিয়েও আলোচনা আছে। যোগ-বিয়োগ সম্পর্কিত নিয়মটি ভাস্করের ভাষায়,

যোগোঽন্তরং তুল্যহরাংশকানাং কল্প্যহরোরূপমহাররাশেঃ ॥

"অর্থাৎ ভগ্নাংশে যোগ অথবা বিয়োগে সমান হর গ্রহণ করতে হয়। যার

ভাগফল নেই সেরূপ রাশির এক বলিয়া হর কল্পনা করতে হয়।" (প্র. ভা. গ. চ.)

ভগ্নাংশের গুণন সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য প্রায় একই রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। উভয়েই বলেছেন যে, দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশিক রাশির লবগুলির গুণফলকে হরগুলির গুণফল দিয়ে ভাগ করতে হবে। মনে করা যাক, $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$ ও $\frac{e}{f}$ এই ভগ্নাংশিক রাশিগুলি দেওয়া আছে। তা হলে এদের গুণফল হবে,—

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}\times\frac{e}{f}=\frac{a\times c\times e}{b\times d\times f}$$

ত্রৈরাশিক বিষয় আলোচনা কালে আর্যভট ভগ্নাংশিক ভাগের কথা বলেছেন। আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রমুখ গণিতজ্ঞরা। ভাস্করের সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ :

ছেদং লবঞ্চ পরিবর্ত্ত্য হরস্য শেষঃ কার্য্যোঽথ ভাগহরেণ গুণনাবিধিশ্চ।

ভাবানুবাদ : লবের সঙ্গে হরের পরিবর্তন করে গুণের নিয়ম মেনে গুণ করতে হবে।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

$$\frac{p}{q}\div\frac{r}{s}=\frac{p}{q}\times\frac{s}{r}=\frac{ps}{qr}$$

এখানে r-লবকে হরে, s-হরকে লবে পরিণত করে গুণ করা হলো।

ভগ্নাংশের বর্গ, ঘন, বর্গমূল ও ঘনমূল বার করার আধুনিক পাটীগাণিতিক পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন গণিতজ্ঞদের প্রায় কোন পার্থক্য নাই। বর্গ ও ঘন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাস্করের সূত্র :

বর্গে কৃতৌ ঘনাবিধৌ তুঘনৌ বিধেয়ৌ হারাংশয়োরথ পদে চ পদপ্রসিদ্ধ্যৈ।

ভাবানুবাদ : বর্গ বা ঘন বার করতে হলে লব ও হর উভয়ের বর্গ বা ঘন নির্ণয় করতে হবে। বর্গমূল বার করতে হলে লব ও হর উভয়ের বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে।

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

"Hindu Mathematics starts where Alexandrian Mathematics left off"

—L. Hogben

॥ বর্গ ॥

ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই 'বর্গ'-এর গাণিতিক রূপের চেয়ে এর জ্যামিতিক রূপের সহিত অধিক পরিচিত ছিলেন। শুল্বসূত্রে এমন কয়েকটি বেদী-নির্মাণের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা থেকে এরূপ ধারণা স্বাভাবিকভাবেই করা যায়। আর্যভট বর্গ নির্ণয়ের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেননি সত্য, কিন্তু পদ্ধতিটি তাঁর অজানা ছিল বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে তাঁর সূত্রটি হচ্ছে :

বর্গঃ সমচতুরশ্রঃ ফলং চ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ।

অর্থাৎ সমকর্ণসহ সমবাহু চতুর্ভুজ ও উহার ক্ষেত্রফলকে বর্গ বলে। এবং দুটি সমরাশির গুণফলকেও বর্গ বলে।

নিঃসন্দেহে সূত্রটির প্রথমাংশে বর্গের জ্যামিতিক রূপ ও দ্বিতীয়াংশে গাণিতিক রূপের কথা বলা হয়েছে। আবার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার পরমেশ্বরের মতে দ্বিতীয়াংশে বর্গ-নির্ণয়ের তাৎপর্য নিহিত আছে। ব্রহ্মগুপ্ত, পৃথূদকস্বামী, শ্রীধর, মহাবীর, শ্রীপতি প্রমুখ গণিতজ্ঞরা বর্গের সংজ্ঞায় যে খুব বেশী কিছু নতুনত্ব দেখাতে পেরেছেন, তা মনে হয় না। আচার্য আর্যভটের চেয়ে এঁরা বর্গ-নির্ণয় পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়া আর বেশী অগ্রসর হতে পারেননি।

ব্রহ্মগুপ্ত বর্গ করার একটি সূত্র দিয়েছেন তাঁর ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে। সূত্রটির প্রথমাংশে আমরা অতি পরিচিত বীজগাণিতিক সূত্র,—$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ পাই। তাঁর সংশ্লিষ্ট সূত্রটি হচ্ছে :

রাশেরূনং দ্বিগুণং বহুতর গুণ যুনকৃতিযুতং বর্গঃ।

ভাবানুবাদ : যে রাশির বর্গ করতে হবে তাকে দুই বা তার চেয়ে বেশী

অংশে খণ্ড কর। প্রথম রাশির বর্গ কর ; প্রথম রাশির দ্বিগুণের সঙ্গে দ্বিতীয় রাশি গুণ কর ; তারপর শেষের রাশির বর্গ করে সব রাশিগুলি যোগ কর।

উপরোক্ত শ্লোকটির দ্বিতীয়াংশে আর একটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। তাঁর সূত্রটি :

রাশেরিষ্টযুতোনাদ্বধঃ কৃতিরেষ্টকৃতিযুক্তঃ।

ভাবানুবাদ : প্রদত্ত রাশির সঙ্গে '**ইষ্ট**' (অনুমিত) রাশি যোগ এবং বিয়োগ করার পর উভয় ফলকে গুণ করে '**ইষ্ট**' রাশির বর্গ যোগ কর।

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

$n^2=(n+a)(n-a)+a^2$, **এখানে** $a=$**ইষ্ট বা অনুমিত রাশি।**

দুটি উদাহরণ দিয়ে এই সূত্রটির প্রয়োগ দেখানো যাক :

(1) $15^2=(15+5)(15-5)+5^2=20\times 10+25=225$

এখানে অনুমিত রাশি$=5$

(2) $45^2=(45+5)(45-5)+5^2=50\times 40+25=2025$

বলা বাহুল্য, এটি পাটীগাণিতিক পদ্ধতি নয়,—বীজগাণিতিক পদ্ধতি। ভাস্করও বর্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং একটু বিশদভাবেই করেছেন। কিন্তু তিনিও ব্রহ্মগুপ্তের পথই অনুসরণ করেছেন। 'অঙ্ক ভাবনা' প্রবন্ধ থেকে তাঁর এই সম্পর্কিত আলোচনা ও অনুবাদ দেওয়া হলো :

"সমদ্বিঘাতঃ কৃতিরুচ্যতেঽত্র স্থাপ্যোঽন্ত্য বর্গো দ্বিগুণান্ত্য নিঘ্নাঃ। স্বস্বোপরিষ্টাচ্চ তথা পরেঽঙ্কাস্ত্যক্তান্ত্য মুৎসার্য্য পুনশ্চ রাশি॥ খণ্ডদ্বয়স্য স্যাভিহতির্দ্বিনিঘ্নী তৎ খণ্ডবর্গৈক্যযুতা কৃতির্বা। ইষ্টোনযুগ্রাশি বধঃ কৃতিঃ স্যাদিষ্টস্য বর্গেন সমন্বিতো বা।"

অর্থাৎ "সমান দুইটি সংখ্যার গুণফলকে বর্গ বলে। শেষ রাশি উপরে রাখিতে হইবে, অবশিষ্ট রাশি দ্বিগুণ করিতে হইবে এবং শেষ রাশির দ্বারা গুণ করিয়া উপরে রাখিতে হইবে, পরে পুনরায় শেষ রাশি ভিন্ন অন্য রাশি রাখিতে হইবে। অথবা দুইটি অংশের গুণফল দ্বিগুণ করিয়া অংশগুলির বর্গের সহিত যোগ করিলে বর্গ হইবে। রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি যোগ করিতে হইবে এবং রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি বিয়োগ করিতে হইবে। এইবার সেই দুইটির গুণ করিতে হইবে এবং তাহার সহিত ধরিয়া লওয়া রাশির বর্গ যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই রাশির বর্গ পাওয়া যাইবে।"

প্রথম ভাস্কর 'বর্গ' অথবা 'বর্গ-নির্ণয়' অর্থে 'বর্গ', 'করণী', 'কৃতি', 'বর্গন' এবং 'যাবকরণ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'করণী', 'বর্গন' এবং 'যাবকরণ' শব্দের প্রচলন বেশী দেখা যায় না। প্রাচীন জৈন গণিতে অজ্ঞাত রাশি 'x' বোঝাতে 'যাবৎ-তাবৎ'-এর ব্যবহার দেখা যায়; আবার অন্যত্র 'যা' অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যা' হয়তো 'যাবৎ-তাবৎ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং 'ব'-এর উৎপত্তি 'বর্গ' থেকে হয়ে থাকবে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে বর্গের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে 'কৃতি' শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বর্গ-নির্ণয় পদ্ধতি নিয়ে ব্রহ্মগুপ্তের পর থেকে যে অনেক গণিতজ্ঞই আলোচনা করেছেন, তার আভাস আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু সে আলোচনায় বীজগাণিতিক পদ্ধতির প্রভাবই দেখা যায়। এখানে বিখ্যাত জৈন গণিতজ্ঞ মহাবীরাচার্যের পদ্ধতিটি উদাহরণস্বরূপ দেখানো হলো। বলা বাহুল্য, এটি সম্পূর্ণ পাটীগাণিতিক পদ্ধতি। তাঁর নিয়মটির সারমর্ম নিম্নরূপ:

যে-সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করতে হবে তার অন্ত্য অঙ্কটির বর্গ করে ঠিক সেই অঙ্কটির উপরে লিখতে হবে, অন্ত্য-অঙ্কটি দ্বিগুণিত করে অন্যান্য অঙ্কগুলি গুণ করতে হবে। অবশিষ্ট অঙ্কগুলি ডান দিকে পর পর এক-ঘর সরিয়ে পূর্বের মত গুণন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বর্গ-সংখ্যা পাওয়া যাবে।

অন্ত্য বা প্রথম অর্থাৎ বাম-ডান উভয় দিক থেকেই বর্গ-নির্ণয় শুরু করা যেতে পারে। এখানে অন্ত্য-অঙ্ক থেকে শুরু করে পদ্ধতিটি বিশ্লেষিত হলো।

উদাহরণ: বর্গ নির্ণয় কর 135

(a) এখানে প্রদত্ত সংখ্যা 135-এর অন্ত্য-সংখ্যা $=1$; সুতরাং $1^2=1$; এই 1-কে বর্গ-সংখ্যা 1-এর উপর লেখা হলো,—

$$\begin{array}{ccc} 1 & & \\ 1 & 3 & 5 \end{array}$$

(b) অন্ত্য-অঙ্ক 1-এর দ্বিগুণ $=2\times1=2$; এই 2-কে 5-এর নীচে লিখে 1-কে মুছে দেওয়া হলো। তা হলে নতুন অবস্থান হলো,—

$$\begin{array}{ccc} 1 & & \\ & 3 & 5 \\ & & 2 \end{array}$$

(c) এবার 2 দ্বারা 35-কে গুণ করে $(35\times2=70)$ গুণফলের অঙ্কগুলি নিজ

নিজ স্থানের উপরে লেখা হলো অর্থাৎ একক-স্থানে 0 এবং দশক-স্থানে 7 ; তা, হলে নতুন অবস্থান,—

1 7 0
3 5

এখানেই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ হলো বলে মনে করা যেতে পারে। পরের সোপান-গুলি কেবলমাত্র পূর্ববর্তী সোপানসমূহের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

(d) 35-কে এক-ঘর ডানদিকে সরিয়ে অবস্থান হলো,—

1 7 0
3 5

(e) এখানে অন্ত্য-অঙ্ক 3 ; সুতরাং $3^২=9$; 9 যথাস্থানে স্থাপিত হলে 3 মুছে গেল। এবং নতুন অবস্থান,—

1 7 9
5

আবার, অন্ত্য-অঙ্কের দ্বিগুণ$=3\times2=6$; পরের অঙ্ক 5-এর নীচে লিখে নতুন অবস্থান,—

1 7 9
5
6

এখন, $5\times6=30$; 5-এর উপরে 0 এবং 9-এর সঙ্গে 3 যুক্ত হয়ে 1820 হলো। এখানে দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলো এবং তৃতীয় শুরু বলতে হবে। পূর্বের ন্যায় 5-কে ডানদিকে এক-ঘর সরিয়ে নতুন অবস্থান পাওয়া গেল,—

1 8 2 0
5

আবার, সেই পুনরাবৃত্তি। $5^২=25$; 25-এর 5 গেল 5-এর মাথায়, আর 2 যুক্ত হলো 0-এর সঙ্গে। ফলে $\boxed{\begin{array}{r}18225\\5\end{array}}$ পাওয়া গেল।

এখন আর বর্গ-সংখ্যার (প্রদত্ত সংখ্যা) কোন অঙ্ক অবশিষ্ট নাই। সুতরাং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলো এবং নীচের 5 মুছে নির্ণেয় বর্গ সংখ্যা$=18225$ পাওয়া গেল।

প্রথম ভাস্কর সে-যুগে প্রচলিত এই পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তিনি

বলেন এখানে 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যার বর্গ ব্যবহৃত হয়, অথচ কিরূপে এই বর্গ-সংখ্যা পাওয়া যাবে তার কোন উত্তর প্রাচীন গণিতজ্ঞরা দেননি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, ভাস্কর, নারায়ণ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ সূত্রটির স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। আরো পরবর্তীকালে 'যুক্তিভাষা' গ্রন্থে এই সূত্রটির জ্যামিতিক প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়:

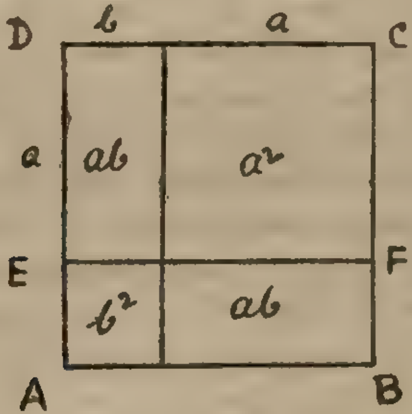

চিত্র—30

চিত্র $ABCD$ $(a+b)$-বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র। বাহুগুলির সমান্তরাল সরলরেখা অঙ্কন করে দুটি বর্গক্ষেত্র a^2 ও b^2 এবং দুটি আয়তক্ষেত্র পাওয়া গেল। আয়তক্ষেত্রের বাহু দুটি a এবং b। সুতরাং এই জ্যামিতিক চিত্র থেকেই প্রমাণিত হয় $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$; এবং এই পদ্ধতিতেই নিয়ম-নীতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$ সূত্রটিও প্রমাণ করা যায়।

॥ বর্গমূল ॥

ভারতে বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি অতি প্রাচীন। 'মূল' শব্দটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর জৈনগ্রন্থ 'অনুযোগদ্বারসূত্র'-এ দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে 'মূল' শব্দের অর্থ উদ্ভিদ বা গাছের শিকড়+ মূলের অন্য অর্থ কারণ, ভিত্তি ইত্যাদি। বর্গমূলের প্রকৃত অর্থ বর্গ-কারণ, উৎস বা বর্গক্ষেত্রের বাহু। ব্রহ্মগুপ্ত বর্গমূলের

সংজ্ঞায় বলেছেন 'কৃতি' যা থেকে বর্গ উৎপন্ন হয়। লক্ষ্যণীয়, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্যে এই পদ্ধতির আবির্ভাব হয়নি। চতুর্থ শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার থিওনের গ্রন্থে একটি পদ্ধতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তা ভারতীয় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে ভারতীয় পদ্ধতিতে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করেন, তা একান্তই পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে এস. এন. সেন A Concise History of Science in India গ্রন্থে গণিত অধ্যায়ে বলেছেন,—"In Europe, these modern methods do not appear before Catanio (A. D. 1546). Cataldi (A. D. 1613), the author of the Trattato, was one of the first writers to use similar methods in their entirety. In the fourth century A. D., Theon of Alexandria, the noted connentator of Ptolemy's Almagest, gave a method for approximate extraction of square roots of sexagesimal fraction, but it was approximate, algebraical and different from the Hindu method."

প্রাচীন ভারতীয় যে গণিতগ্রন্থে বর্গমূল নির্ণয়ের সূত্র চোখে পড়ে, তা হচ্ছে আর্যভটের আর্যভটীয়। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

> **ভাগং হরেদবর্গান্নিত্যং দ্বিগুণেন বর্গমূলেন।**
> **বর্গাদ্বর্গে শুদ্ধে লব্ধং স্থানান্তরে মূলম্॥**

ভাবানুবাদ : যুগ্ম-স্থানে সর্বদা মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে ; অযুগ্ম-স্থানে সর্বদা বিয়োগ করে ভাগফল পূর্ববর্তী মূল-রেখায় বসিয়ে বর্গমূল নির্ণীত হবে।

ভাষ্যকার পরমেশ্বর এই পদ্ধতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রদত্ত সংখ্যাকে বর্গ ও অবর্গ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে বর্গমূল নির্ণয় কিভাবে করতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণত অযুগ্ম ও যুগ্ম-স্থান উল্লম্ব ও অনুভূমিক রেখা দ্বারা চিহ্নিত করে বর্গমূল নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ : বর্গমূল নির্ণয় কর :

63504

(a) নিকটতম বর্গ-অঙ্ক বিয়োগ $\overset{|}{6}\ \bar{3}\ \overset{|}{5}\ \bar{0}\ \overset{|}{4}$ (মূল=2
$(2^2=4)$ 4

(b) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ 4) 2 3 (5—মূল্যের পরবর্তী অঙ্ক
(2×2=4)   2 0

(c) ভাগফলের বর্গ দ্বারা বিয়োগ 3 5
(5^2=25)   2 5

(d) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ 50) 1 0 0 (2=মূলের পরবর্তী অঙ্ক
(25×2=50)   1 0 0

(e) ভাগফলের বর্গ দ্বারা বিয়োগ 4
2^2=4   4

×

∴ নির্ণেয় বর্গমূল=252

প্রদীপ কুমার মজুমদার তাঁর 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' গ্রন্থে ভাস্করের পদ্ধতিতে বর্গমূল নির্ণয় করার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। আমাদের মনে হয়, ডঃ মজুমদার ভাস্করের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে উদাহরণটি স্পষ্ট করলে ভাল করতেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁর ব্যাখ্যাত পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ আধুনিক বীজগাণিতিক পদ্ধতি বলে মনে হয়, এবং পূর্বসূরীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা যেতে পারে।

॥ ঘন ও ঘনমূল ॥

ভারতীয় গণিতে ঘন ও ঘনমূল কত প্রাচীন সে-সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে আর্যভট-এর গ্রন্থে এর সূত্র আছে, এবং পরবর্তী প্রায় সব গণিতজ্ঞই এ-বিষয়ে সূত্র ও উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে ঘন-মূল নির্ণয়ের সূত্র ও পদ্ধতি নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আর্যভটীয়-গ্রন্থে ঘনমূল সূত্রের ন্যায় ঘন-নির্ণয়ের সূত্রও পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রটির প্রথম দিকে পাটীগাণিতিক স্বরূপ ও শেষ দিকে জ্যামিতিক স্বরূপের আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

সদৃশত্রয়বর্গো ঘনস্তথা দ্বাদশোঽশ্রিঃ স্যাৎ।

অর্থাৎ সমান তিনটি রাশির ক্রমিক গুণফল এবং দ্বাদশ প্রান্তিকী ঘনবস্তুকে ঘন বলে।

ব্রহ্মগুপ্ত আধুনিক বীজগণিতের ঘন-নির্ণয়ের সূত্রটির কথা বলেছেন। তাঁর সূত্র :

স্থাপ্যোঽন্ত্যঘনোঽন্ত্যকৃতিস্ত্রিগুণোত্তর সংগুণা চা তত্প্রথমাৎ।
উত্তরকৃতিরন্ত্যগুণা ত্রিগুণাচোত্তর ঘনশ্চ ঘন ॥

ভাবানুবাদ : দুটি রাশির সমষ্টির ঘন-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিকে যথাক্রমে অন্ত্যসংজ্ঞক ও উত্তরসংজ্ঞক ধরতে হবে। অন্ত্যের ঘন, অন্ত্যের বর্গের সঙ্গে উত্তর গুণ এবং তাকে তিন গুণ করে যোগ কর; আবার অন্ত্যের সঙ্গে উত্তরের বর্গ গুণ কর, এবং তাকে তিনগুণ করে যোগ কর। শেষে উত্তরের ঘনও যোগ কর।

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় উপরের সূত্রটি প্রকাশ করলে দাঁড়ায়,—
$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

ভাস্কর আর একটি সূত্রে $(a+b)^3=a^3+b^3+3ab\,(a+b)$-এর কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক সূত্রটি :

"খণ্ডাভ্যাং বাহতোরাশিস্ত্রিঘ্নঃ খণ্ড ঘনৈক্যযুক্।"

অর্থাৎ "(অথবা) সেই সংখ্যার তিন গুণকে ইহার দুইটি খণ্ডের দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ঐ খণ্ডগুলির ঘন বাহির করিয়া যোগ করিতে হইবে।"

(প্রা. ভা. গ. চ.)

প্রথম ভাস্কর আগের মত ভারতীয় গণিতজ্ঞদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, তাঁরা 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যার ঘন কিরূপে নির্ণয় করতে হবে তার কোন উত্তর দেননি।

মহাবীরাচার্য অবশ্য ঘন-নির্ণয়ের আর একটি বীজগাণিতিক সূত্র দিয়েছেন :
$x^3=x(x+y)(x-y)+y^2(x-y)+y^3$

॥ ত্রৈরাশিক ॥

(অনুপাত ও সমানুপাত)

আধুনিক অনুপাত ও সমানুপাতের অঙ্ক প্রাচীন ভারতীয় গণিতে **'ত্রৈরাশিক'** নামে পরিচিত ছিল। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে এই নিয়মের ব্যবহার দেখা যায়; আর্যভট থেকে শুরু করে সব গণিতজ্ঞই এ-বিষয়ে সূত্র দিয়ে আলোচনা করেছেন। জটিল সমানুপাতের অঙ্কগুলি **পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক, নবমরাশিক ও একাদশ-**

রাশিক হিসাবে চিহ্নিত হতো। ব্রহ্মগুপ্তের পর জটিল সমানুপাতের অঙ্কগুলির প্রাচুর্য দেখা যায়।

দেশ-বিদেশের সব গণিতজ্ঞই ত্রৈরাশিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কারণ, এই নিয়মে বাস্তবে প্রযোজ্য নানা প্রকার অঙ্কের সমাধান খুব সহজে করা যায়। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা মনে করতেন গণিতে অপারদর্শীও এই নিয়মে সহজে সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। বরাহমিহির লিখেছেন, সূর্য যদি বছরে একবার ঘোরে, তা হলে একখণ্ড চকখড়ির সাহায্যে একজন অজ্ঞব্যক্তিও নির্দিষ্ট দিনে সূর্য কতবার ঘুরবে অতি সহজে এই নিয়মে নির্ণয় করতে পারবে।

ইউরোপে এই নিয়মটি **স্বর্ণ নিয়ম (Golden Rule)** নামে আখ্যাত হয়েছে। পাটীগণিতে এই নিয়মের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সব দেশের গণিতজ্ঞরাই সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ রবার্ট রেকর্ড (Robert Recorde) বলেন, "the rule of proportions which for his excellency is called the Golden Rule" (Smith). অপর এক ইংরেজ গণিতজ্ঞ বলেন, "and indeed it might be so termed; for as gold transcends all other Metals, so doth this Rule all others in Arithmetick" (Smith). প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ভাস্কর বলেন,—

অস্তি ত্রৈরাশিকং পাটী বীজং চ বিমলা মতিঃ।
কিমজ্ঞাতং সুবুদ্ধিনামতো মন্দার্থমুচ্যতে ॥
বর্গং বর্গপদং ঘনং ঘনপদং সঙ্খ্যাজ্য যদ্‌ গণ্যতে।
তৎ ত্রৈরাশিকমেব ভেদ বহুলং নান্যৎ ততো বিদ্যতে ॥

অনুবাদ ঃ "ত্রৈরাশিকই পাটীগণিত, বিমল মতিই বীজগণিত। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কি অজ্ঞাত আছে? সেইজন্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের বোধের নিমিত্ত বলা হইতেছে। বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল ব্যতীত যাহা কিছু গণিত হয়, সকলই নানা ভেদ বিশিষ্ট ত্রৈরাশিক ভিন্ন কিছুই নহে।" (রাধাবল্লভ দেবশর্মা কৃত অনুবাদ)

ভাস্করের মতে ত্রৈরাশিকই পাটীগণিতের সার,—নির্যাস। এই পদ্ধতিতে তিনটি রাশির ব্যবহার হয় বলে একে ত্রৈরাশিক বলা হয়। এই তিনটি রাশি হচ্ছে প্রমাণ, ফল ও ইচ্ছা। প্রাচীন ভারতের গণিতজ্ঞরা প্রায় সবাই একই ধরনের সূত্র দিয়েছেন এ-সম্পর্কে। আচার্য আর্যভটের সূত্র নিম্নরূপ :

ত্রৈরাশিকফলরাশিং তমথেচ্ছারাশিনা হতং কৃত্বা।
লব্ধং প্রমাণভজিতং তস্মাদিচ্ছাফলমিদং স্যাৎ ॥

অর্থাৎ ত্রৈরাশিক নিয়মে 'ফল' ও 'ইচ্ছা'-র 'গুণফলকে 'প্রমাণ' দ্বারা ভাগ করলে 'ইচ্ছাফল' পাওয়া যায়।

উদাহরণ : যদি A সংখ্যক পুস্তকের মূল্য P টাকা হয়, তা হলে R-সংখ্যক পুস্তকের মূল্য কত ?

এখানে, $A=$'প্রমাণ', $P=$'ফল' ও $R=$'ইচ্ছা'

সুতরাং ইচ্ছাফল$=\dfrac{P\times R}{A}$ টাকা।

ত্রৈরাশিক বিষয়ে আর একটিমাত্র সূত্রের উল্লেখ করা যাক। এই সূত্রটির স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি যে প্রায় আর্যভটেরই অনুসরণ করেছেন তা দেখাবার জন্যেই সূত্রটি উদ্ধৃত হলো :

ত্রৈরাশিকে প্রমাণং ফলমিচ্ছাত্বস্ত্যয়ো সদৃশরাশি ।
ইচ্ছাফলেন গুণিতা প্রমাণভক্তা ফলং ভবতি ।।

অনুবাদ : ত্রৈরাশিকে প্রমাণ ও ইচ্ছা সদৃশ ; এদুটি ও ইচ্ছা-সম্পর্কিত ফল ভিন্ন প্রকার। ফলকে ইচ্ছা দিয়ে গুণ করে প্রমাণ দিয়ে ভাগ করলে ইচ্ছা-সম্পর্কিত ফল লাভ হয়।

'যৌগিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক ইত্যাদি নিয়মের প্রয়োগ হয়। ভাস্কর ব্যস্ত-ত্রৈরাশিকের প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি ত্রৈরাশিক নিয়মের বিপরীত প্রক্রিয়া। খুব সম্ভব ব্যস্ত-ত্রৈরাশিকের কথা সর্বপ্রথম ব্রহ্মগুপ্ত বলেন। তাঁর সূত্র :

ব্যস্ত ত্রৈরাশিকফলমিচ্ছাভক্তঃ প্রমাণফলঘাতঃ ।
ত্রৈরাশিকাদিষু ফলং বিষমেষেকাদশান্তেষু ।।

অনুবাদ : "প্রমাণ এবং ইচ্ছার মধ্যে যেটি ভিন্ন জাতীয় তাকে প্রমাণ দিয়ে গুণ করে ইচ্ছা দিয়ে ভাগ দিলে ব্যস্ত ত্রৈরাশিক পাওয়া যায়।" (প্রা. ভা. গ. চ.)

পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক ইত্যাদি অর্থাৎ বহুরাশিক সম্বন্ধে আর্যভটের গ্রন্থে সুস্পষ্ট কোন সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রধান আর্যভট-অনুরাগী প্রথম ভাস্কর তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে আর্যভট কৃত ত্রৈরাশিক সূত্রের মধ্যেই বহুরাশিকের নিয়মের আভাস আছে, আর্যভট পৃথকভাবে দিতে বাহুল্যবোধ করেছেন। কারণ, পঞ্চরাশিক দুটি ত্রৈরাশিক দিয়ে, সপ্তরাশিক তিনটি ত্রৈরাশিক দিয়ে সমাধান করা যায়। অবশ্য ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্কর, মহাবীর প্রমুখ গণিতজ্ঞরা

এদের সূত্রাদি দিয়েছেন, এবং ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাষ্যকার পৃথুদকস্বামী উদাহরণ নিয়ে আলোচনাও করেছেন।

তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যদি তিনমাসে একশ' টাকার সুদ দশ টাকা হয়, তা হলে পাঁচ মাসে ষাট টাকার সুদ কত?

সমাধান ঃ

$$\begin{array}{r|l} 3 & 5 \\ 100 & 60 \\ 10 & \end{array} \quad \text{তারপর} \quad \begin{array}{r|l} 3 & 5 \\ 100 & 60 \\ & 10 \end{array}$$

$\therefore$ সুদ $= \frac{5 \times 60 \times 10}{3 \times 100} = 10$ টাকা। *

বিশ্বগণিতে ভারতীয়দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান ত্রৈরাশিক ইত্যাদি। এই নিয়মের ঔজ্জ্বল্যে বিশ্বের অন্যান্য গণিতজ্ঞরা এমন অভিভূত হয়েছিলেন যে, মূল নামটি পর্যন্ত বিদেশী ভাষায় প্রায় অবিকৃত আছে। Smith তাঁর গণিতের ইতিহাসে এর উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন,—"The Mercantile Rule of Three seems to have originated among the Hindus……the name is also found among the Arab and medieval Latin writers."

* প্রা. ভা. গ. চ.—প্রদীপকুমার মজুমদার।

ষোড়শ অধ্যায়

"Both the form and the spirit of arithmetic and Algebra of modern times are essentially Indian and not Grecian."

—F. Cajori

বীজগণিত

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন যুগের গণিতজ্ঞদের জীবন ও অবদান বিষয়ক আলোচনায় বীজগাণিতিক ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবুও এই অধ্যায়ে বীজগণিত সম্পর্কে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের ধারণার একটি মোটামুটি সুশৃঙ্খল আলোচনার অবতারণা করা হলো। আমাদের বিশ্বাস, অনিবার্যভাবে পূর্ব-আলোচিত তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও পাঠক-পাঠিকা এ-সম্পর্কে একত্র সমাবেশিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।

গণিতের বিভিন্ন শাখা ও নানা বিষয়ের মত বীজগণিতের উদ্ভবকাল সম্পর্কেও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে গুপ্তযুগে যে এই বিষয়টির অস্তিত্ব পূর্ণ মাত্রায় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নাই। ভারতে সম্ভবত বীজগণিতের অস্তিত্ব জ্যামিতির মধ্যে নিহিত ছিল। অর্থাৎ নানা জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই বীজগণিতের উদ্ভব হয়ে থাকবে। এ-বিষয়ে ডঃ টি. এ. সরস্বতীর মন্তব্য : "......The basis and inspiration for the whole of Indian mathematics is geometry." শুল্বসূত্রের আলোচনায় দেখা গেছে, ভারতীয় গণিতজ্ঞরা জ্যামিতির সাংখ্যিক তথা পাটীগাণিতিক দিকটির প্রতি সর্বাধিক আকৃষ্ট ছিলেন, আর নানা প্রকার জ্যামিতিক বেদী ও অগ্নি-নির্মাণে সমীকরণ সমাধান তো অপরিহার্য ছিল। প্রদত্ত একটি বাহু দ্বারা কোন বর্গক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র অঙ্কনে $ax=c^2$ ধরনের সমীকরণ সমাধান জানতেই হতো। মহাবেদী ও শ্যেন-চিতি নির্মাণে সমীকরণ সমাধানই ছিল একমাত্র হাতিয়ার। মহাবেদী নির্মাণে নিম্নরূপ সমীকরণ সমাধান করতে হতো :

$$36x \times \frac{(24x+30x)}{2} = 36 \times \frac{(24+30)}{2} + m$$

বা, $972x^2=972+m$

বা, $x=\sqrt{1+\frac{m}{972}}$

আবার, শ্যেন-চিতি নির্মাণে নীচের সমীকরণটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় :

$$2x\times 2x+2\left\{x+\left(x+\frac{x}{5}\right)\right\}+x\times\left(x+\frac{x}{10}\right)=7\tfrac{1}{2}+m$$

উল্লেখযোগ্য যে, এ দু-ধরণের সমীকরণের সমাধান **শতপথ ব্রাহ্মণ**-এ দেখা যায়।

এ-সব তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ঋগ্বেদীয় যুগের পূর্বেই ভারতে বীজগণিতের উদ্ভব হয়েছিল; পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দু-হাজার অব্দ এর উৎপত্তিকাল।

গণিতে বীজগণিতের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গণিতজ্ঞদের মধ্যে দ্বিমত নাই। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন; তাই পাটীগণিত ও বীজগণিতের পৃথক পৃথক স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন, বিদ্বৎ সমাজে তিনিই গণিতাচার্য আখ্যা পান যিনি চূর্ণন, শূন্য, ধনাত্মক, ঋণাত্মক, অজ্ঞাতরাশি, মধ্যপদের অপনয়ন, একঘাত সমীকরণ, বর্গ-প্রকৃতি বিষয়ে পারদর্শ। স্বয়ং ব্রহ্মগুপ্ত **বর্গ-প্রকৃতি** বা **দ্বিঘাত অনির্দেশ্য সমীকরণ**-এর বীজ নির্ণয়ে অসামান্য পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই সম্পর্কিত তাঁর শ্লোকটি :

প্রায়েণ যতঃ প্রশ্নাঃ কুট্টাকারাদৃতে ন শক্যন্তে।
জ্ঞাতুং বক্ষ্যামি ততঃ কুট্টাকারং সহ প্রশ্নৈঃ ॥
কুট্টকখর্ণধনাব্যক্তমধ্যহরণৈকবর্ণভাবিত কৈঃ।
আচার্যস্তন্ত্রবিদাং জ্ঞাতৈর্বর্গপ্রকৃত্যা চ ॥

বীজগণিতের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভাস্করের ধারণা আরো স্পষ্ট। পাটীগণিত ও বীজগণিতের পার্থক্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি :

দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং
ব্যক্তং পাটীগণিতং অব্যক্তং বীজগণিতং।

অর্থাৎ গণিত দু-প্রকার,—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত গণিতই বীজগণিত।

জ্যোতিবিদ ও জ্যোতিষীদের পার্থক্য বিষয়ে ভাস্কর একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

দ্বিবিধগণিত মুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং
প্রপঠিতুমধিকারী সোঽন্যথা নামধারী ॥

অনুবাদ : "ব্যক্তগণিত (পাটীগণিত) ও অব্যক্তগণিত (বীজগণিত) নামক দ্বিবিধ গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং শব্দশাস্ত্রে (ব্যাকরণে) পঠীয়ান ব্যক্তিই বহুভেদ বিশিষ্ট এই জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী, অন্যথা কেবল জ্যোতিষী নামধারী হইয়া থাকে।"

ভাস্কর অন্যত্র বলেছেন, 'বিমলমতি'-ই বীজগণিত। 'বিমলমতি' বলতে ভাস্কর খুব সম্ভব বিষয়টি উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বোধগম্য—এই ইঙ্গিত করেছেন। আর অব্যক্ত বলতে তিনি চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে অজ্ঞাতরাশি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বলে মনে হয়।

ভারতে বীজগণিতের সূচনা প্রায় চার হাজার বছর আগে হলেও, আর্যভট-ব্রহ্মগুপ্তের পর এই শাখার বিকাশ ও সমৃদ্ধি অষ্টম শতাব্দীতে হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর আগে 'বীজগণিত' শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাষ্যকার চতুর্বেদাচার্য পৃথুদকস্বামী এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন বলে জানা যায়।

॥ চিহ্ন ও সঙ্কেত ॥

উপযুক্ত চিহ্ন ও সঙ্কেত ব্যতিরেকে গণিতের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। এডওয়ার্ড কাসনারের একটি মন্তব্য এ-বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। "Mathematics is the Science in which one uses easy words for hard ideas." আধুনিক গণিতে বর্ণমালার বর্ণ ও বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন সাদরে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ভারতেও গণিতজ্ঞরা সঙ্কেত ও চিহ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সংস্কৃত শব্দের প্রথম অক্ষর ব্যবহার করেছেন। যেমন,—যোগ বা যুক্ত বোঝাতে 'যু', বিয়োগ বোঝাতে '+' ইত্যাদি। বিয়োগ ও ভাগের সঙ্কেতে একটা শৃঙ্খলা দেখা যায় ; কিন্তু অন্যত্র কখনো কখনো পূর্ণশব্দ বা কিছুই ব্যবহার করা হতো না। অঙ্কের প্রকৃতি ও প্রসঙ্গ থেকে প্রক্রিয়াটি বুঝে নিতে হতো।* বকশালী পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

* এ-বিষয়ে লেখকের 'গণিতের ললিত পাঠ' পুস্তকে 'প্রতীক চিহ্নের উৎপত্তির কাহিনী' দ্রষ্টব্য।

(1) $\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\ \begin{matrix}5\\1\end{matrix}$ যু$=\frac{x}{1}+\frac{5}{1}$

(2) $\left|\begin{matrix}0 & 5 & \text{যু} & \text{যু} & 0\\1 & 1 & & & 1\end{matrix}\right|$ মূ $\begin{matrix}0 & 7+\text{যু} & 0\\1 & 1 & 1\end{matrix}\Big|$

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায়, $\sqrt{x+5}=m$ এবং $\sqrt{x-7}=n$

(3) 12৭̇

$=12-7=5$

[এখানে বিন্দু (.) দ্বারা বিয়োগ বোঝানো হয়েছে।]

(4) $\left\|\begin{matrix}3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 10 & \text{গু}\\1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \end{matrix}\right\|=3\times3\times3\times3\times3\times3\times3\times10$

[এখানে 'গু' দ্বারা গুণ বোঝানো হয়েছে।]

(5) $\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\left\|\begin{matrix}1 & 3\\1 & 2\end{matrix}\right\|\begin{matrix}2 & 5\\1 & 2+\end{matrix}\left\|\begin{matrix}3 & \text{গু} & 7\\1 & & 2+\end{matrix}\right\|\begin{matrix}4 & \text{গু} & 9\\1 & & 2+\end{matrix}\Big\|$

উপরের বিশেষ সঙ্কেত ও চিহ্নাদি আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

$$x\left(1+\frac{3}{2}\right)+\left\{2x\left(1+\frac{3}{2}\right)-\frac{5x}{2}\right\}+\left\{3x\left(1+\frac{3}{2}\right)-\frac{7x}{2}\right\}+\left\{4x\left(1+\frac{3}{2}\right)-\frac{9x}{2}\right\}$$

এখানে পাণ্ডুলিপির '+'=বিয়োগ ও 'গু'=গুণ, এই সঙ্কেত ও চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

॥ অজ্ঞাত রাশি ॥

অজ্ঞাত রাশি অর্থে জৈন গণিতে 'যাবৎ-তাবৎ' ব্যবহৃত হতো; পাণ্ডুলিপির যুগে অজ্ঞাতরাশি অর্থে '0', 'যদৃচ্ছা', 'বাঞ্ছা', 'কামিক' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আর্যভট 'গুলিকা' শব্দটি অজ্ঞাতরাশির অর্থে গণিতপাদের ত্রিংশতম শ্লোকে ব্যবহার করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর শ্লোকটি :

> গুলিকান্তরেণ বিভজেদ্ দ্বয়োঃ পুরুষয়োস্তু রূপকবিশেষম্।
> লব্ধং গুলিকামূল্যং যদ্যর্থকৃতং ভবতি তুল্যম্ ॥

প্রথম ভাস্কর বলেছেন, 'গুলিকা' ও 'যাবৎ-তাবৎ' সমার্থক। অবশ্য আর্যভট

অজ্ঞাতরাশি বোঝানোর জন্য 'বর্ণ' (রঙ) ব্যবহারও করেছেন। ব্রহ্মগুপ্তও 'বর্ণ' ব্যবহার করেছেন, আর 'অব্যক্ত' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর 'বর্ণ' রঙ না অন্য কিছু বোঝা কঠিন। বর্ণমালার বর্ণের কথা বলাও সম্ভব বলে মনে হয়। যা হোক, প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত রাশি বোঝানোর জন্য আরো অনেক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন,—কালিকা, নীলক, পাটলক, লোহিতক, হরিতক, শ্বেতক, চিত্রক, কপিলক, পিঙ্গলক, ধূম্রক, পীতক, শবলক, শ্যামলক, মেচক ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই বর্ণদ্যোতক। এ-সম্পর্কে শ্রীপতি সিদ্ধান্ত শেখর গ্রন্থে বলেছেন,—

> যাবত্তাবৎ কালকো নীলকাদ্যা
> বর্ণাঃ কল্প্যা নূনমব্যক্তমানে।
> তেষাং তুল্যা তাবতঃ শোট্টগমাহি
> সবর্ণঃ সাম্ভাবিতং চাপমানম্॥

মমার্থ হচ্ছে, "অব্যক্ত রাশির মান,—যাবৎ-তাবৎ, কালক, নীলক প্রভৃতি কল্পনা করিবে।... ..." (প্রা. ভা. গ. চ.)

শ্রীধরের ত্রিশতিকা-য় একটি সমান্তর শ্রেণীতে এরূপ সঙ্কেত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়:

| আদি 20 | উ 0 | গচ্ছঃ 7 | গণিতম্ 245 |

এখানে, আদি=প্রথম পদ, গচ্ছঃ=পদসংখ্যা, গণিতম্—সমষ্টি এবং উ—উত্তর। কিন্তু যেখানে একাধিক অজ্ঞাতরাশি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে 'প্র', 'দ্বি', 'তৃ' যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

॥ সহগ ॥

'সহগ'-র বিশেষ উল্লেখ প্রাচীন কোন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মগুপ্ত মাত্র একবার 'সহগ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এবং মনে হয় তাতে তিনি সংখ্যা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি বহুবার 'গুণক' বা 'গুণকার' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,—"গুণক গুণাদিষ্ট যুত.. ", "গুণকে প্রথমং" ইত্যাদি। পৃথুদকস্বামী 'অঙ্ক' ও ভাস্কর 'রূপ' অর্থে 'সহগ' বোঝাতে চেয়েছেন।

॥ ঘাত ॥

একথা সত্য ঘাত বা শক্তি-র উল্লেখ জৈনগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ভদ্রবাহুর **উত্তরাধ্যয়ন সূত্র** গ্রন্থে দ্বিতীয় ঘাতকে **বর্গ**, তৃতীয় ঘাতকে **ঘন**, চতুর্থ ঘাতকে **বর্গ-বর্গ** ইত্যাদি বলা হয়েছে। এমন কি, **অনুযোগদ্বার সূত্র** গ্রন্থেও পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশের ঘাতের উল্লেখ আছে। কিন্তু ওইসব গ্রন্থে এর বৈজ্ঞানিক নামকরণের অভাব দেখা যায়। এ-বিষয়ে যিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মগুপ্ত। -'গত' প্রত্যয় যুক্ত করে নামকরণে নতুনত্ব আনা তাঁর গাণিতিক প্রতিভার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন,—**পঞ্চঘাত**-কে তিনি বলেছেন **'পঞ্চগত'**; এরূপ অন্যত্রও-**'গত'** প্রত্যয় যুক্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় গণিতে বর্গের সঙ্কেতে **'ব'** এবং ঘন-র সঙ্কেতে **'ঘ'** দেখা যায়। চতুর্থ ঘাত বোঝাতে **'ব-ব'**, ষষ্ঠ ঘাতে **'ঘ-ব'** দেখা যায়। দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল বোঝাতে **'ভা'**,—**'ভাবিত'**-র সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহারও অপ্রতুল নয়। বর্গমূল বোঝাতে ভাস্কর করণীর সংক্ষিপ্তরূপ **'ক'** ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

$$\text{ক } 9 \text{ ক } 450 \text{ ক } 75 \text{ ক } 54 = \sqrt{9}+\sqrt{450}+\sqrt{75}+\sqrt{54}$$

আবার, বর্গমূল অর্থে **'মূ'** ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন,—

$$\left|\begin{array}{ccc} 11 & \text{মূ}\,5 & \text{মূ}\,4 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right| = \sqrt{11+5} = 4$$

॥ ধ্রুবক রাশি ॥

ধ্রুবক বা ধ্রুবক রাশি বোঝাতে একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে **'দৃশ্য'** ও পরবর্তীকালে 'দৃশ্য'-এর পরিবর্তে **'রূপ'** শব্দটি প্রাধান্য পায়। যেমন,—

$$\text{যা ব } 0 \text{ যা } 10 \text{ রূ } 8 = x^2.0 + x.10 - 8$$

॥ চিহ্নের সূত্র ॥

বীজগাণিতিক চিহ্ন সম্পর্কে প্রাচীন কোন গ্রন্থে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের চিহ্ন সম্পর্কিত সূত্র থেকে অনুমিত হয় তাঁর পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন, দুটি ধনরাশির সমষ্টি ধনরাশি, দুটি ঋণরাশির সমষ্টি ঋণরাশি, এবং ধনরাশি ও ঋণরাশির সমষ্টি উভয়ের অন্তর। আচার্য

ব্রহ্মগুপ্তের উত্তরসূরীরা সন্দেহাতীতচিত্তে এই সূত্র মেনে নিয়েছেন। মহাবীর, ভাস্কর, শ্রীপতি, নারায়ণ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা নতুন কিছু সংযোজনের অবকাশ পাননি। এ প্রসঙ্গে শ্রীপতির সিদ্ধান্তশেখর থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক ঃ

ঐক্যং যুতৌ স্যাৎ স্বয়োঃ স্বয়োশ্চ
ধনর্ণয়োরন্তরমেব যোগঃ।
সংশোধ্যমানং স্বমৃণং তথর্ণং
ধনং ভবেদুক্তবদত্র যোগঃ॥

অর্থাৎ দুটি ধনরাশির বা ঋণরাশির যোগ হয়। একটি ধন অপরটি ঋণ হলে তাদের অন্তর হবে যোগ। বিযোজ্য ধন হলে বিয়োগের জায়গায় ঋণ হবে, আর এরূপ ঋণরাশি ধন হবে। তদনন্তর এদের যোগ হবে।

আধুনিক গাণিতিক চিহ্ন ও সঙ্কেতে সূত্রগুলি :

(i) $2a+a=3a$ (ধনরাশি+ধনরাশি=ধনরাশি)

(ii) $-2a-a=-3a$ (ঋণরাশি+ঋণরাশি=ঋণরাশি)

(iii) $2a-a=a$ (ধনরাশি+ঋণরাশি=অন্তর)

॥ বিয়োগ ॥

বীজগণিতে বিয়োগ করার সময় একটি রাশির চিহ্ন পরিবর্তন করা হয়। ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীপতি, ভাস্কর, নারায়ণ প্রমুখ এই একই নিয়ম ব্যবহার করেছেন। মহাবীর গণিত-সার-সংগ্রহ-এ বলেছেন, ধনরাশিকে বিয়োগ করলে ঋণরাশি হয়, আর ঋণরাশির ক্ষেত্রে ধনরাশি হয়। ভাস্করও একই কথা বলেছেন। কেবল তিনি বলেছেন বিয়োগ-প্রক্রিয়ার অতঃপর পূর্বের ন্যায় যোগ করতে হবে। এখানে আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের নিয়মটি উদ্ধৃত হলো :

ধনয়োর্ধনমৃণমৃণয়োর্ধনর্ণয়োরন্তরং সমৈক্যংখম্।
ঋণমৈক্যং চ ধনমৃণধন শূন্যয়োঃ শূন্যয়োঃ শূন্যম্॥

অনুবাদ : বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র বিয়োগ করলে ধনাত্মক, ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক বিয়োগ করলে ধনাত্মক, আবার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বিয়োগ করলে বিপরীত অর্থাৎ ঋণাত্মকটি ধনাত্মক ও ধনাত্মকটি ঋণাত্মক হবে। ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক বিয়োগ অথবা ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক বিয়োগ দিতে গেলে যোগ করতে হয়। (প্রা. ভা. গ. চ.)

বর্তমান গাণিতিক চিহ্ন ও সঙ্কেতে সূত্রগুলি :

a ও b দুটি ধনরাশি হলে,

প্রথম সূত্র : $\begin{array}{c} a \\ \underline{+b} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} a \\ \underline{-b} \end{array}$

আবার, a ধনরাশি ও b ঋণরাশি হলে,

দ্বিতীয় সূত্র : $\begin{array}{c} a \\ \underline{-b} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} a \\ \underline{+b} \end{array}$

॥ গুণন ॥

গুণনের নিয়ম সম্পর্কে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, মহাবীর, শ্রীপতি প্রমুখ গণিতজ্ঞ একই কথা বলেছেন। ভাস্কর তাঁর সিদ্ধান্ত-শিরোমণি-র বীজগণিত অংশে বলেছেন, দুটি ধনসংখ্যা বা ঋণসংখ্যার গুণফল ধনসংখ্যা এবং ধনসংখ্যা ও ঋণসংখ্যার গুণফল ঋণসংখ্যা। গণিতের ভাষায়,—

(i) $+a \times +b = ab$, (ধনসংখ্যা × ধনসংখ্যা = ধনসংখ্যা)

(ii) $-a \times -b = +ab$, (ঋণসংখ্যা × ঋণসংখ্যা = ধনসংখ্যা)

(iii) $+a \times -b = -ab$, (ধনসংখ্যা × ঋণসংখ্যা = ঋণসংখ্যা)

(iv) $-a \times +b = -ab$, (ঋণসংখ্যা × ধনসংখ্যা = ঋণসংখ্যা)

গুণনের নিয়ম সম্পর্কে আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের মতটি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন দুটি সম-অজ্ঞাত রাশির গুণফল হবে বর্গ, তিন বা ততোধিক সম-অজ্ঞাত রাশির গুণফল হবে সহগ ও ঘাত অনুসারে। অসম-অজ্ঞাতরাশির গুণফল হবে 'ভাবিত' অর্থাৎ পরস্পরের গুণনের দ্বারা। ভাস্কর ও নারায়ণের গ্রন্থে একই নিয়ম দেখা যায়। সূত্রের আকারে প্রকাশ করলে,—

(i) $a \times a = a^2$

(iii) $a \times 2b \times 3c = 6abc$

॥ ভাগ ॥

ভাগ সম্পর্কে আলোচনা ব্রহ্মগুপ্তের সময় থেকেই দেখা যায়। তিনি ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তে এ-বিষয়ে সূত্রও দিয়েছেন। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

ধনভক্তং ধনমৃণহৃতমৃণং ধনং ভবতি খং খভক্তং খম্।

ভক্তমৃণেন ধনমৃণং ধনেন হৃতমৃণমৃণং ভবতি ॥

এই সূত্রের আধুনিক রূপ হচ্ছে :

(1) $a \div b = \frac{a}{b}$; (2) $-a \div -b = \frac{a}{b}$; (3) $-a \div b = \frac{-a}{b}$;

(4) $a \div -b = \frac{-a}{b}$

আচার্য ভাস্করও ভাগের নিয়ম সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন, অজ্ঞাতরাশি যাই হোক না কেন ভাজককে পৃথক পৃথকভাবে গুণ করে এবং প্রতি ক্ষেত্রে ভাজ্য থেকে বিয়োগ করে যখন কোন অবশিষ্ট থাকবে না, তখন বিভিন্ন সোপানের ভাগফলই প্রকৃত ভাগফল নির্ণয় করবে।

a=ভাজ্য, b=ভাজক ও Q ভাগফল হলে যদি q_1, q_2, q_3 ইত্যাদি বিভিন্ন সোপানের ভাগফল হয়, তা হলে,—

$$Q = q_1 + q_2 + q_3 + \ldots\ldots$$

ভারতীয় গণিতে আটটি প্রাথমিক নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু বীজগণিতে ঘন ও ঘনমূল প্রাথমিক নিয়মের মধ্যে পড়ে না বলে এখানে ছ'টি প্রাথমিক নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু ভাস্কর ঘন ও ঘনমূল বীজগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বেশীর ভাগ ভারতীয় গণিতজ্ঞ ঘন ও ঘনমূল প্রাথমিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেননি সম্ভবত একটি কারণে যে, বর্গ ও ঘন-র মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই এবং এদের মধ্যে সম্পর্কটিও সুস্পষ্ট। ব্রহ্মগুপ্তের পর প্রায় সব গণিতজ্ঞই $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ বা $a^3 + b^3 + 3ab\,(a+b)$ সূত্রটি পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মধ্যযুগের 'ক্রিয়াকর্মকারী' গ্রন্থে এই সূত্রের যে জ্যামিতিক প্রমাণ দেখা যায় তাতে এর পাটীগাণিতিক স্বরূপই প্রকটিত হয়েছে।

উদঘাতন ও **অবঘাতন** সম্পর্কে প্রায় সব ভারতীয় গণিতজ্ঞই আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্তের মতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশির বর্গ করা যায় ; মহাবীর বলেন, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক রাশির বর্গ হবে ধনাত্মক। আর এদের বর্গমূলও ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হবে। কিন্তু ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল হবে না।

এ প্রসঙ্গে $x^2+1=0$ এই সমীকরণের বীজ নির্ণয় নিয়ে যে সব বিতর্ক বহুদিন ধরে গণিতে চলেছিল, আর কিভাবে কাল্পনিক রাশি i-এর উৎপত্তি হলো তা খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু মহাবীর সেই নবম-দশম শতাব্দীতে তাত্ত্বিকভাবে **ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল** স্বীকার করেছিলেন, একথা ভাবলে তাঁর গাণিতিক প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হতে হয়।

ভাস্কর বীজগাণিতিক যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে একই 'জাতি' অর্থাৎ সদৃশ রাশির ক্ষেত্রে এটা সম্ভব, আর ভিন্ন 'জাতি'-র ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তাঁর সংশ্লিষ্ট সূত্র :

যোগোঽন্তরং তেষু সমানজাত্যোর্বিভিন্ন জাত্যোশ্চ পৃথক্ স্থিতিশ্চ।

আধুনিক গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

(i) $a+2a+3a=6a$

(ii) $a+2b+3a+b+c=4a+3b+c$

॥ সমীকরণ ॥

বীজগণিত শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য সমীকরণ গঠন। ত্রৈরাশিক যেমন পাটী-গণিতের সার, সমীকরণ তেমনি বীজগণিতের সার। যে জাতি প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখায় বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল, তারা যে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সমীকরণের সহজ পথটি আবিষ্কার করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। জৈন গণিতে বীজগাণিতিক সমীকরণের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর স্থানাঙ্গ সূত্র-এ সরল, দ্বিঘাত, ত্রিঘাত ও চতুর্ঘাত সমীকরণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না, খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন কিনা। কিন্তু আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের সময় থেকে যে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং শ্রেণীকরণ সুসম্পন্ন করেছিলেন, এ-সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। সমীকরণ অর্থে **'সম-করণ', 'সমী-করণ', 'সদৃশী-করণ'** শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

বকশালী পাণ্ডুলিপি ও আর্যভটীয় গ্রন্থে সমীকরণ দেখা যায়। আর্যভট সমাধান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলেও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলেননি। এ-বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্ত অনেকখানি অগ্রসর বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি অজ্ঞাতরাশির মাত্রার উপর নির্ভর করে শ্রেণী বিভাগ করেননি ; অপরপক্ষে, অজ্ঞাতরাশির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সমীকরণের তিনটি বিভাগ করেছেন :

(i) **একবর্ণ সমীকরণ (Equation with one unknown)**

(ii) **অনেকবর্ণ সমীকরণ (Equation with several unknowns)**

(iii) **ভাবিত (Equation involving products of unknowns)**

একবর্ণ সমীকরণ আবার দু-ভাগে বিভক্ত : **রৈখিক সমীকরণ (Linear Equation)** ও **অব্যক্তবর্গ সমীকরণ (Quadratic equations)**।

ব্রহ্মগুপ্তের পর থেকে ভাস্কর পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালে তেমন উজ্জ্বল ও মহা-প্রতিভাধর গণিতজ্ঞের আবির্ভাব না হলেও, গণিতচর্চা যে অব্যাহত ছিল তাতে সন্দেহ নাই। এই পাঁচশ' বছরে এমন অনেক জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা সমীকরণ নিয়ে পূর্বাচার্যদের পথে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন। পৃথুদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্ত বর্ণিত তিন প্রকার সমীকরণ ছাড়াও আর এক প্রকারের নাম সংযোজিত করেছেন,—"**মধ্যমাহরণ**" (Equation with one, two or more unknowns in their second and higher powers.)

ভারতীয় গণিতে সমীকরণের সংজ্ঞা ও সমাধান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার আগে প্রাচীনকালে সমীকরণ কিভাবে লেখা হতো, সে-সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাক।

॥ সমীকরণ-লেখন ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে সমীকরণ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে 'ন্যাস' নামে অভিহিত হতো। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে রাশিগুলিকে প্রাথমিক চার নিয়মের সাহায্যে পর পর লিখে একই পঙ্‌ক্তিতে সমান-চিহ্ন (—) না দিয়ে চরম পদটি লেখা হতো। নীচের সমীকরণটি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

$$\begin{array}{c|c c|c c|c|c|l} 0 & 2 & 1 & 3 & 3 & 12 & 4 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \text{দৃশ্য } 300 \\ \hline \end{array}$$

আধুনিক চিহ্ন ও সঙ্কেতে,—

$$x+2x+3\times 3x+12\times 4x=300$$

গণিতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমীকরণ লেখার পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। বকশালী পাণ্ডুলিপির রূপটি রক্ষিত হয়নি, সমান-চিহ্নের (=) আবির্ভাব ঘটেনি বটে, কিন্তু সমীকরণের দুটি পক্ষকে পরস্পরের নীচে সংস্থাপিত করার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে সদৃশপদগুলি পরস্পরের নীচে সংস্থাপিত হয়ে শূন্য-চিহ্ন (0) দ্বারা কোন পদের অনুপস্থিতি সূচিত করল। সপ্তম শতাব্দী থেকে এই পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। পৃথুদকস্বামীকৃত একটি সমীকরণ দিয়ে এই পদ্ধতিটি দেখানো হলো :

যা ব 0 যা 10 রূ 8

যা ব 1 যা 0 রূ 1

[এখানে যা = অজ্ঞাতরাশি, ব = বর্গ, রূ = ধ্রুবক]

আধুনিক গাণিতিক সঙ্কেত-চিহ্নে সমীকরণটি,—

$$x^2.0+x.10-8=x^2.1^2+x.0+1$$

বা, $10x-8=x^2+1$

বা, $x^2-10x+9=0$

এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর বৈশিষ্টাগুলি লক্ষ্য করার মত। সমীকরণটিতে অজ্ঞাতরাশির পদগুলি অধঃক্রমে সজ্জিত হয়েছে; সহগগুলি অজ্ঞাতরাশির পরে বসেছে এবং চরম বা ধ্রুবক রাশিটি শেষে স্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Smith তাঁর History of Mathematics গ্রন্থে বলেছেন,—"The Hindu method was better than the Chinese, and in this respect was the best that has ever been suggested.......such a plan shows at a glance the similar terms one above another, and permits of easy transposition."

॥ একবর্ণ সমীকরণ ॥

একমাত্রার সরল সমীকরণকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়: (a) একটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ, (b) দুটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ এবং (c) তিন বা ততোধিক অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ।

একটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ সমাধানের অনেক রকম পদ্ধতির কথা প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। শুল্বযুগে এ-ধরনের সমীকরণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। জৈন গণিতে যাবৎ-তাবৎ-এর কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সমস্যাকারে এরকম সমীকরণ দেখা যায়। বকশালী পাণ্ডুলিপিতেও সমস্যাকারে এ-ধরনের সমীকরণ আছে। একটি উদাহরণ:

চার ব্যক্তির মধ্যে 132 টাকা এরূপভাবে ভাগ করে দাও যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির দ্বিগুণ, তৃতীয় দ্বিতীয়ের তিনগুণ ও চতুর্থ তৃতীয়ের চারগুণ পায়।

সমীকরণের আকারে প্রকাশ করলে,—

$x+2x+6x+24x=132$

বা, $33x=132$

বা, $x=4$

সুতরাং, প্রথম ব্যক্তি 4 টাকা, দ্বিতীয় ব্যক্তি 8 টাকা, তৃতীয় ব্যক্তি 24 টাকা এবং চতুর্থ ব্যক্তি 96 টাকা পায়।

$ax+c=bx+d$-এই ধরনের সমীকরণ নিয়ে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, ভাস্কর প্রমুখ আলোচনা করেছেন। আর্যভটের এই সম্পর্কিত সূত্র 'গুলিকান্তরেণ' ইত্যাদি আমরা উদ্ধৃত করেছি। তাঁর সূত্রটির আধুনিক গাণিতিক রূপ :

$ax+c=bx+d$

বা, $x=\dfrac{d-c}{a-b}$

শ্রীপতির সিদ্ধান্ত শেখর গ্রন্থে পক্ষান্তর করার নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পদ্ধতি :

অব্যক্ত বিশ্লেষহুতে প্রতীপ-
রূপান্তরেঽব্যক্তমিতী ভবেতাম্।
স্যাদ্বা যুতোনহৃতভক্ত মিচ্ছে-
ক্তদাঽন্যপক্ষে বিহিতে তথৈব।

অনুবাদ ঃ "একবর্ণ সমীকরণ স্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের বর্ণকে যোগ বা বিয়োগ করিয়া একপক্ষে আনয়ন করিবে এবং রূপরাশিকে ঐভাবে অন্যপক্ষে লইয়া যাইবে ; অতঃপর অব্যক্তের রূপরাশি দ্বারা ব্যক্ত রাশিকে ভাগ করিলে অব্যক্ত মান পাওয়া যাইবে।"

॥ ইষ্টকর্ম-পদ্ধতি ॥

একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি সমন্বিত একঘাত সমীকরণের একটি নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারক হচ্ছেন ভাস্কর। ভাস্কর এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'ইষ্টকর্ম'। লীলাবতী-তে সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। একটি ঐচ্ছিক সংখ্যা ধরে এ-ধরনের সমীকরণ সমাধান করাই রীতি।

ভাস্কর নিয়মটি বিবৃত করে বলেছেন, একটি ঐচ্ছিক সংখ্যা ধরে সমস্যার

সর্তানুসারে চার নিয়মের সাহায্যে যে ফল পাওয়া যাবে, জ্ঞাতরাশি ও ঐচ্ছিক রাশির গুণফলকে পূর্বফল দ্বারা ভাগ করলে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে।

এই পদ্ধতিতে সমাধান করতে গিয়ে ভাস্কর দুটি উদাহরণ দিয়েছেন,—একটি সম্পূর্ণ গণিত-ভাবনাযুক্ত এবং অপরটি কাব্যরসমণ্ডিত একটি মনোরম সমস্যা। শেষের উদাহরণটি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার আছে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে যে-সব সরস কাব্যগুণমণ্ডিত অঙ্ক দেখা যায়, তা থেকে মনে হয়, সে-যুগে গণিতচর্চা কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ মানুষের মধ্যে গণিতের সুদূর প্রসারী ফল প্রলম্বিত করার জন্য গণিতজ্ঞরা চিন্তা করতেন, এবং গণিতকে রমণীয় করে তোলার জন্য সার্থক প্রয়াস চালাতেন। গণিতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ক্যাজরির মন্তব্যটি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য: **"The pleasing poetic garb in which all arithmetical problems are clothed is due to the Indian practice of writing all school books in verse, and especially to the fact that those problems, propounded as puzzles, were a favourite social amusement."** কেবলমাত্র পাটীগাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রেই নয়, বীজগাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রেও উক্তিটি সমভাবে প্রযোজ্য।

উদাহরণ ঃ "একটি হস্তীর দল হইতে ইহার তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেক বন মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। ইহার সপ্তমাংশের সহিত একের ষষ্ঠাংশ নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। ইহার অষ্টমাংশের সহিত পদ্মবনে খেলা করিতে গিয়াছিল। দলপতিকে তিনটি হস্তিনীর সহিত দেখা গেল। সেই দলে কতগুলি হস্তী ছিল?" (অঙ্কভাবনা)*

হস্তী-সংখ্যা $=x$ ধরলে নিম্নরূপ বীজগাণিতিক সমীকরণ পাওয়া যায় :

$x=\frac{1}{6}x+\frac{1}{5}x+\frac{1}{8}x+\frac{1}{4}x+6$*

বা, $x-\dfrac{57x}{60}=6$

বা, $\dfrac{x}{20}=6$

বা, $x=120$

* প্রদীপ কুমার মজুমদারের 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' থেকে নেওয়া হয়েছে পৃঃ—212।

॥ আনুমানিক পদ্ধতি ॥

(Regula Falsi)

অজ্ঞাত রাশির বিভিন্ন মান অনুমান করে $ax+b=0$—এ-ধরনের সমীকরণ সমাধান অতি প্রাচীন। শুল্বসূত্র-এ এই পদ্ধতির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। আরবদের মাধ্যমে যেমন দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন, শূন্য এবং গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা বিষয় পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়, এই পদ্ধতিও ঠিক তেমনিভাবে ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল। অনেক পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞ এই পদ্ধতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বস্তুত এখানে False শব্দটির আভিধানিক অর্থ অভিপ্রেত নয় বলে তাঁরা তার ব্যাখ্যাও করতে থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ গণিতজ্ঞ রবার্ট রেকর্ড তাঁর Ground of Artes গ্রন্থে কবিতার মাধ্যমে এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও প্রশংসা করেন :

"Suche falsehode is so good a grounde,
That truth by it will soone be founde."*

সত্যি কথা বলতে কি, গণিতে False বলে কিছু থাকতে পারে না। সত্যের অনুসন্ধান করাই গণিতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। False শব্দ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে বলে বেকার (Humphrey Baker) নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেন :

"The Rule of falsehoode is so named not for that it teacheth anye deceyte or falsehoode, but that by fayne numbers taken at all adventures, it teacheth to finde out the true number that is demaunded, and this of all the vulgar Rules which are in practice is ye most excellence."**

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখানো যাক। মনে করা যাক, $3x-9=0$—এই সমীকরণটি সমাধান করতে হবে। এখন, অজ্ঞাত-রাশি x-এর দুটি আনুমানিক মান g_1 ও g_2 ধরা হলো ; তার ফলে $3x-9$, এই রাশির দুটি ফল f_1 ও f_2 পাওয়া গেলে,

$$x=\frac{f_1g_2-f_2g_1}{f_1-f_2} \text{ হবে।}$$

এখন ধরা যাক, $g_1=1$ ও $g_2=2$

---

* History of Mathematics (Vol-II)—D, E. Smith, Page-439

** History of Mathematics (Vol-II)—D. E. Smith, Page-441

তা হলে, $f_1=3.1-9=3-9=-6$

$$f_2=3.2-9=6-9=-3$$

$$\therefore\ x=\frac{-6\times2-1\times(-3)}{-6-(-3)}=\frac{-12+3}{-6+3}=\frac{-9}{-3}=3$$

॥ দুইটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ ॥

এ-ধরনের সমীকরণ প্রাচীন ভারতীয় গণিতে 'সংক্রমণ' বলে অভিহিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'সংক্রমণ' দ্বারা প্রায় সব গণিতজ্ঞই সংক্রামিত হয়েছেন। যেমন,—ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রমুখ। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ছাড়া আর সব গণিতজ্ঞই বিষয়টি পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ভাষ্যকার গঙ্গাধর 'সংক্রমণ' অর্থে দুটি অজ্ঞাত রাশির সমষ্টি ও অন্তর থেকে উদ্ভূত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর মতে $x+y=a$ এবং $x-y=b$ ধরনের সমস্যাই সংক্রমণের আলোচ্য বিষয়। ব্রহ্মগুপ্ত এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক একটি পদ্ধতির বিষয় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যোগ ও বিয়োগ দ্বারা প্রতিক্ষেত্রে 2 দ্বারা ভাগ করলেই অজ্ঞাত রাশিদ্বয়ের মান পাওয়া যায়। তাঁর সূত্রটি :

যোগোঽন্তর যুক্তহীনো দ্বিহৃতঃ সংক্রমণন্তরবিভক্তং বা।

মহাবীর এ-বিষয়ে যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা একটু অন্য ধরনের। তাঁর সমীকরণ দুটি ও সমাধান নিম্নরূপ :

$$ax+by=s$$

$$bx+ay=t$$

$$x=\frac{as-bt}{a^2-b^2},\ y=\frac{at-bs}{a^2-b^2}$$

॥ তিনটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ ॥

এ-ধরনের সমীকরণের দৃষ্টান্তের ইতিহাসও খুব প্রাচীন। অনুমিত হয়, অন্তত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকেই ভারতীয় গণিতজ্ঞদের চিন্তা-ভাবনায় এরকম সমস্যা স্থান পেয়েছিল। বকশালী পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতিদের লেখায় এ-ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

সমস্যা : তিন-ব্যক্তি কিছু পরিমাণ সম্পদের মালিক। প্রথম ও দ্বিতীয়ের

একত্রে 13, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের 14 এবং প্রথম ও তৃতীয়ের 15 হলে প্রত্যেকের সম্পদ কত ?

তিন ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে x, y ও z হলে, সর্তানুসারে,

$$x+y=13 \ldots\ldots(1)$$

$$y+z=14 \ldots\ldots(2)$$

$$z+x=15 \ldots\ldots(3)$$

বকশালী পাণ্ডুলিপিতে **আনুমানিক পদ্ধতি**-তে (**Regula Falsi**) এর সমাধান দেওয়া আছে।

॥ দ্বিঘাত সমীকরণ ॥

দ্বিঘাত সমীকরণের অস্তিত্ব ইউক্লিডের **এলিমেন্টস** গ্রন্থের জ্যামিতিক সমস্যার মধ্যে থাকলেও তা মাত্র খ্রীষ্টপূর্ব 300 বছরের। কিন্তু ভারতে এর অস্তিত্ব বৈদিক যুগের গণিতজ্ঞদের মধ্যে দেখা যায়। শুল্ব-যুগে বেদী-নির্মাণের ক্ষেত্রে $ax^2+bx=c$ এবং $ax^2=c$, এই দু-ধরনের দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান অপরিহার্য ছিল। পাণ্ডুলিপির যুগেও এর অনস্তিত্ব ছিল না। আর প্রাচীন ভারতের দুই শীর্ষস্থানীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত এই সমীকরণ সমাধান বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন-ই। **আর্যভটীয়** গ্রন্থে অবশ্য এর সমাধান পদ্ধতির কোন বিস্তারিত আলোচনা নাই। নানা প্রসঙ্গ থেকে মনে হয় আর্যভট এর বিস্তারিত আলোচনা বাহুল্যবোধ করেছেন। তিনি সমান্তর শ্রেণীর পদসংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে অজ্ঞাত রাশিটি নির্ণয়ের কথা বলেছেন। তাঁর সূত্রটি :

গচ্ছোঽষ্টোত্তরগুণিতাদ্ দ্বিগুণাদ্যুত্তরবিশেষবর্গযুতাৎ।
মূলং দ্বিগুণাদ্যূনং স্বোত্তরভজিতং সরূপার্ধম্ ॥

মর্মার্থ : সাধারণ অন্তরের 8 গুণ দিয়ে সমষ্টিকে গুণ কর। প্রথম পদের দ্বিগুণের সঙ্গে সাধারণ অন্তর বিয়োগ করে বিয়োগ ফলের বর্গ কর। প্রথমোক্ত গুণফলের সঙ্গে এই বর্গ যোগ কর। মূল গ্রহণ করে প্রথম পদের দ্বিগুণ বিয়োগ করে সাধারণ অন্তর দিয়ে ভাগ কর। তারপর সমগ্র ফলের সঙ্গে 1 যোগ করে অর্ধ নাও।

এখন, n-তম পদের সমষ্টি s হলে, এবং a=প্রথম পদ ও b=সাধারণ অন্তর হলে, আর্যভটের সূত্রটি নিম্নরূপে লেখা যায় :

$$n=\frac{1}{2}\left\{\frac{\sqrt{8bs+(2a-b)^2}-2a}{b}+1\right\}$$

আবার, কোন কোন সুদ নির্ণয় অঙ্কের ক্ষেত্রে $tx^2+px-Ap=0$ সমীকরণ সমাধান প্রয়োজন হয়। আর্যভটীয় গ্রন্থে এই সমীকরণ সমাধানের যে সূত্র দেওয়া আছে তা এরকম :

মূলফলং সফলং কালমূলগুণমর্ধমূলকৃতিযুক্তম্।

তন্মূলং মূলার্ধোনং কালহৃতং স্বমূলফলম্ ॥

এখন প্রতি p টাকায় x সুদ হলে এবং t মাসে সুদাসল A হলে আর্যভটের সূত্র থেকে লেখা যায়,—

$$x=\frac{\sqrt{Apt+\left(\frac{p}{2}\right)^2}-\frac{p}{2}}{t}=\frac{-p+\sqrt{p^2+4Atp}}{2t}$$

ব্রহ্মগুপ্ত সমাধান-পদ্ধতির দুটি সূত্র দিয়েছেন। তার একটি সূত্র এখানে উদ্ধৃত হলো :

বর্গচতুর্গুণিতানাং রূপানাং মধ্যবর্গসহিতানাম্।

মূলং মধ্যোনোনং বর্গদ্বিগুণোদ্ধৃতং মধ্যঃ ॥

অর্থাৎ চরম পদটিকে অজ্ঞাতরাশির বর্গের সহগের চারগুণের সহিত গুণ করে মধ্যের সহগের বর্গ যোগ কর। অতঃপর মূল করে অজ্ঞাতরাশির (মধ্যের) সহগ বিয়োগ কর। তারপর অজ্ঞাতরাশির বর্গের সহগ দ্বিগুণ করে ভাগ কর।

সন্দেহ নাই, ব্রহ্মগুপ্ত $ax^2+bx+c=0$ এই আকারের সমীকরণের কথাই বলেছেন। সুতরাং সূত্রানুযায়ী,—

$$x=\frac{\sqrt{4ac+b^2}-b}{2a}$$

'গণক-চক্র-চূড়ামণি'-র দ্বিতীয় সূত্রের তেমন অভিনবত্ব নাই। প্রথম সূত্র থেকেই এটি পাওয়া যায়,—

$$x=\frac{\sqrt{ac+\left(\frac{b}{2}\right)^2}-\frac{b}{2}}{a}$$

পরবর্তীকালে শ্রীধরাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের প্রথম সূত্রটি নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। বর্তমান স্কুলগণিতে অনেক সময় এটি শ্রীধরাচার্যের প্রণালী বা পদ্ধতি নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূত্রটির উদ্ভাবক হচ্ছেন ব্রহ্মগুপ্ত। শ্রীধরের বীজগণিত আজ অবলুপ্ত। ভাস্কর, জ্ঞানরাজ ও সূর্যদাসের উদ্ধৃতি থেকে সূত্রটি জানা যায় :

চতুরাহতবর্গসমৈ রূপৈঃ পক্ষদ্বয়ম্ গুণয়েৎ।
অব্যক্তবর্গরূপৈর্যুক্তৌ পক্ষৌ ততো মূলম্ ॥

অর্থাৎ সমীকরণের উভয়পক্ষকে বর্গ-অজ্ঞাত রাশির (x^2) সহগের চতুর্গুণ দ্বারা গুণ কর এবং উভয়পক্ষে অজ্ঞাত-রাশির সহগের বর্গ যোগ করে বর্গমূল নির্ণয় কর।

(i) $ax^2+bx=c$ সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে

$$ax^2+bx=c$$

বা, $4a\times ax^2+4a\times bx=4a\times c$

বা, $4a^2x^2+4abx=4ac$

বা, $4a^2x^2+4abx+b^2=4ac+b^2$

বা, $(2ax+b)^2=4ac+b^2$

বা, $2ax+b=\pm\sqrt{4ac+b^2}$

বা, $2ax=-b\pm\sqrt{b^2+4ac}$

বা, $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2+4ac}}{2a}$

(ii) $ax^2+bx+c=0$ এই সমীকরণের ক্ষেত্রে,

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

দ্বিঘাত সহসমীকরণ নিয়েও ভারতীয় গণিতজ্ঞরা ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

আর্যভট $x-y=a$ ও $xy=b$ এই সমীকরণ দুটির সমাধান করে বলেছেন,

$$x=\frac{1}{2}\left[\sqrt{a^2+4b}+a\right],\quad y=\frac{1}{2}\left[\sqrt{a^2+4b}-a\right]$$

মহাবীর $x+y=a$, $xy=b$ এই সমীকরণের সমাধান দিয়েছেন,—

$$x=\frac{1}{2}\left[a+\sqrt{a^2-4b}\right],\quad y=\frac{1}{2}\left[a-\sqrt{a^2-4b}\right]$$

তাঁর আর এক ধরনের সমীকরণ, $x^2+y^2=c$, $xy=b$-এর সমাধান,—

$$x=\frac{1}{2}\left[\sqrt{c+2b}+\sqrt{c-2b}\right],\; y=\frac{1}{2}\left[\sqrt{c+2b}-\sqrt{c-2b}\right]$$

'বিষমকর্ম' বলে এক প্রকার সমীকরণ ভারতীয় গণিতে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে সমাধান করতে হয়। এখানে দুটি উদাহরণ দেখানো হলো :

(i) $x^2-y^2=m$ (ii) $x^2-y^2=m$

$x-y=n$ $x+y=p$

এদের সমাধান নিম্নরূপ :

(i) $x=\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}+n\right)$, $y=\frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}-n\right)$

(ii) $x=\frac{1}{2}\left(p+\frac{m}{p}\right)$, $y=\left(p-\frac{m}{p}\right)$

আচার্য আর্যভটের একটি সূত্র দিয়ে আরো এক ধরণের সমীকরণ সমাধান করা যায়। সূত্রটি :

সম্পর্কস্য হি বর্গাদ্ বিশোধয়েদেব বর্গসম্পর্কম্।
যত্তস্য ভবত্যর্ধং বিদ্যাদ্ গুণকারসংবর্গম্ ॥

অর্থাৎ দুটি উৎপাদকের সমষ্টির বর্গ থেকে তাদের বর্গের সমষ্টি বিয়োগ করে অন্তরকে অর্ধ কর। তাহলে দুটি উৎপাদকের গুণফল পাবে।

বীজগণিতের ভাষায়, $x \times y=\frac{(x+y)^2-(x^2+y^2)}{2}$

এই সূত্র থেকে $x^2+y^2=c$, $x+y=a$ সমীকরণের সমাধান,—

$$x=\frac{1}{2}\left[a+\sqrt{2c-a^2}\right], \quad y=\frac{1}{2}\left[a-\sqrt{2c-a^2}\right]$$

॥ দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ ॥

দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ সম্বন্ধে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এ-বিষয়ে যে তাঁরা ডায়োফ্যান্টাসকেও অতিক্রম করে গেছেন, তা অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা স্বীকার করেন। পদ্মনাভের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ভাস্কর বলেছেন, দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ আছে; একটি ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক। কিন্তু ঋণাত্মক বীজটি তিনি গ্রহণ করেন নি। কারণ এটি অবাস্তব। ব্রহ্মগুপ্তের মতও একই ধরনের; তিনিও ঋণাত্মক বীজটি অবাস্তবতার জন্য গ্রহণ করেননি।

ভাস্কর কর্তৃক উদ্ধৃত পদ্মনাভের মতটি এরকম :

ব্যক্ত পক্ষস্য চেন্মূলমন্যপক্ষর্ণরূপতঃ
অল্পং ধনর্ণগং কৃত্বা দ্বিবিধোৎ পদ্যতে মিতি ॥

ভারতীয় গণিতজ্ঞদের ঋণাত্মক বীজ গ্রহণ না করার পিছনে যে কারণ ছিল, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে আরো স্পষ্ট করা যাক।

উদাহরণ : একদল বানরের এক-পঞ্চমাংশ থেকে 3 বিয়োগ করলে যে সংখ্যা হয়, তার বর্গ-সংখ্যক বানর একটি গুহায় প্রবেশ করল। এখন যদি একটি বানর গাছে থাকে, তাহলে কয়টি বানর ছিল ?

বানরের সংখ্যা x ধরে প্রদত্ত সর্ত থেকে,

$$x=\left(\frac{1}{5}x-3\right)^2+1$$

বা, $x^2-55x+250=0$

বা, $(x-5)(x-50)=0$

$\therefore$ $x=5$ অথবা 50

কিন্তু ভাস্কর $x=5$ বীজটি গ্রহণ করেননি তার অবাস্তবতার জন্য। অঙ্কের সর্তানুসারে $\frac{1}{5}$ অংশ $=5\times\frac{1}{5}=1$, এবং 1 থেকে 5 বিয়োগ করা যায় না। সেজন্য ভাস্কর অপর বীজ $x=50$ গ্রহণ করেছেন।

গণিত-সার-সংগ্রহ-এর নানা উদাহরণ থেকেও বোঝা যায় মহাবীর দ্বিঘাত সমীকরণের যে দুটি বীজ আছে তা জানতেন।

বস্তুত, সমস্যাই আবিষ্কারের মূল উৎস। পাটীগাণিতিক নানা সমস্যার সমাধানের অন্বেষণেই ভারতে বীজগণিতের উৎপত্তি। এ-বিষয়ে এফ. ক্যাজরি, হ্যাঙ্কেলের মত উদ্ধৃত করে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য : "Indeed, if one understands by algebra the application of arithmetical operations to complex magnitudes of all sorts, whether rational or irrational numbers or space magnitudes, then the learned Brahmins of Hindostan are the real inventors of algebra."

॥ একটি বিতর্ক ॥

একঘাত সমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে ভারত অন্য দেশ বিশেষ করে গ্রীসের কাছে ঋণী কিনা এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে বেশ বিতর্ক আছে। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতরা অনেকে প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ব্যবহৃত দু-একটি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিচার করে এই বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। এমন একটি শব্দ হচ্ছে 'রূপক'। এই শব্দটি আর্যভটের, ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থাদিতে দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আর্যভটের "গুলিকান্তরেণ" সূত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে, আর ওই শ্লোকেও এই শব্দটি আছে। এটি একটি মুদ্রার একক। এই এককটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আর্যভটের ন'শ' বছর আগে রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত এটিতে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

এম. ক্যান্টরের মত গণিতের ঐতিহাসিক পর্যন্ত একঘাত বা দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে গ্রীক প্রভাব আছে বলে মনে করেন,—বিশেষ করে ডায়োফ্যান্টাসের প্রভাব। অবশ্য রূপক সম্বন্ধে প্রথম ভাস্কর বলেছেন এটি মুদ্রা,—দিনার। কিন্তু এতে রূপক শব্দ গ্রীক প্রভাবিত বলা চলে না। তা হলে কি কৌটিল্যের আগে থেকেই গ্রীক প্রভাব ভারতে বিস্তার করেছিল? কিন্তু ইতিহাস তো সে সাক্ষ্য দেয় না।

বরং আমাদের মনে হয় আর্যভট কর্তৃক ব্যবহৃত রূপক বোধ হয় কৌটিল্যের পূর্ববর্তী কোন প্রাচীন গণিতগ্রন্থের নিদর্শন। যাই হোক,—গণিতের ঐতিহাসিক ক্যাজরি একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি বোধ হয় ভারতীয় গণিতজ্ঞদের সম্বন্ধে প্রকৃত মূল্যায়ন। তিনি ক্যান্টরের মন্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন: **"Even if it be true that the Indians borrowed from the Greeks, they deserve great credit for improving and generalising the solutions of linear and quadratic equations."**

॥ শ্রেঢ়ী ॥
(শ্রেণী)

ইতিপূর্বে প্রগতি বা শ্রেণী সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আমরা করেছি। এখানে অতি সংক্ষেপে আর একটু আলোচনা করা হলো।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানাভাবে শ্রেঢ়ী বা শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। **অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, বাজসেনীয় সংহিতা, বৃহৎদেবতা, কল্পসূত্র** ইত্যাদিতে শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়। এসব গ্রন্থে যে ধরনের শ্রেণী দেখা যায় তা সবই সমান্তর শ্রেণী। বেদ গ্রন্থ সমূহে নানা ধরনের সংখ্যার উল্লেখ আছে।

এখানে অথর্ববেদের 19শ কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্ত থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো দ্রষ্টারো নবতির্নব।
অশীতিঃ সন্ত্যষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্ততিঃ ॥
ষষ্টিশ্চ ষট্ চ রেবতি পঞ্চাশৎ পঞ্চ সুম্নয়ি।
চত্বারশ্চত্বারিংশচ্চ ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বাজিনি ॥
দ্বৌ চ তে বিংশতিশ্চ তে রাত্র্যেকাদশাবমাঃ।
তেভির্নো অদ্য পায়ুভির্নু পাহি দুহিতর্দিবঃ ॥

অনুবাদ : "হে রাত্রি, তোমার মহিমার দ্রষ্টা, মানুষের কর্মফলের জ্ঞাতা যে নিরানব্বই (99), অষ্টাশী (88) এবং সাতাত্তর (77) জন গণদেবতা আছে, তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। হে ধনপ্রদে রাত্রি, তোমার ছেষট্টি (66) গণদেবতা আছে, হে সুখপ্রাপিকে, তোমার যে পঞ্চান্ন (55) গণদেবতা আছে, যে চুয়াল্লিশ (44) গণদেবতা আছে এবং হে অন্নবতি, তোমার যে তেত্রিশ (33) সংখ্যক গণদেবতা আছে, তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। হে রাত্রি, যে দ্বাবিংশতি (22) গণদেবতা তোমার মহিমার দ্রষ্টা আছে এবং যে নিকৃষ্ট এগার (11) সংখ্যক দেবতা তোমার ব্যাপ্তিদ্রষ্টা আছে, হে দ্যুলোকের পুত্রি, হে রাত্রি, এখন দ্রুত তোমার ব্যাপ্তিদর্শক গণদেবতার সাথে আমাদের রক্ষা কর।" (অথর্ববেদ—হরফ, বিজন বিহারী গোস্বামী, সংখ্যা লেখকের)

অনুবাদের মধ্যে সংখ্যাগুলি আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। এই সংখ্যাগুলির,—99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11-এর দিকে তাকালে আমরা দেখি এগুলি সমান্তর শ্রেণী গঠন করেছে, এবং এদের সাধারণ অন্তর =11.

তৈত্তিরীয় সংহিতায় সংখ্যাগুলি এভাবে সাজানো আছে :

1, 3, 5, 7 ··· 19, 29, 39 ··· 99

2, 4, 6, 8, 10, ······ 20

বৃহৎদেবতা ও কল্পসূত্রে কেবলমাত্র সমান্তর শ্রেণীর অস্তিত্বই নাই,—এর সমষ্টি পর্যন্ত দেওয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রের কোন হদিস নাই। যেমন, ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে নিম্নরূপ শ্রেণী ও সমষ্টি দেখা যায় :

$$1+2+3+4+5+\cdots+8192=16383$$

শ্রেণী বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা বকশালী পাণ্ডুলিপির যুগ থেকে দেখা যায়। আর্যভট এ-বিষয়ে অনেক সূত্র দিয়েছেন। ইতিপূর্বে দ্বিঘাত সমীকরণে আমরা দু-একটি আলোচনা করেছি। এখানে, একটিমাত্র সূত্র উদ্ধৃত হলো।

ইষ্ট্যং ব্যেকং দলিতং সপূর্বমুত্তরগুণং সমুখমধ্যম্।
ইষ্টগুণিতমিষ্টধনং ত্বথবাদ্যন্তং পদার্ধহতম্॥

ভাবানুবাদ ঃ পদসংখ্যা থেকে 1 বাদ দাও, 2 দিয়ে ভাগ কর। এবার আগের পদসংখ্যা যোগ কর ; সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ কর ; প্রথম পদ যোগ কর। তাহলে এই ফল সমান্তর মধ্যক হবে। একে পদসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমগ্র শ্রেণীর সংখ্যাসমূহ পাওয়া যাবে। অথবা প্রথম পদ এবং শেষ পদ এই উভয়ের যোগফলকে পদসংখ্যার অর্ধেক দিয়ে গুণ করলে শ্রেণীর সংখ্যার যোগফল পাওয়া যায়।

ধরা যাক, শ্রেণীটি $a+(a+d)+(a+2d)+\cdots$

তাহলে $(a+pd)+(a+\overline{p+1}d)+\ldots+\{a+(p+n-1)\ d\}$

এই শ্রেণীর সমান্তর মধ্যক হবে

$$a+\left(\frac{n-1}{2}+p\right) d\ ;$$

আবার n-তম পদের সমষ্টি হবে

$$n\left\{a+\left(\frac{n-1}{2}+p\right)\ d\right\}$$

বিশেষ ক্ষেত্রে ঃ $p=0$ হলে,

$$\text{মধ্যক}=a+\frac{n-1}{2}.d$$

আর শ্রেণী সমষ্টি$=n\left\{a+\frac{n-1}{2}.\ d\right\}$

শ্রেণী-বিষয়ক আলোচনায় ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর আরো সুশৃঙ্খল ও আরো স্পষ্ট। এ-বিষয়ে আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের সূত্রটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় :

পদমেকহীনমুত্তরগুণিতং সংযুক্তমাদিনাহন্ত্যধনম্।
আদিযুতান্ত্যধনার্ধং মধ্যধনং পদগুণমং গণিতম্॥

"অর্থাৎ প্রথম পদ, সাধারণ অন্তর এবং পদসংখ্যা জানা থাকলে শেষপদ কত সংখ্যা, মধ্যপদ কত সংখ্যা এবং যে কোন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা যেতে পারে। পদসংখ্যা থেকে এক বিয়োগ করে ঐ বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ করে তারপর প্রথমপদ যোগ করলে শেষপদ পাওয়া যাবে। এই শেষপদের সঙ্গে প্রথমপদ আবার যোগ দিয়ে তারপর দুই দিয়ে ভাগ দিলে মধ্যপদ পাওয়া

যাবে। এই মধ্যপদকে পদসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমগ্র পদের সমষ্টি পাওয়া যাবে।" (প্রা. ভা. গ. চ.)

আধুনিক বীজগণিতের চিহ্ন ও সঙ্কেতে উপরের সূত্রটি প্রকাশ করলে,—

$$t_n = a+(n-1)\,b\,;\quad t_k = \frac{2a+(n-1)\,b}{2}$$

$$S_n = \frac{n}{2}\Big\{2a+(n-1)\;b\Big\}$$

বলা বাহুল্য, এখানে t_n=n-তম পদ ; a=প্রথম পদ, b=সাধারণ অন্তর ; t_k=মধ্যম পদ এবং S_n=n-সংখ্যক পদের সমষ্টি।

গুণোত্তর শ্রেণীর উল্লেখ পিঙ্গলের ছন্দসূত্র গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমরা এ-বিষয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। এখানে মহাবীরের গণিতসার-সংগ্রহ থেকে একটিমাত্র সূত্রের উল্লেখ করা হলো।

গুণধনমাদিবিভক্তং রূপোন নিজধনসমং স এব চয়ঃ।
গচ্ছপ্রমগুণপ্রভবং গুণিতং ভবেৎ প্রভবঃ॥

আধুনিক বীজগাণিতিক ভাষায় এর মর্মার্থ,

(i) $\dfrac{a(r^n-1)}{r-1} \div a = \dfrac{r^n-1}{r-1}$

(ii) $\dfrac{r^n-1}{r-1} - 1 = \dfrac{r^n-r}{r-1}$

(iii) $a = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1} \times \dfrac{r-1}{r^n-1}$

এ ছাড়া মহাবীর গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রও দিয়েছেন। ভাস্করের আলোচনাও উল্লেখ করার মত।

বস্তুতপক্ষে শ্রেণী বিষয়ক সব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা ভারতীয় গণিতের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পড়তে পারেন। কিছুটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্যই এখানে সামান্য আলোচনা করা হলো।

সপ্তদশ অধ্যায়

"Some of the most brilliant of Hindoo discoveries in indeterminate analysis reached Europe too late to exert the influence they would have exerted, had they come two or three centuries earlier." —F. Cajori

॥ কুট্টক ॥

আধুনিক অনির্ণেয় সমীকরণ ভারতীয় গণিতে **কুট্টক** নামে অভিহিত। সাধারণভাবে কুট্টক নাম ব্যবহৃত হলেও আরো কয়েকটি নাম দেখা যায়। যেমন,—প্রথম ভাস্কর তাঁর **মহাভাস্করীয়** গ্রন্থে **কুট্টকার, কুট্টক** বা **কুট্ট** বলেছেন। ব্রহ্মগুপ্তও একই কথা বলেছেন, আর মহাবীর **কুট্টিকার** বলেছেন। কিন্তু প্রথম ভাস্কর সর্বপ্রথম অনির্ণেয় সমীকরণের পরিভাষা ব্যবহার করেন। '**কুট্টক**' শব্দের অর্থ ভাঙা বা চূর্ণ করা। এই পদ্ধতিতে ক্রমিক ভাগহার বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাজন হয় অর্থাৎ বিতত ভগ্নাংশের প্রয়োগ হয় বলে এরকম নামকরণ হয়ে থাকবে।

শুল্বসূত্রে অনির্ণেয় সমীকরণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। n-সংখ্যক বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কনের সমস্যার মধ্যে এই অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের বীজ নিহিত আছে বলে মনে হয়। সূত্রকার কাত্যায়ন সমস্যাটির চিত্রাঙ্কনের যে সূত্র দিয়েছেন, তাতে $x^2+y^2=z^2$—এই অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান অপরিহার্য ছিল। কিন্তু এই সমীকরণটির সমাধানের কোন ইঙ্গিত বা আভাস শুল্বসূত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি বৌধায়নের শুল্বসূত্রেও একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণঘটিত সমস্যা দেখা যায়। যেমন, **গার্হপত্য-বেদী** নির্মাণের সঙ্গে এই সমস্যা জড়িত।

কেবলমাত্র গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেই নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বেদী নির্মাণের ক্ষেত্রেও এর অপরিসীম গুরুত্ব থাকায় ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধানের ক্ষেত্রে মহৎ কৃতিত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে-কারণে বোধহয় এই বিষয়টি গণিতে একটি পৃথক শাখা হিসাবে আলোচিত হবার যোগ্যতা

অর্জন করে। যেমন,—পরবর্তীকালে ভাষ্যকার দেবরাজ 'কুট্টকার-শিরোমণি' নামে একটি গ্রন্থই রচনা করেন।

নিঃসন্দেহে বিষয়টি বীজগণিতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভাস্কর এটি পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেন সম্ভবত একটি কারণে যে, তিনি গণিতের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পাটীগণিতের ছাত্রদের কাছে আগে থেকেই পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন।

॥ একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের শ্রেণী বিভাগ ॥

সাধারণত $by=ax\pm c$ এই সমীকরণকে একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ বলা হয়। আর্যভট a, b, c ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ধরে $by=ax+c$ সমীকরণটি সমাধান করেন, এবং একঘাত সহসমীকরণেও প্রয়োগ করেন।

এ ধরণের সমীকরণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

(i) কোন সংখ্যা (N)-কে প্রদত্ত দুটি রাশি a ও b দ্বারা ভাগ করলে দুটি প্রদত্ত অবশেষ (ভাগশেষ) R_1 এবং R_2 পাওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা পাই,—

$$N=ax+R_1=by+R_2$$

বা, $by-ax=R_1-R_2$

এখন, $R_1-R_2=c$ হলে,

$$by-ax=\pm c$$

(ii) এমন কোন একটি রাশি (x) নির্ণয় করতে হবে যাকে অন্য একটি প্রদত্ত রাশি α দিয়ে গুণ করলে ওই গুণফলের আর একটি প্রদত্তরাশি γ যোগ বা বিয়োগের পর তৃতীয় কোন রাশি β দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। গাণিতিক ভাষায়,—

$$y=\frac{\alpha x\pm\gamma}{\beta}$$

(iii) এই প্রকার সমীকরণের আকার $by+ax=\pm c$

প্রথম ভাস্কর কুট্টক-কে দু-ভাগে ভাগ করেছেন,—সাগ্র কুট্টাকার, আর নিরগ্র কুট্টাকার। তিনি আবার উদাহরণ দিয়ে এই দু-ধরনের সমীকরণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথম ভাস্করের ভাষ্যকার গোবিন্দস্বামী আবার 'মহাভাস্করীয়' গ্রন্থের টীকায় এ-বিষয়ে আরো স্পষ্ট আলোচনা করেছেন।

।। আর্যভট ও একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ।।

আর্যভটের পূর্বে ভারতে অনির্ণেয় সমীকরণের অস্তিত্ব থাকলেও এই অনন্য গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদই এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্যভটের অনেক মৌলিক অবদান আছে সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতে এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য।

আর্যভটীয় গ্রন্থে এই সম্পর্কিত মাত্র দুটি শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু এ-দুটির অন্তর্নিহিত অর্থ খুব জটিল ও দুরূহ। শব্দার্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আচার্য আর্যভট তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদান করার সময় এই শ্লোকের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা করে থাকবেন এবং তাঁর শিষ্যরাও গুরু প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে তাঁদের শিষ্যদের জটিলতা দূর করে থাকবেন। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সে-ব্যাখ্যা আজ অবলুপ্ত। ভারতীয় গণিতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ বি. বি. দত্ত আর্যভটের একান্ত অনুরাগী প্রথম ভাস্করকৃত পদ্ধতি অবলম্বন করে এই সমীকরণ সমাধানের যে রূপরেখা দিয়েছেন, আমরাও মূলত সেই পথ অনুসরণ করে এই জটিল বিষয়টি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আচার্য আর্যভটের শ্লোক দুটি ও তাঁর ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হলো :

> অধিকাগ্রভাগহারং ছিন্দ্যাদূনাগ্রভাগহারেণ।
> শেষপরস্পরভক্তং মতিগুণমগ্রান্তরে ক্ষিপ্তম্ ।।
> অধউপরিগুণিতমন্ত্যযুগূনাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষম্ ।
> অধিকাগ্রচ্ছেদগুণং দ্বিচ্ছেদাগ্রমধিকাগ্রযুতম্ ।।

ইংরেজী অনুবাদ : Divide the divisor corresponding to the greater remainder by the divisor corresponding to the smaller remainder. (Discard the quotient). Divide the remainder obtained (and the divisor) by one another (until the number of quotients of mutual division is even and the final remainder is small enough). Multiply the final remainder by an optional number and to the product obtained add the difference of the remainders (corresponding to the greater and smaller divisors; then divide this sum by the last divisor of the mutual division.

The optional number is to be so chosen that this division is exact. Now place the quotients of the mutual division one below the other in a column; below them write the optional number and underneath it the quotient just obtained. Then reduce the chain of numbers which have been written down one below the other, as follows): Multiply by the last but one number (in the bottom) the number just above it and then add the number just below it (and then discard the lower number). (Repeat this process until there are only two numbers in the chain). Divide (the upper number) by the divisor corresponding to the smaller remainder, then multiply the remainder obtained by the divisor corresponding to the greater remainder, and then add the greater remainder: the result is the dvicchedāgra (i.e., the number answering to the two divisors). (This is also the remainder corresponding to the divisor equal to the product of the two divisors).

[Āryabhaṭīya of Āryabhaṭa by Shukla & Sarma]

আর্যভটের শ্লোক দুটির জটিলতা ও দুরূহতা বোঝানোর জন্যই কেবল ইংরেজী অনুবাদটি দেওয়া হলো। বন্ধনীগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় টীকা-ভাষ্য ব্যতিরেকে এই শ্লোকের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। যা হোক,—এবার আমরা একটি সমস্যা উদাহরণস্বরূপ নিয়ে আর্যভটের পদ্ধতি বুঝে নেওয়ার প্রয়াস পাব। বলা হয়, নিম্নরূপ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আচার্য অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান করেন।

সমস্যা : কোন্ সংখ্যা (N)-কে প্রদত্ত দুটি রাশি a ও b দ্বারা ভাগ করলে R_1 ও R_2 ভাগশেষ পাওয়া যায়?

সমস্যার বীজগাণিতিক রূপ,—

$$N=ax+R_1=by+R_2$$

a ও b-এর নাম 'ভাগহার' এবং R_1 ও R_2-এর নাম 'অগ্র'।

এখন, $R_1-R_2=c$ হলে,

$$by=ax+c, \text{ যখন } R_1>R_2$$

আবার, $ax=by+c$, যখন $R_2>R_1$

c অর্থাৎ R_1-R_2-এর পারিভাষিক নাম **অগ্রান্তর**,—ভাগশেষ দুটির অন্তর।

মহাবীর, দ্বিতীয় আর্যভট, ভাস্কর উপরের সমীকরণের $y=\dfrac{ax\pm c}{b}$ আকার বা রূপটি গ্রহণ করেছেন। এখানে $a=$'ভাজ্য', $b=$'হার', $c=$'ক্ষেপ' বা 'প্রক্ষেপ', $x=$'গুণ' এবং $y=$'ফল'। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা একবাক্যে সবাই স্বীকার করেছেন যে, a ও b পরস্পর মৌলিক হবে।

উদাহরণ ঃ সমাধান কর : $137x+10=60y$

প্রথম সোপান ঃ x ও y-এর সহগকে যথাক্রমে ভাজ্য ও ভাজক করে গ. সা. গু. পদ্ধতিতে ভাগ করা হলো :

```
60) 137 ( 2
    120
    ---
     17) 60 ( 3
         51
         --
          9) 17 ( 1
              9
             --
              8) 9 ( 1
                 8
                 -
                 1
```

দ্বিতীয় সোপান ঃ প্রাপ্ত ভাগফলগুলি নিম্নরূপ বল্লীতে সাজানো হলো :

2
3
1
1

তৃতীয় সোপান ঃ প্রথম ভাগফলটি উপেক্ষা করলে ভাগফলের সংখ্যা হয় 3 ; এবার একটি আনুমানিক সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এমন একটি **'গুণক'** নির্ণয় করতে হবে যাকে সর্বশেষ ভাগশেষ দ্বারা গুণ করে প্রদত্ত সমীকরণের **'চরম পদ'**-টি বিয়োগ করলে ফলটি উপান্ত্য ভাগশেষ অর্থাৎ শেষ ভাগশেষের আগেরটির দ্বারা বিভাজ্য হয়।

এখানে শেষ ভাগশেষ$=1$, উপান্ত্য ভাগশেষ$=8$; সুতরাং $8\times1=1\times18$ $=10$; এখানে আনুমানিক সংখ্যা$=18$ এবং নির্ণীত ভাগফল$=1$

চতুর্থ সোপান ঃ প্রথম ভাস্করের সূত্র অবলম্বনে নিম্নরূপ সারণী করা হলো ঃ

	2	2	2	2	297
	3	3	3	130	130
	1	1	37	37	
	1	19	19		
গুণক→	18	18			

নির্ণীত ভাগফল→1

কিভাবে তালিকাটি বা সারণী প্রস্তুত করা হলো তার সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। 'গুণক' 18-কে ঠিক তার উপরের সংখ্যা 1 দ্বারা গুণ ও নীচের সংখ্যা 1 যোগ করে পরবর্তী স্তম্ভের $(18\times 1+1)=19$ সংখ্যাটি পাওয়া গেল ; অনুরূপে $(19\times 1+18)=37$ তৃতীয় স্তম্ভের সংখ্যাও পাওয়া গেল। এভাবে সর্বশেষ স্তম্ভের 297 সংখ্যাটি নির্ণীত হয়েছে।

সুতরাং $x=140, y=297$

এখন, 130-কে 60 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ 10, এবং 297-কে 137 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ 23 পাওয়া যায়। সুতরাং $x=10, y=23$

কিন্তু এই বীজ সাধারণ (general) নয় ; $x=10+60m, y=23+137m$ হচ্ছে সাধারণ বীজ।

এতক্ষণ যে পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো তার সামান্য পরিবর্তন করে সমীকরণের সরল বীজ সহজে নির্ণয় করা যায়। মনে করা যাক, ভাগশেষ=8

প্রথম ভাগফলকে উপেক্ষা করলে ভাগফল-সংখ্যাটি 'যুগ্ম' হয়। সুতরাং 'গুণক' 1 ধরলে $8\times 1+10=18=9\times 2$ অর্থাৎ 18 সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য এবং নির্ণীত ভাগফল=2

আগের মত সারণী করলে,—

	2	2	2	23
	3	3	10	10
	1	3	3	
গুণক→	1	1		

নির্ণীত ভাগফল→2

বলা বাহুল্য, সারণীর অন্যান্য অঙ্কগুলি পূর্ব-নিয়মে নির্ণীত হয়েছে।

অতএব, $x=10, y=23$—প্রদত্ত অনির্ণেয় সমীকরণের সরল বীজ।

ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, ভাস্কর, শ্রীপতি, নারায়ণ প্রমুখ গণিতজ্ঞদের হাতে এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির প্রভূত উন্নতিসাধন পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাস্কর এই সমীকরণ সমাধানের নিয়ম খুবই সহজ ও সরল ভাবে ব্যাখ্যা করেন। মূলত তিনি আর্যভটের অনুসরণ করেছেন, তবে তিনি যে ধরনের সমীকরণের কথা বলেছেন তা হলো $\frac{ax-b}{b}=y$; $y=$ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। তাঁর মহাভাস্করীয় গ্রন্থে নিম্নরূপ সূত্র বা নিয়ম পাওয়া যায় :

ভাজ্যং ন্যসেদুপরি হারমধশ্চ তস্য খণ্ডয়াৎ পরস্পরমধো বিনিধায় লব্ধম্।
কেনাহতোঽয়মপনীয় যথাস্য শেষং ভাগং দদাতি পরিশুদ্ধমিতি প্রচিন্ত্যম্।
আপ্তাং মতিং তাং বিনিধায় বল্ল্যাং নিত্যং হ্যধোঽধঃ ক্রমশশ্চ লব্ধম্।
মত্যা হতং স্যাদুপরিস্থিতং যল্লব্ধেন যুক্তং পরতশ্চ তদ্বৎ।
হারেণ ভাজ্যো বিধিনো পরিস্থো ভাজ্যেন নিত্যং তদধঃস্থিতশ্চ।
অহর্গণোঽস্মিন্ ভগনাদয়শ্চ তথা ভবেদ্যস্য সমীহিতং যৎ।

ভাবানুবাদ ঃ বৃহত্তর অবশিষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভাজককে অনুরূপে ক্ষুদ্রতর অবশিষ্টের ভাজক দ্বারা ভাগ কর। ক্রমিক ভাগ-ক্রিয়ায় প্রাপ্ত ভাগফল সমূহ শৃঙ্খলাকারে সজ্জিত (বল্লীতে) কর। সর্বশেষ অবশিষ্টকে এমন একটি ঐচ্ছিক রাশি দ্বারা গুণ কর যাতে গুণফলে অবশিষ্টান্তর যোগ বা বিয়োগ করে উপান্ত্য অবশেষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয় ; শৃঙ্খলাকারে সজ্জিত ভাগফল সমূহের নীচে ঐচ্ছিক রাশি ও নির্ণীত ভাগফল পর পর স্থাপন কর। উপান্ত্য সংখ্যাটিকে পূর্ববর্তী সংখ্যা দ্বারা গুণ করার পর পরবর্তী সংখ্যা যোগ করে পরবর্তী স্তম্ভের উপান্ত্য সংখ্যা পাওয়া যায়। অনুরূপে দুটি সংখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত এই নি·মের পুনরাবৃত্তি হবে। এবং বাঞ্ছিত অহর্গণ পাওয়া যাবে।

॥ একঘাত অনির্ণেয় সহসমীকরণ ॥

এ-ধরনের সমীকরণ নিয়ে আর্যভট, প্রথম ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রমুখ গণিতজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। এঁরা নিম্নরূপ সমীকরণগুলির সমাধান করেছেন :

(1) $a_1x+b_1y+c_1z+d_1w=\omega$
$a_2x+b_2y+c_2z+d_2w=\omega$
$a_3x+b_3y+c_3z+d_3w=\omega$
$a_4x+b_4y+c_4z+d_4w=\omega$

(2) $N=a_1x_1+r_1=a_2x_2+r_2=a_3x_3+r_3=\ldots a_nx_n+r_n$

(3) $\beta y_1=\alpha_1x\pm\gamma_1$

$\beta y_2=\alpha_2x\pm\gamma_2$

$\beta y_3=\alpha_3x\pm\gamma_3$

$\beta y_4=\alpha_4x\pm\gamma_4$

....

....

(4) $\beta_1y_1=\alpha_1x\pm\gamma_1$

$\beta_2y_2=\alpha_2x\pm\gamma_2$

$\beta_3y_3=\alpha_3x\pm\gamma_3$

(5) $x\pm\alpha=s^2$

$x\pm\beta=t^2$

(1) নং ধরনের সমীকরণের সুন্দর উদাহরণ ভাস্করের গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

উদাহরণ ঃ "চার বণিকের যথাক্রমে পাঁচ, তিন, ছয় ও আটটি করে ঘোড়া ; দুই, সাত, চার ও একটি করে উট ; আট, দুই, এক ও তিনটি করে গাধা এবং সাত, এক, দুই ও একটি করে বৃষ আছে। সকলের ধন সমান হলে ঘোড়া প্রভৃতির মূল্য কত ?" (প্রা. ভা. গ. চ.)

(2) নং ধরনের সমীকরণ সমাধান আর্যভটের পদ্ধতিতে আছে ; প্রথম ভাস্কর ও ব্রহ্মগুপ্তও এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম ভাস্করের একটি উদাহরণ দেখানো হলো।

উদাহরণ ঃ কোন্ সংখ্যাকে 8 দ্বারা ভাগ করলে 5 ভাগশেষ থাকে, 9 দ্বারা ভাগ করলে 4 ভাগশেষ থাকে, 7 দ্বারা ভাগ করলে 1 ভাগশেষ থাকে ?

বলা বাহুল্য, সংখ্যাটি N হলে, সমীকরণগুলি এরূপ হবে,—

$$N=8x+5=9y+4=7z+1$$

(3) নং ধরনের সমীকরণের ভারতীয় গণিতে বিশেষ নাম আছে। তার নাম 'সংশ্লিষ্ট কুট্টক'। ভাস্করের একটি উদাহরণ :

কোন্ সংখ্যাকে 5 দ্বারা গুণ করে 63 দিয়ে ভাগ করলে 7 ভাগশেষ থাকে ; আবার ওই সংখ্যার 10 গুণ করে 63 দিয়ে ভাগ করলে 14 ভাগশেষ থাকে ?

$$\text{অর্থাৎ}\quad \left.\begin{array}{l} 63y_1 = 5x - 7 \\ 63y_2 = 10x - 14 \end{array}\right\}$$

(4) ও (5) নং ধরনের সমীকরণ নিয়ে মহাবীর, শ্রীপতি, ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ গণিতজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত $x \pm a = u^2$ ও $x \pm b = v^2$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান নিম্নরূপ করেছেন,—

$$x = \left\{ \frac{1}{2}\left(\frac{a-b}{m} \pm m\right)^2 \mp a \right\}, \quad x = \left\{ \frac{1}{2}\left(\frac{a-b}{m} \mp m\right)^2 \mp b \right\}$$

এখানে, m=যে-কোন পূর্ণসংখ্যা।

॥ বর্গ-প্রকৃতি ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ $Nx^2 \pm c = y^2$ **'বর্গ-প্রকৃতি'** নামে আখ্যাত। এই সমীকরণে কোন বর্গ-সংখ্যাকে গুণক দ্বারা গুণ করে কোন ঐচ্ছিক রাশির সঙ্গে যোগ করার পর বর্গমূল নির্ণয় করা হয়।

$Nx^2+1=y^2$ এই শ্রেণীর একটি মৌল সমীকরণ। এই সমীকরণের বর্গ-প্রকৃতি নামকরণের উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন গণিতজ্ঞদের মত ও ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় যে, গণিতে এই শাখার গণনার নীতি হচ্ছে একটি সংখ্যা বা সংখ্যাসমূহ নির্ণয় করা যার **প্রকৃতি** এমন যে তার বর্গ বা বর্গসমূহ কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার পর একটি বা কয়েকটি বর্গের ন্যায় সংখ্যা উৎপন্ন করে।

$Nx^2+1=y^2$ এই সমীকরণে সহগ N-কে প্রকৃতি বলা হয় এবং N একটি অখণ্ড ধনরাশি। $Nx^2 \pm c = y^2$ এই সমীকরণে x=কনিষ্ঠপদ, y=জ্যেষ্ঠ পদ, N=গুণক এবং c=ঐচ্ছিক রাশি বা প্রক্ষেপ।

বর্গ-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দু-একটি পরিভাষা ও সংজ্ঞার কথা আগে আলোচনা করব।

কনিষ্ঠপদ বা আদ্যমূল ঃ যে-সংখ্যার বর্গ ঐচ্ছিক রাশি দ্বারা গুণনের পর অন্য একটি ঐচ্ছিক রাশির যোগ বা বিয়োগ দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়ে বর্গমূল নির্ণীত হয়, তাকে **কনিষ্ঠপদ** বলে।

জ্যেষ্ঠ মূল ঃ অন্যান্য প্রক্রিয়ায় যে বর্গমূল নির্ণীত হয়, তাকে **'অন্ত্যমূল'** বা **জ্যেষ্ঠমূল** বলে।

উদ্বর্তক : যদি উভয় প্রকার মূলের কোন সাধারণ গুণক থাকে, তাকে উদ্বর্তক বলে।

অপবর্তক : যদি উভয় মূল দ্বারা বিভাজ্য কোন সংখ্যা থাকে, তাকে অপবর্তক বলে।

আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থে বর্গ-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর একটি উপাত্ত হলো :

> মূলং দ্বিধেষ্টবর্গাদ্ গুণকগুণাদিষ্টযুত বিহীনাচ্চ।
> আদ্যবধো গুণকগুণঃ সহান্ত্যঘাতেন কৃতমন্ত্যম্ ॥
> বজ্রবধৈক্যং প্রথমং প্রক্ষেপঃ ক্ষেপবধতুল্যঃ।
> প্রক্ষেপশোধকহৃতে মূলে প্রক্ষেপকে রূপে ॥

"অর্থাৎ ইষ্ট বর্গকে গুণক দিয়ে গুণ করার পর অন্ত ইষ্ট যোগ বা বিয়োগ কর। তারপর মূলাকর্ষণ কর। এইভাবে দুবার কর। প্রথম দুটি বীজের গুণফলকে প্রকৃতি (N) দিয়ে গুণ করে দ্বিতীয় বীজদ্বয়ের গুণফল যোগ কর। তা হলে (নতুন) দ্বিতীয় বীজ পাওয়া যাবে। প্রথম দুটি বীজ এবং দ্বিতীয় দুটি বীজের বজ্র গুণন করে তারপর যোগ কর। তা হলে (নূতন) দ্বিতীয় বীজ পাওয়া যাবে। প্রথম দুটি বীজ এবং দ্বিতীয় দুটি বীজের বজ্র গুণন করে তারপর যোগ কর। তা হলে প্রথম (নূতন) বীজ পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেপটি পূর্বের ক্ষেপদ্বয়ের গুণফল হবে।" (প্রা. ভা. গ. চ.)

ধরা যাক, k ও k'-এর সুবিধাজনক মানের জন্য (α, β) ও (α', β') $Nx^2+k=y^2$ ও $Nx^2+k'=y^2$ সমীকরণ দুটির এক প্রস্থ বীজ। ব্রহ্মগুপ্তের উপাত্ত অনুসারে $Nx^2+kk'=y^2$-এর বীজ হবে,—

$$x=\alpha\beta'\pm\alpha'\beta$$
$$y=\beta\beta'\pm N\alpha\alpha'$$

॥ চক্রবাল ॥

খুব সম্ভব **'চক্রবাল'** পদ্ধতির আবিষ্কারক হচ্ছেন ভাস্কর। কারণ, এই পদ্ধতি তাঁর পূর্বে দেখা যায়নি। $Nx^2+1=y^2$ সমীকরণে N অবর্গ সংখ্যা হলে, এই সমীকরণের সাধারণ ধনাত্মক অখণ্ড সমাধান করতে একটি সাহায্যকারী সমীকরণের প্রয়োজন। এই সমীকরণটি $Na^2+k=b^2$, এখানে a ও b ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা, এবং $k=\pm1$, ±2 এবং ±4

ভাস্কর $67x^2+1=y^2$ ও $61x^2+1=y^2$, এই সমীকরণ দুটি চক্রবাল পদ্ধতিতে অতি সংক্ষেপে ও সহজে সমাধান করেছেন। বিশেষ করে শেষের সমীকরণটির একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। এই সমীকরণটির সমাধানের জন্য নাকি বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ফেরমা ফেঁসিলেকে চ্যালেঞ্জ করেন। আর এই সমীকরণটির x ও y-এর যে ক্ষুদ্রতম বীজ পাওয়া যায়, তা যথাক্রমে নয় ও দশ অঙ্কবিশিষ্ট রাশি। ল্যাগরেঞ্জের পদ্ধতিতে এর সমাধান আরো জটিল। যাই হোক, x ও y-এর ক্ষুদ্রতম বীজ দুটি যথাক্রমে **226, 153, 980** এবং **1, 766, 319, 049.**

॥ দুটি ঐতিহাসিক অপলাপ ॥

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি ভারতে একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ খুবই প্রাচীন। অনেক আগে থেকে এর অস্তিত্ব আছে, এবং যুগক্রম পরম্পরায় গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে সাধারণ সমাধান দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ-বিষয়ে যিনি প্রথম সাফল্য অর্জন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে আর্যভট। কিন্তু গণিতের ইতিহাসে এটি **"ডায়োফ্যান্টীয় সমীকরণ"** নামে খ্যাত। আমাদের মনে হয়, ভারতীয় গণিতে অজ্ঞতার জন্য ঐতিহাসিকদের এই ত্রুটি ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডায়োফ্যান্টাস খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তা ছাড়া তিনি যে ধরনের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেইটি এর এক বিশেষ রূপ। সাধারণীকরণের সব কৃতিত্বই ভারতীয় গণিতজ্ঞদের প্রাপ্য,—বিশেষ করে আর্যভটই সর্বপ্রথম সুষ্ঠু আলোচনার সূত্রপাত করেন। গ্রীক ও ভারতীয় অনির্ণেয় সমীকরণের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিষয়ে ক্যাজরি বলেন,—**"The Hindoo indeterminate analysis differs from the Greek not only in method, but also in aim."** তাই, আমাদের প্রস্তাব এই সমীকরণের প্রকৃত নামকরণ করা উচিত **'আর্যভটীয় সমীকরণ'**। তা হলে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক অপলাপ বা ত্রুটি সংশোধিত হয়, তেমনি প্রকৃত আবিষ্কারক ও পথিকৃৎ যোগ্য সমাদর ও সম্মান লাভ করেন।

আর একটি অপলাপ দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণকে কেন্দ্র করে। ইউরোপে এই সমীকরণ **'পেলীয় সমীকরণ'** নামে অভিহিত। এই ত্রুটি অবশ্য লিওনার্ড অয়লারের ভুলেই ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডঃ পেল **(Pell)** তাঁর একটি বীজগণিত গ্রন্থে এই সমীকরণের উল্লেখ করেছেন। এ-বিষয়ে এফ. ক্যাজরির প্রস্তাব হচ্ছে এর প্রকৃত নাম হওয়া উচিত **'হিন্দু-সমস্যা' (Hindoo problem)**।

ডঃ শ্রীনিবাসিয়েঙ্গার প্রস্তাব করেছেন, এর নাম হওয়া উচিত **'ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্কর সমীকরণ'**। ডঃ শ্রীনিবাসিয়েঙ্গার প্রস্তাব অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, ব্রহ্মগুপ্ত এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির আবিষ্কারক হলেও ভাস্কর এর প্রভূত উন্নতিসাধন করেন ও সাধারণীকরণের মধ্যে আনেন। তা হলেও আমাদের প্রস্তাব এই সমীকরণ **'ব্রহ্মগুপ্ত সমীকরণ'** :নামে আখ্যাত হোক। কারণ, প্রথম সম্মান আবিষ্কারক ও পথিকৃৎ-এর প্রাপ্য।

॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

"The invention of Sunya or 'O' liberated the human intellect from the prison bars of the counting-frame."

—L. Hogben.

॥ শূন্য ॥

বিশ্ব-গণিতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি ঘটনা,—দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন ও শূন্য আবিষ্কার। বস্তুত, একে মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল না বলে আজ আর উপায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়,—কে, কবে এবং কোথায় এই আবিষ্কার করেছিলেন, তার কোন লিখিত প্রমাণ আজও আমাদের হস্তগত হয়নি। তবে এই মহত্তম দুটি আবিষ্কার যে ভারতীয় হিন্দুরা করেছিলেন, আজ আর সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। গণিতে কোন-না-কোন আবিষ্কারের পিছনে থাকে সুস্পষ্ট কোন সমস্যা বা ঘটনা। বিশেষ করে জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের একটি ক্রমবিকাশ দেখা যায়। কিন্তু 'শূন্য' আবিষ্কার কোন্ সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এর আবিষ্কারে দার্শনিকদের অবদান বেশী না গণিতজ্ঞদের কৃতিত্ব বেশী, এ-সম্বন্ধে বেদবাক্যস্বরূপ কিছু বলা যায় না।

॥ শূন্যের প্রাচীনতা ও দার্শনিক তাৎপর্য ॥

অধিকাংশ পাশ্চাত্য গণিতের ঐতিহাসিকরা শূন্য আবিষ্কারে ভারতীয় মনীষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও, তাঁরা সবাই এই আবিষ্কারের উদ্ভব-কাল খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ঘটনা বলে মনে করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ-বিষয়ে আমাদের কোন লিখিত প্রমাণ নাই। তা হলেও প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-দর্শন-সাহিত্য প্রভৃতিতে শূন্যের উল্লেখ থেকে মনে হয় শূন্য আবিষ্কার খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দীর ঘটনা।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ শূন্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ওই গ্রন্থে 'শূন্য-নিবেশন', 'শূন্যপাল', 'শূন্য-স্থান' ইত্যাদি শব্দের

ব্যবহার থেকে মনে হয় বিষ্ণুগুপ্তের সময় "শূন্য"-এর প্রচলন যথেষ্ট ছিল। শুধু তাই নয়, 'শূন্যপাল' শব্দের অর্থ থেকে মনে হয় ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অজ্ঞাতরাশি বোঝাতে শূন্যের ব্যবহার কৌটিল্যের যুগের বহু পূর্ব থেকেই করে আসছেন। 'বকশালী পাণ্ডুলিপি'-তেও যে এর প্রমাণ আছে, তার দৃষ্টান্ত তো আগেই দেওয়া হয়েছে। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক 'শূন্য-নিবেশন' ও 'শূন্যপাল' শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে "শূন্য বা কর্ষণাদির অযোগ্য ভূমিতে কৃষকাদির নিবাসাদির রচনা" এবং "যুদ্ধকালে প্রবৃত্ত রাজার অনুপস্থিতিতে শূন্য রাজধানীর পালক" বলেছেন। বস্তুত এখানে গাণিতিক শূন্যের সঙ্গে কৌটিল্যের ধারণার অমিল নাই।

অধ্যাপক হলস্টেড শূন্যকে নির্বাণ-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যই তুলনাটি যেমন সার্থক তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্বের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। জানি না, বুদ্ধদেব তাঁর নির্বাণের ধারণা এই গাণিতিক শূন্য থেকেই পেয়েছিলেন কিনা। তথাগত নির্বাণের ধারণা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, "তাঁহার অতি গভীর অনুভূতিতে তিনি যে সুদূরের (অর্থাৎ দেশ-কালের অতীত সত্তার) সন্ধান পান, তা তর্ক দ্বারা বুঝা যায় না, কেবল বোধিতে বোধগম্য হয়।" (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন—ডঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) এই ধারণার উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর 'শূন্যবাদ' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 'শূন্যবাদ' বলতে সাধারণত "জগতে কোন সৎবস্তু নাই, সবই শূন্য ও নিরুপাখ্য বা অসৎ পদার্থ" বুঝায়। বস্তুর প্রকৃত সত্তার অনির্বচনীয়তাই শূন্যবাদের মূলকথা। গাণিতিক শূন্যও এক হিসাবে অনির্বচনীয়,—ভাষায় প্রকাশ প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কাব্য-সাহিত্যেও শূন্যের বিন্দুরূপটি লক্ষ্য করা যায়। সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে 'শূন্য বিন্দু'-র উল্লেখ আছে। কাদম্বরীর নায়ক তো যৌবনে আবার 'বিন্দুমতী' খেলতেন। প্রাচীন দার্শনিক ও কবিদের এই সব উদাহরণ থেকে মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে অন্তত বুদ্ধের পূর্বেই শূন্যের আবির্ভাব হয়ে থাকবে।

॥ শূন্যের গাণিতিক তাৎপর্য ॥

এ-কথা সত্য, মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতিতে শূন্য অভূতপূর্ব স্বরৎ সৃষ্টি করেছিল,—মানব-মনীষার মুক্তি দিয়েছিল। দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখনের সুবিধার মধ্যেই ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের ব্যবহার সীমিত রাখেননি,

এর গাণিতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট মনীষা নিয়োজিত করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের দার্শনিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে গণিতের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি রেখে একে সংখ্যা হিসাবে গণ্য করেছেন। আর্যভট কর্তৃক প্রদত্ত বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের সূত্রের মধ্যে শূন্যের ব্যবহারিক দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে; ব্রহ্মগুপ্ত শূন্যের সহিত মৌলিক প্রক্রিয়াগুলির সম্বন্ধের উল্লেখ করেছেন; ব্রহ্মগুপ্তের উত্তরসূরীরা মৌলিক প্রক্রিয়াগুলিতে শূন্যের ব্যবহার বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট মন্তব্য করে এর তাৎপর্য ব্যক্ত করেছেন। এমন কি, পাটীগণিত ও বীজগণিতে শূন্যের পৃথক পৃথক তাৎপর্যের উল্লেখ থেকে মনে হয়, তাঁরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

॥ শূন্যের পাটীগাণিতিক তাৎপর্য ॥

শূন্য বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে সূত্রাদিও আছে। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের দ্বারা যোগ, বিয়োগ ও গুণের বিষয় সুন্দর আলোচনা করেছেন, কিন্তু ভাগ সম্পর্কে তেমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট আলোচনা নাই বললেই চলে। তবে পাটীগণিতে ও বীজগণিতে যে শূন্যের ব্যবহার একটু ভিন্ন প্রকার, তাতে সন্দেহ নাই। তাই গণিত-কৌমুদীর লেখক নারায়ণ পণ্ডিত বলেছেন, পাটীগণিতে শূন্যের দ্বারা ভাগের কোন অর্থ হয় না, সেজন্য এখানে আলোচিত হলো না। কিন্তু যেহেতু বীজগণিতে এর অর্থ হয়, তাই সেখানে উল্লেখ করা হলো। দ্বিতীয় আর্যভট তাঁর মহা-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে বলেছেন, শূন্যকে কোন সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করলে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে, এবং বিয়োগের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। শূন্য দ্বারা গুণের ফল হবে শূন্য। ব্রহ্মগুপ্ত একই কথা বলেছেন। এ-সব তথ্য থেকে এটা অতি স্পষ্ট যে, ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের পাটীগাণিতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

॥ শূন্যের বীজগাণিতিক তাৎপর্য ॥

এ-সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের ধারণা ও সূত্রাদি উল্লেখ করার মত। তাঁর যোগের সূত্রটি নিম্নরূপ:

> **ধনয়োর্ধনমৃণমৃণয়োর্ধনর্ণয়োরন্তরং সমৈক্যং খম্।**
> **ঋণৈক্যং চ ধনমৃণধনশূন্যয়োঃ শূন্যয়োঃ শূন্যম্॥**

"অর্থাৎ ধনাত্মক রাশিগুলির যোগ ধনাত্মক, ঋণাত্মক রাশিগুলির যোগ

ঋণাত্মক।.......ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক একই রাশির যোগ শূন্য হবে। ঋণাত্মক রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ঋণাত্মক হবে। ধনাত্মক রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ধনাত্মক হবে। দুটি শূন্য যোগ করলে শূন্য হবে।" (প্রা. ভা. গ. চ.)

আধুনিক গণিতের ভাষায়,—

$a-a=0$; $a+0=+a$; $-a-0=-a$; $0+0=0$

গুণনের ক্ষেত্রে শূন্যের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শূন্য ও ধনরাশি, শূন্য ও ঋণরাশি এবং শূন্য ও শূন্যের গুণফল সর্বদা শূন্য হবে। তাঁর সূত্র :

শূন্যর্ণয়োঃ খধনয়োঃ খশূন্যয়োর্বা বধঃ শূন্যম্।

অর্থাৎ $a\times0=0$; $-a\times0=0$; $0\times0=0$

ভাগ সম্পর্কেও ব্রহ্মগুপ্তের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। এ-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে, শূন্য দ্বারা শূন্যকে ভাগ করলে ভাগফল শূন্য হয়; ধনরাশি বা ঋণরাশিকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 'তচ্ছেদ' অথবা শূন্য অথবা লব হরকে $\frac{0}{a}$ দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত $\frac{\pm a}{0}$—কে 'খ-ছেদ' বলেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর সূত্রটি উদ্ধৃত হলো।

ধনভক্তং ধনমৃণহৃতমৃণং ধনং ভবতি খং খভক্তং খম্
ভক্তমৃণেন ধনমৃণং ধনেন হৃতমৃণমৃণং ভবতি।
খোদ্ধৃতমৃণং ধনং বা তচ্ছেদং খমৃণধনবিভক্তং বা
ঋণধনয়োর্বর্গঃ স্বং খং খস্য পদং কৃতির্যত্ তৎ।

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ বিষয়ে ভাস্করের ব্যাখ্যাও ব্রহ্মগুপ্ত অনুসারী। তবে শূন্যরূপী ভাজকের ক্ষেত্রে তাঁর মত বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। তিনি বলেছেন, শূন্য দ্বারা ভাগ অশেষ হয়; শূন্যের ক্ষেত্রে শূন্য হলেও শূন্য গুণকরূপে থাকবে; আর শূন্যকে ভাজকরূপে ধরলে অবিকৃত রাশি যা উহ্য আছে তা অপরিবর্তিত থাকবে।

কোন সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগের ক্ষেত্রে মহাবীরের একটি ভুল সিদ্ধান্ত আছে। তিনি বলেছেন, কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যাটির কোন পরিবর্তন হবে না।

॥ শূন্য ও ইপসিলন ॥

আধুনিক অতি অতি ক্ষুদ্র মান একটি গ্রীক বর্ণ ইপসিলনের (ϵ) সাহায্যে

প্রকাশ করার রীতি আছে। এ-যে কত ছোট, তা কেবল কল্পনার সাহায্যেই করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, কখনো কখনো শূন্য ও ইপসিলনকে পৃথক করা বেশ মুস্কিলের। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ইপসিলনের স্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়া গেলেও ব্রহ্মগুপ্তের একটি উক্তি থেকে ধারণা করা যায় যে, হয়তো এই গণিতাচার্যের শূন্যের অতি ক্ষুদ্র মান সম্পর্কে ধারণা ছিল। তিনি $a \div 0$ এবং $0 \div a$ এর ভাগফল দুটিকে $\frac{a}{0}$ এবং $\frac{0}{a}$ এই আকারে রেখে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কেন এরূপ আকারে রেখে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন, তার কোন ব্যাখ্যা বা যুক্তি দেননি। সর্ববিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করে সুধীমণ্ডলীতে সশ্রদ্ধ খ্যাতি অর্জন করার প্রবণতার ফলে প্রাচীন ভারতের গণিতের অনেক বিষয় রহস্যমণ্ডিত রয়ে গেছে, এবং তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

যাই হোক, ব্রহ্মগুপ্ত আমাদের রহস্যের মধ্যে ফেললেও আচার্য ভাস্কর কিন্তু শূন্যের অতি ক্ষুদ্রতম মান (ϵ) সম্পর্কে আমাদের কিছুটা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তিনি $a \times o$='খ-গুণ' বলেছেন; গুণফলটির মান শূন্য বলেননি। তা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা গাণিতিক গণনা থেকে মনে হয় তিনি ϵ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর এ-সম্পর্কিত সূত্র :

খহরঃ স্যাৎ খগুণঃ খং খগুণশ্চিন্ত্যশ্চ।

॥ শূন্য ও অনন্ত ॥

জৈন গণিতজ্ঞদের কাল ও সংখ্যা বিভাগের বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে মনে হয় অনন্ত (∞) সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল। ভাস্কর শূন্য দ্বারা বিভাজিত কোন সংখ্যার ভাগফল 'খ-হর' বলেছেন। অর্থাৎ $\frac{a}{o}$='খ-হর'। ব্রহ্মগুপ্ত কথিত 'খ-ছেদ' ও 'খ-হর' সমার্থক বলে মনে হয়। আচার্য ভাস্করের মতে এই খ-হরের সঙ্গে কোন-কিছু যোগ বা বিয়োগ করলে তার মানের কোন পরিবর্তন হয় না। এ-বিষয়ে ভাস্করের ব্যাখ্যা দার্শনিক মনের পরিচায়ক ও ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী। তিনি বলেছেন, অনন্ত শ্রীভগবানের মধ্যে অসংখ্য জীবের জন্ম ও ধ্বংস হচ্ছে; কিন্তু তাতে তাঁর কোন পরিবর্তন সূচিত করে না। অর্থাৎ অনন্ত বা অসীমে কোন-কিছু যোগ-বিয়োগে কিছু আসে যায় না। এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই মনে হয় ভাস্কর $\frac{a}{o}=\infty$, এবং $\infty \pm k=\infty$ বলেই জানতেন।

ভাস্করোত্তর যুগের ভাষ্যকার গণেশ মন্তব্য করেছেন $\frac{a}{0}$ অনির্দিষ্ট, অসীম, অনন্ত-রাশি। কারণ, এই রাশিটি যে কত বড় তা নিরূপণ করা যায় না। ভাষ্যকার কৃষ্ণ বলেছেন, এ-ক্ষেত্রে ভাগফল কত বড় তা নির্দিষ্ট করা যায় না বলে অনন্ত বলে ধরে নিতে হবে।

মধ্যযুগের গণিতজ্ঞরা শূন্যের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত চিহ্ন ও সঙ্কেতের অভাবে এর সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি। যেমন,—

আধুনিক গণিতে $\underset{\epsilon \to 0}{Lt} \frac{a.\epsilon}{\epsilon} = a$, এই সম্পর্কটি বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ভাস্করের সময় এরূপ কোন প্রতীক ও চিহ্ন না থাকায়, তিনি অন্যভাবে এই একই গাণিতিক ধারণা কাজে লাগিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ভাস্করের একটি অঙ্ক উদ্ধৃত হলো :

উদাহরণ ঃ কঃ খগুণো নিজার্ধযুক্ত স্ত্রিভিশ্চ গুণিতো খহৃতস্ত্রিষষ্টিঃ।

অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করে সংখ্যাটির অর্ধেক যোগ করে তার তিনগুণকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে 63 হবে ?

ভাস্করের পদ্ধতি ঃ "অজ্ঞাতো রাশিস্তস্য গুণঃ 0। সার্ধঃক্ষেপঃ $\frac{1}{2}$ গুণঃ। 3। হর। 0 দৃশ্যং। 63। ততো বক্ষ্যমাণেন বিলোম বিধিনা ইষ্টকর্মণা বা লব্ধো রাশিঃ 14।"

অর্থাৎ একটি অজ্ঞাতরাশি নেওয়া হলো, একে শূন্য দ্বারা গুণ করে $\frac{1}{2}$ যোগ করা হলো ; এবার একে 3 দিয়ে গুণ করা হলো, শূন্য দিয়ে ভাগ করা হলো। এখন রাশিটি 63। বিপরীত প্রণালী বা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী রাশিটি 14 হবে।

আধুনিক গণিতের ভাষায় অঙ্কটি প্রকাশ করলে,—

$$\frac{x\times 0+\frac{x\times 3}{2}}{0}=63$$

ভাস্কর x-এর মান দিয়েছেন 14

স্পষ্টত এখানে শূন্যকে শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় নি। নিঃসন্দেহে এখানে $0=\epsilon$ বা অনুরূপ ধারণা।

॥ আধুনিক কবির ভাষায় শূন্য ॥

শূন্যের কত না বৈচিত্র্য ! গণিতজ্ঞদের কাছে এর এক রূপ, দার্শনিকদের কাছে আবার আর এক রূপ। কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় রসঘন রূপের প্রকাশ ঘটে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার 'ভারতী' পত্রিকায় 'শূন্য' নামে একটি কাব্যরসমণ্ডিত প্রবন্ধ লেখেন। শূন্যের নানা আলোচনার শেষে 'মিষ্টান্ন ইতরে জনা' করা যাক না কেন। কবির ভাষায়,—

"এক একজন লোক আছে তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে একটা শূন্য (০) মাত্র ; কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয় তখনি দশ (১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে। সংসারে শত সহস্র শূন্য আছে বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে—তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না। কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। এই সকল শূন্যদের এক মহা দোষ যে, পরে বসিলে ইহারা ১-কে ১০ করে বটে কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়ম অনুসারে ১-কে তাহার শতাংশে পরিণত করে (·০১) অর্থাৎ ইহারা অন্যের দ্বারা চালিত হইলেই চমৎকার কাজ করে বটে, কিন্তু অন্যকে চালনা করিলে সমস্ত মাটি করে। ইহারা চমৎকার সৈন্য যে মন্দ সেনাপতিকেও জিতাইয়া দেয় কিন্তু এমন খারাপ সেনাপতি যে ভাল সৈন্যদেরও হারাইয়া দেয়। স্ত্রী-মর্যাদা অনভিজ্ঞ গোঁয়ারগণ বলেন, স্ত্রীলোকেরা এই শূন্য। ১-এর সহিত যতক্ষণ তাহারা যুক্ত না হয় ততক্ষণ তাহারা শূন্য। কিন্তু ১-এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১-কে এমন বলীয়ান করিয়া তুলে যে সে দশের কাজ করিতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১-এর পূর্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১-বেচারীকে তাহার শতাংশে পরিণত করেন। স্ত্রৈণ পুরুষদের এক নাম ·০১।"

বলা বাহুল্য, এখানে ক্ষুদ্রতম সংযোজনও নিষ্প্রয়োজন। তবে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে একটি কথা আছে "দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ", এটি বোধ হয় শূন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

॥ ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় গণিতের কাল ॥

প্রমাণপঞ্জীর অভাবে ভারতীয় গণিতের প্রাচীনতা বিষয়ে অনেক জায়গায় সংশয়ের অবকাশ আছে। এই সংশয় থেকে মুক্তি পাবার যে খুব বেশী সম্ভাবনা আছে, তা মনে হয় না। কিন্তু ভারতীয় গণিতে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দের বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে অনেক জায়গায় সংশয়ের অবসান হতে পারে বলে মনে হয়। এ-বিষয়ে সুধীমণ্ডলী একটু ভেবে দেখতে পারেন। আবার, প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ব্যবহৃত অনেক পারিভাষিক শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা

এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাপক, দীর্ঘ ও শ্রমশীল গবেষণা চালালে এরও সমাধান হতে পারে। যেমন—ভারতীয় গণিতে 'গোমূত্রিকা' পদ্ধতি নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। গণিতের ঐতিহাসিকরা কেবল স্থূল অর্থ গোমূত্রের ন্যায় তির্যক বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই অর্থ একান্তই স্থূল,—এর আরো কোন গভীরতর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থাকতে পারে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গোমূত্রিকা-এর উল্লেখ আছে, এবং যে অর্থে সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, গণিতে ব্যবহৃত শব্দটির সঙ্গে তার ব্যুৎপত্তিগত মিল আছে বলে মনে হয়। অর্থশাস্ত্রে গোমূত্রিকা 'বিভিন্নাকারে ব্যূহনির্মাণ' অর্থে ব্যবহৃত। গণিতে এই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্যূহরচনা এলোমেলোভাবে হয় না,—গোমূত্রিকার স্থূল আকারের মত হয়।

আর্যসভ্যতা যে মিশ্র সভ্যতা, এতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ মত পার্থক্য নাই। আর্য পূর্ব বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্বীকরণ করে ভারতীয় আর্যসভ্যতার বিকাশ। তাই আর্যভাষার মধ্যে নানা গোষ্ঠীর ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বহু শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই ভাষার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সাধারণের চোখে সে-সব শব্দ ধরা না পড়লেও কিছু কিছু শব্দ ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আচার্য সুনীতিকুমার, জাঁ পশিলুস্কি ও সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখের অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ বিষয়ে গবেষণা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। জাঁ পশিলুস্কির **Vigesimal Numeration in India** এবং **Bengali Numeration and Non-Aryan Substratum** প্রবন্ধ দুটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্রথম প্রবন্ধে পশিলুস্কি ভারতে বিংশতি-ভিত্তিক সংখ্যা গণনার মূল উৎস নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ভিত্তি করে বিংশতি-ভিত্তিক গণনার উদ্ভব। মানুষের হাতে-পায়ে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে আঙুল মিলে কুড়ি (20) সংখ্যাটির আবির্ভাব। সে-কারণে 20 ও মানুষ সমার্থক, এবং 20-র উপর ভিত্তি করেই অস্ট্রে-এশীয় গোষ্ঠীভূত ভাষাভাষীদের উচ্চতর সংখ্যা-গণনা রচিত হয়েছে।

শাস ও খড়-এর হিসাব রাখার ব্যাপারে এই পদ্ধতির আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—পণ=এক আনা=4 পয়সা=80 কড়ি=80। অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর সাঁওতালী ভাষায় 'পণ' শব্দের অর্থ 80। 'বার পণ গাছি' =160 আঁটি ধানবীজ। এখানে, 'বার'=2, 'পণ'=80। আবার

সাঁওতালীতে 'পণ'=4, 'পণ' 20 র চতুর্গুণ হিসাবে হয় বলে ভাষাতাত্ত্বিকদের মত। এ কারণে সংক্ষিপ্ততার জন্য 80 কে 4 বলে মনে করা হতো। সাঁওতালী 'পণ'-এর সঙ্গে আমাদের 100-এর কোন পার্থক্য নাই। 4 এবং 20-র গণনা রীতি থেকেই পণ-এর প্রবর্তন হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

সাঁওতালী গণনায় দেখা যায়, পণ=80, 20 গণ্ডা=1 পণ, এবং গণ্ডা=4; নিঃসন্দেহে 4-সংখ্যাটি এই পদ্ধতিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যেমন,—

গণ্ডা	কুড়ি	পণ
4	20	80
	(5×4)	(20×4)

সংস্কৃতে গণ্ডক শব্দের অর্থ চার কৌড়ি বিশিষ্ট মুদ্রা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কৌড়ির মুদ্রা হিসাবে ব্যবহারের রীতি নাই। ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ রীতির প্রচলন ছিল। এই তথ্য থেকে পশিলুস্কি সিদ্ধান্ত করেছেন 'গণ্ডা' অস্ট্রো-এশীয় শব্দ। সুতরাং এরূপ বলা যেতে পারে, ভারতীয় গণিতে 'গণ্ডা' বা গণ্ডকের ব্যবহার এর সুপ্রাচীনতা প্রতিপন্ন করছে।

অজ্ঞাতরাশি অর্থে প্রাচীন ভারতীয় গণিতে 'যাবৎ-তাবৎ'-এর ব্যবহার দেখা গেছে। এই শব্দটিও অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষায় কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়ে এরূপ শব্দদ্বৈত গঠন লক্ষ্য করা যায় না। অধিকন্তু, এটি অস্ট্রো-এশীয় বৈশিষ্ট্য। সিলভ্যাঁ লেভির এই গবেষণা থেকে এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় গণিত কেবলমাত্র আর্যসভ্যতার ফসল নয়, এতে আর্যপূর্ব সভ্যতার অবদানও আছে।

আচার্য সুনীতি কুমারের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, অনেক বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি শব্দের উৎস অস্ট্রো-এশীয় ভাষা,—কোল বা মুণ্ডা থেকে। সংস্কৃত বিংশ সংখ্যার বাংলা রূপ বিস, বিশ ও কুড়ি। পশিলুস্কি দেখিয়েছেন, সংস্কৃত কোটি থেকে কুড়ি-র উদ্ভব হয়নি,—হয়েছে অস্ট্রো-এশীয় ভাষা থেকে। বাংলা ভাষায় বিংশতি- ও গণ্ডা-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা এখনো দেখা যায়। পল্লীবাংলার অশিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষ করে মহিলারা এখনো তেইশ বোঝেন না, কিন্তু এক কুড়ি তিন বোঝেন, এবং দশ বোঝেন না, দু গণ্ডা দুই বোঝেন।

4-সংখ্যার যে বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে, তা কেবল অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যই নয়, ভারতীয়-আর্য ভাষায় একক ব্যবহারেও অনুরূপ রীতি দেখা যায়। এখানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে একটি এককের তালিকা দেওয়া হলো :

8 পরমাণু=1 বিপ্রুট
(=2×4)
8 বিপ্রুট=1 লিক্ষা
(=2×4)
8 লিক্ষা=1 যুকামধ্য
(=2×4)
8 যুকামধ্য=1 যবমধ্য
(=2×4)

8 যবমধ্য=1 অঙ্গুল
(=2×4)
4 অঙ্গুল=1 ধনুর্গ্রহ
8 অঙ্গুল=1 ধনুর্মুষ্টি
(=2×4)
12 অঙ্গুল=1 বিতস্তি
(=3×4)
24 অঙ্গুল1= অরত্নি
(=6×4)

বিংশতি-ভিত্তিক সংখ্যা গণনায় এককও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় :

40 হস্ত=1 রজ্জু
(=2×20)
80 হস্ত=1 পরিদেশ
(=4×20)
120 হস্ত=1 নিবর্তন
(=6×20)

পরিতাপের বিষয়, এরূপ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। এমন কি, ভারতীয় সভ্যতা কতখানি অনার্য সভ্যতার কাছে ঋণী, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের নিরাশ করেছে। বিদেশী পণ্ডিতরা বার বার আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন, কিন্তু আমরা শ্রমবিমুখ, ভাগচাষের ফসল পেতেই আগ্রহী। কেবল তাই নয়, আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা যা অনার্য সভ্যতার কাছে অনেকাংশে ঋণী স্বীকার করলে 'জাত' যাবার ভয়ে আমরা অনেকেই নির্বাক। এ-বিষয়ে মনস্বী সিলভ্যাঁ লেভির মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য: The daring and skill of these men she was unable to appreciate before and she continued to ignore all that she owed to them."

অনার্য-আর্য সভ্যতার সমগ্র ফসলই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি,—উত্তরাধিকার। কেবল কৌতূহল নয়, জানার জন্যই জানা নয়, আত্মার সংস্কারের জন্যও তা জানার দরকার আছে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে,—**আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি....আত্মানং সংস্কুরুতে।** একটি জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায় তার উত্তরাধিকার, কুলশীল, তার চর্যা ও চর্চার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,—"....মানুষ যখন তার নিজের কালের প্রশ্ন, সমস্যা ও দায়-দায়িত্বের সম্মুখীন হয়, তখন স্বভাবতই সে তার প্রেরণা, উত্তর ও সমাধান খোঁজে তার অতীতের উত্তরাধিকারের মধ্যে। তার ভেতর সে কিছু প্রেরণা, কিছু উত্তর নিশ্চয়ই পেতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি কিছুতেই নয়, কারণ অতীত কিছুতেই একই রূপে ও আকৃতিতে পুনরাবর্তিত হয় না ; কালধর্মের নিয়মেই তা নয়।...যাই হোক, এ ইঙ্গিতটি পরিষ্কার যে, প্রত্যেকটি মানব-বংশকে, প্রত্যেকটি কালকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয় তার কুল বা উত্তরাধিকারকে.... ।...এই শীলাচরণই মানুষের উত্তরাধিকার বা অতীত, অন্যার্থে কুল-চেতনার পরিচয়, বর্তমান-চেতনার পরিচয়, ভাবী কাল সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয়।"

* * * *

এল. হগবেন বলেছেন,—গণিতের ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার দর্পণ (**The history of mathematics is the mirror of civilization.**)। আমাদের তৈরী এই ক্ষুদ্র দর্পণে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রূপরেখা দেবার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। শুধু তাই নয়,—আজকের পুরোপুরি বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার যুগে যে গণিতের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। পঞ্চাশের দশকের পর বাংলাদেশে যেন গণিতের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার অভাব বেশী করে দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় গণিতের অবাধ অধিকার ও বিচরণ। একথা সত্য, আগের চেয়ে এখন গণিত বহুল পরিমাণে বিমূর্ত—বাস্তবের সঙ্গে এর ছোঁয়া আর নাই বললেই চলে। কিন্তু সেটাই তো মানুষের অনন্যসাধারণ ক্ষমতার গৌরব। এই গৌরব ও মর্যাদার দিকটি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ গণিতাচার্যরা সম্যকরূপেই উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য তখন আজকের মত বিশুদ্ধ গণিতের চর্চা ব্যাপকভাবে হয়নি, আর সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্ভবও ছিল না। ভারতে গণিতের চর্চা মূলত—

* কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃ—33

জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। যে-দেশের সমাজ-রাষ্ট্র ধর্মীয় নীতির অনুশাসনে পরিচালিত হতো, সে-দেশে যে জ্যোতিষ তথা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষ মর্যাদা পাবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

সিদ্ধান্ত-শিরোমণি-র গণিতাধ্যায়ে আচার্য ভাস্কর জ্যোতিষের প্রশংসা করে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন; তিনি মানুষের দেহের সঙ্গে বেদ সহায়ক শাস্ত্রাদির তুলনা করেছেন। আমরা তাঁর কথাই দু-একটি পরিবর্তন করে বলতে পারি,—

শব্দশাস্ত্রং মুখং 'গণিতং' চক্ষুষী
শ্রোত্রমুক্তং নিরুক্তং চ কল্পঃ করৌ।
যা তু শিক্ষাস্য বেদস্য সা নাসিকা
পাদপদ্মদ্বয়ং ছন্দ আদৈর্বুধৈঃ॥
বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং 'গণিতং'
মুখ্যতা চাঙ্গমধ্যেঽস্য তেনোচ্যতে।
সংযুতোঽপীতরৈঃ কর্ণনাসাদিভি-
শ্চক্ষুষাঙ্গেন হীনো ন কিঞ্চিৎকরঃ॥
... ...
যো 'গণিতং' বেত্তি নরঃ স সম্যগ্-
ধর্মার্থকামান্ লভতে যশশ্চ॥

অনুবাদঃ ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্র বেদের মুখ, গণিতকে চক্ষু, যজ্ঞোপকরণ দ্রব্যাদি-জ্ঞাপক নিরুক্ত শাস্ত্র কর্ণ, যজ্ঞ-পদ্ধতি-জ্ঞাপক কল্পশাস্ত্র হস্তদ্বয়, বর্ণোচ্চারণ ভেদ-জ্ঞাপক শিক্ষা বেদের নাসিকা এবং ছন্দ-শাস্ত্রকে বেদের পদদ্বয় নামে প্রাচীন জ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন।

গণিত বেদের চক্ষুস্বরূপ। এইজন্য এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে গণিতই প্রধান। যেহেতু কর্ণ নাসিকাদি অপর অঙ্গ সকল থাকলেও চক্ষুহীন ব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর হয়। যিনি সম্যকরূপে গণিত জানেন তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করেন।*

আমাদের বিশ্বাস প্রাচীন ভারতের গণিত এখনো শেষ হয়নি। এর মধ্যে নানা সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য এখনো ইঙ্গিতে-আভাসে অস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়ে আছে।

* মূল সংস্কৃত অংশে জ্যোতিষ স্থলে 'গণিত' লেখা হয়েছে এবং সেরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

প্রকৃত পণ্ডিত ও সুধীমণ্ডলী এসব রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারেন, কোন কোন পাশ্চাত্য গণিতের ঐতিহাসিকও একথা স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে A Concise History of Mathematics-এর লেখক D. J. Struik বলেছেন,—"Ancient India may still yield many more Mathematical treasures." আমরাও সেই treasure-এর প্রতীক্ষা করছি যা মানব-সভ্যতার উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও বিতর্কের অবসান ঘটাবে।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
অংশ	বৃত্তের 360 ভাগের এক ভাগ	Degree
ঐ	চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু	An upper vertex of a quadrilateral
অগ্র	প্রান্ত্য বা শেষ ; অবশিষ্ট বা ভাগশেষ	Tip or end ; residue or remainder
অগ্রান্তর	ভাগশেষ পার্থক্য	residue difference
অঘন	ঘন নয়	Non-cube
অধিকাগ্র	বৃহত্তর ভাগশেষ	Greater remainder
অধিকাগ্রভাগহার	বৃহত্তর ভাগশেষের পরিপ্রেক্ষিতে ভাজক	Divisor corresponding to greater remainder
অনুলোম	ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিক	Anticlockwise
অন্তর	দুইটি রাশির পার্থক্য	Difference between two quantities
অন্ত্যপদ	শেষপদ	Last term in a series
অপচয়	বিয়োজ্য	Subtractive
অক্ষয়ারজ্জু	আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের কর্ণ	The diagonal chord of a rectangle or a square
আবাধা, অবধা, বধা	ভূমির উপর তির্যক বাহুর অভিক্ষেপ	The projection of any slanting side on the horizontal
অভ্যাস	গুণন	Multiplication
অর্বুদ	10^8	10^8
অবর্গ	ক-বর্গ, চ-বর্গ ইত্যাদি নয়	—
আদি, আদিধন	প্রথম পদ	First term
আয়ত,আয়তচতুর্ভুজ	আয়তক্ষেত্র	Rectangle
আয়তবৃত্ত	উপবৃত্ত	Ellipse

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
আয়াম	দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ	Length or breadth
আয়ামক্ষেত্র	ট্রাপিজিয়াম	Trapezium
আসন্ন	আসন্ন	Approximate
ইচ্ছা, ইচ্ছারাশি	ত্রৈরাশিকের একটি ঈপ্সিত রাশি	Requisition, one of three quantities in the rule of three.
ইচ্ছাফল	ফল	Fruit corresponding to icchā
ইষ্ট	প্রদত্ত সংখ্যা	Given number
উৎসেধ	উচ্চতা	Height
উত্তর	সাধারণ অন্তর	Common difference
উদীচী	উত্তর-দক্ষিণ রেখা	North-South line
উপচিতি	সাধারণ শ্রেণী	A series in general
উভয়ত প্রযুগ	দ্বিসমদ্বিবাহু ত্রিভুজ ; রম্বস	Double isosceles triangle ; Rhombus
ঊনাগ্র-ছেদ	ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের পরিপ্রেক্ষিতে ভাজক	Divisor corresponding to smaller remainder
ঊর্ধ্বভুজা	উচ্চতা বা উল্লম্ব বাহু	Altitude or vertical side
ঋভুজ	সমরেখ ক্ষেত্র	Rectilinear figure
ঋণ	ঋণাত্মক	Negative Quantity
করণী	সমরেখ ক্ষেত্রের বাহু ; বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের বাহু	The side of a rectilinear figure ; the side of a square or rectangle
করণ	কর্ণ ; অতিভুজ	Diagonal or hypotenuse

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
কোটি	সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব	The perpendicular side of a right-angled triangle
কোটিজ্যা	চাপের কোসাইন-জ্যা	R cos of the angle
কোণ	কোণ	Angle
ক্ষয়	ঋণ, ঋণাত্মক	Minus, negative
ক্ষেত্র	বদ্ধক্ষেত্র	Closed figure
ক্ষেত্রগণিত	জ্যামিতি	Geometry
ক্ষেত্রবিভাগ	দেশ বিভাজন	Division of space
ক্ষেত্রফল	ক্ষেত্রফল, কালি	Area
ক্ষেপ	সংযুক্ত রাশি	Additive quantity
খ	আকাশ ; শূন্য	Sky ; Zero
গচ্ছ	পদসংখ্যা	Number of terms
গণিত	গণিত ; ক্ষেত্রফল ; জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা	Mathematics; area; Astronomical calculations
গ্রাস	পরস্পর ছেদী দুইটি বৃত্তের সাধারণ অংশ	The common portion of two intersecting circles.
গুণকার	গুণক	Multiplier
গুলিকা	অজ্ঞাত রাশি	A thing of unknown value
গোল	বৃত্ত ; গোলক	Circle ; sphere
ঘন	ঘন	Cube of a number
ঘনগোল	কঠিন গোলক	Solid sphere
ঘনক্ষিতিঘন	স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনশ্রেণীর সমষ্টি	Sum of the series of cubes of natural numbers
ঘনফল	আয়তন	Volume

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
ঘনমূল	ঘনমূল	Cube root
ঘাটক্ষেত্র	চিত্রাকারে গুণফল	Diagrammatic representation of multiplication product
চক্র	বৃত্ত	Circle
চতুরস্র	চতুর্ভুজ	Quadrilateral
চতুষ্কোণ	চতুর্ভুজ	Quadrilateral
চাপ, কার্মুক, ধনুস	চাপ	Arc
চাপজ্যার্ধ	——	R Sine
চাপক্ষেত্র	খণ্ড, অংশ	Segment
চিতি	স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি	Sum of a series of natural numbers
চিতিঘন	——	Sum of a series ΣΣn
চিতিবর্গ	স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি	Square of the sum of a series of natural numbers
ছেদ	হর	Denominator
জীবা	——	R Sine
জন্য	মূলদ ত্রিভুজ বা আয়তক্ষেত্র	Rational triangle or rectangle
জাত্য	মূলদ সমকোণী ত্রিভুজ	A rational right-angled triangle.
তির্যঙ্‌মানী	চতুর্ভুজের আড়াআড়িস্থিত বাহু	Transverse side of a quadrilateral
ত্রিজ্যা	ব্যাসার্ধ; পরিধির এক চতুর্থাংশ	Radius ; one fourth of the circumference.
ত্রিভুজ	ত্রিভুজ	Triangle
ত্রিসম	সমবাহু ত্রিভুজ ; সমান তিনটি	Equilateral triangle ;

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
	বাহু বিশিষ্ট ট্রাপিজিয়াম	trapezium with three sides equal.
ত্র্যস্র	ত্রিভুজ	Triangle
ত্রৈরাশিক	ত্রৈরাশিক	Rule of three
দল	অর্ধ	Half
দ্বাবিষমভুজ বা দ্বাবিষম	ত্রিবাহু	Triangle
ধন	সংযুক্ত; ধনাত্মক	Additive, positive
ধনু	চাপ	Arc
নর	শঙ্কু	Gnomon
না	রৈখিক দৈর্ঘ্যের একক	A unit of linear measure equal to four cubits
নিযুত	10^5	10^5
নিরবশেষ	সঠিক, যথার্থ	Exact
পদ	বর্গমূল ; বৃত্তের পাদ ; শ্রেণীর পদ	Square root ; quadrant of a circle ; term of a series
পরকর্ণ	বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের তৃতীয় কর্ণ	The third diameter of a cyclic Quadrilateral.
পরিনাহ	পরিধি	Circumference
পরিধি	পরিধি	Circumference
পরিমণ্ডল	উপবৃত্ত	Ellipse
পার্শ্ব	সন্নিহিত বাহু	Adjacent side
পার্শ্বমানী	চতুর্ভুজের সন্নিহিত বাহু	The adjacent side of a quadrilateral.
প্রতিলোম	ঘড়ির কাঁটার দিকে	clockwise
প্রমাণ	ত্রৈরাশিকের যুক্তি	Argument in the rule of three.

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
প্রযুত	10^6	10^6
পৃষ্ঠফল	পৃষ্ঠফল	Surface area
প্রযুগ	ত্রিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ	Triangle, an isosceles triangle.
ফল	আসলের সুদ	Interest on principal
ফলরাশি	ত্রৈরাশিকের একটি রাশি	One of the three quantities in the rule of three.
ভাগ	ভাগ	Degree
ভাগহরণ	ভাগ	Division
ভাগহার	ভাজক	Divisor
ভূ	ভূমি	Base
মণ্ডল	বৃত্ত	Circle
মতি	ঐচ্ছিক সংখ্যা	Optional number
মধ্য	কেন্দ্র ; মধ্যক ; গড়	Centre ; middle term of a series ; mean.
মুখ	শ্রেণীর প্রথম পদ , সম্মুখীন বাহু	First term in a series ; face side.
মূল	বর্গমূল ; আসল	Square root ; principal
মূলফল	সুদ	Interest
রজ্জু	পরিসীমা	Perimeter
রুন্দ্র	প্রস্থ	Breadth
রাশি	চিহ্ন ; রাশি ; বারো	Sign ; quantity ; twelve
রূপ	এক	One
লম্ব	লম্ব ; উচ্চতা ; উল্লম্ব	Perpendicular ; altitude ; vertical

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
বলয়াকার ক্ষেত্র	রিং-এর মতো ক্ষেত্র	Figure shaped like a ring.
বিমদ্‌ফল	আয়তন	Volume
বিষ্কম্ভ	ব্যাস	Diameter
বিবর	পার্থক্য	Difference
বিশেষ	পার্থক্য	Difference
বিষম চক্রবাল	উপবৃত্ত	Ellipse
বিষম	বিষমবাহু চতুর্ভুজ ; বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ	A quadrilateral with unequal sides ; a cyclic quadrilateral
বিস্তার	দৈর্ঘ্য	Length
বিস্তৃতি	ব্যাস	Diameter
বৃতি	পরিসীমা	Perimeter
বৃত্ত	বৃত্ত	Circle
বেধ	গভীরতা	Depth
ব্যাস	ব্যাস	Diameter
ব্যাসার্ধ	ব্যাসার্ধ	Radius
শঙ্কু	শঙ্কু	Gnomon
শৃঙ্গাটক	ত্রিভুজ ; চতুস্তলক	Triangle ; tetrahedron
শ্রেঢ়ীক্ষেত্র	চিত্রাকারে গাণিতিক শ্রেণী উপস্থাপন	Diagrammatical representation of a mathematical series.
শ্রোণী	ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের নিম্নভাগের শীর্ষবিন্দু	A lower vertex of a triangle or quadrilateral.
ষড়শ্রি	চতুস্তলক	Tetrahedron
সংবর্গ	গুণন	Multiplication
সমচতুরশ্র	বর্গ	Square

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
সমদলকোটি	ত্রিভুজের উচ্চতা	Altitude of a triangle
সমপরিণাহ	বৃত্তের পরিধি	Circumference of a circle.
সমবৃত্ত	বৃত্ত	Circle
সম্পর্ক	সমষ্টি	Sum
সর্বধন	শ্রেণীর সমষ্টি	Sum of a series
সবর্ণন	সমহরে পরিণত করা	Reduction to common denominator
সমচতুর্ভুজ	বর্গ ; রম্বস	Square ; Rhombus
সমবাহু	সমবাহু	Equilateral figure
সমলম্ব	যে চতুর্ভুজের উচ্চতাসমূহ সমান ; ট্রাপিজিয়াম	A quadrilateral with equal altitudes ; Trapezium
সমচক্রবাল	বৃত্ত	Circle
সম্পাত	ছেদ বিন্দু	Point of intersection
হৃদয় বা হৃৎ বা হৃদয়রজ্জু	পরিব্যাসার্ধ	Circum-radius.

বিঃ দ্রঃ এ ছাড়াও গ্রন্থমধ্যে আরো বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

॥ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ॥

[কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকের নাম ভুলে যাওয়ায় মার্জনাপ্রার্থী ।]

1. অথর্ব বেদ—বিজন বিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮
2. অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলকাতা।
3. অলবেরুনী—প্রেমময় দাশগুপ্ত, ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
4. আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব—আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, বাংলাদেশ।
5. আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (১ম+২য়)—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
6. ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম+২য়)—রমেশচন্দ্র দত্ত।
7. ঋগ্বেদ—পরিতোষ ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
8. ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র—বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ।
9. কুমারসম্ভবম্—বসুমতী প্রকাশন, কলকাতা।
10. কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (১ম+২য়)—রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা।
11. গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস—কাজী মোতাহার হোসেন, বাংলাদেশ।
12. গণিতের কথা ও কাহিনী—নন্দলাল মাইতি, আলফা-বিটা প্রা. লি., কলকাতা।
13. গণিতের ললিত পাঠ—নন্দলাল মাইতি, প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা।
14. প্রাগৈতিহাসিক মহেন্-জো-দড়ো—কুঞ্জবিহারী গোস্বামী, ক. বি.।
15. প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা—প্রদীপকুমার মজুমদার, গ্রন্থমেলা, কলকাতা।
16. প্রাচীন ভারতে গণিতচিন্তা—রমাতোষ সরকার, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা।
17. প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা—রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিশ্বভারতী।
18. প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান—অরুণরতন ভট্টাচার্য, ক. বি.।
19. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।
20. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।

21. পৃথিবীর ইতিহাস (১-৮)—দুর্গাদাস লাহিড়ী।
22. পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা।
23. পুরাণ ও বিজ্ঞান—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।
24. বঙ্গ প্রসঙ্গ—সুশীল রায়, কলকাতা।
25. বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়, লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা।
26. বাংলার ইতিহাস (১ম+২য়)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা।
27. বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম)—রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স।
28. বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক. বি.।
29. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম+২য়+৩য়)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
30. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন।
31. বীজগণিতম্—রাধাবল্লভ দেবশর্মা।
32. বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম+২য়)—সমরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুর।
33. বেদ ও বিজ্ঞান—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।
34. ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক. বি.।
35. ভাষা গণিত—সাধন দাশগুপ্ত, প্রত্যয় প্রকাশ, হাওড়া।
36. মৌর্য যুগের ভারতীয় সমাজ—নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক. বি.।
37. যজুর্বেদ—বিজনবিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
38. সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ (১ম+২য়)—দুর্গাশঙ্কর।
39. সামবেদ—পরিতোষ ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
40. সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—রাধাবল্লভ দেবশর্মা।
41. সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী।
42. লীলাবতী—রাধাবল্লভ দেবশর্মা।
43. কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি—নীহাররঞ্জন রায়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

॥ বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ॥

1. জ্ঞান ও বিজ্ঞান (জুন—1975)—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।
2. ধাঁধা—কলকাতা।
3. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা :

ডঃ বি. বি. দত্ত :

(a) শব্দ-সংখ্যা প্রণালী—35তম বর্ষ, 1ম সংখ্যা।
(b) অক্ষর-সংখ্যা প্রণালী—36তম বর্ষ।
(c) জ্যামিতিশাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুর নাম ও তাহার প্রসার—37তম বর্ষ।
(d) নাম সংখ্যা—37-তম বর্ষ।
(e) জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা—37-তম বর্ষ।
(f) অঙ্কণাং বামতো গতিঃ—37-তম বর্ষ।
(g) মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা—41-তম বর্ষ।
(h) মহাভারতে স্থানীয় মান তত্ত্ব—43-তম বর্ষ।
(i) বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স—44-তম বর্ষ।
(j) দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন কাল—46-তম বর্ষ।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি :

(a) আঙ্কিক শব্দ—36-তম বর্ষ।

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় :

(a) স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবন কাল —43-তম বর্ষ।

অনামাঙ্কিত লেখক :

(a) অঙ্ক ভাবনা—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

পর্ষদ বার্তা : নন্দলাল মাইতি

(i) সেপ্টেম্বর সংখ্যা, 1979
(ii) মার্চ সংখ্যা, 1981
(iii) এপ্রিল সংখ্যা, 1981

॥ সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ ॥

1. Aryabhaṭīya of Āryabhaṭa—Critically edited with introduction, notes, comments and translation by

K. S. Shukla and K. V. Sarma ; Indian Science Academy, New Delhi, 1976.

2. Āryabhaṭa—Indian Mathematician and Astronomer —K. S. Shukla.

3. Āpastamba-Śulba-Sūtra—Edited and translated by Satya Prakash and R. S. Sharma, New Delhi, 1968.

4. Artha Śāstra of Kautilya—Edited and translated by R. Shamasastry, Mysore, 1951.

5. A Concise History of Mathematics—Florian Cajori, 1893.

6. A Concise History of Science in India—Bose, Sen & Subbarayappa ; INSA, New Delhi, 1971.

7. A Historical View of Hindu Astronomy—J. Bently.

8. Bakhshāli Manuscript—Edited by Kaye, Archaeological Survey of India, New Imperial Series, No. 43, pts. I and II, Calcutta ; pt III, Delhi, 1933.

9. Baudhāyana-Śulba-Sūtra—With Thibaut's Tr, ed. by Satya Prakash and R. S. Sharma, New Delhi, 1968.

10. (Tr. of Bījgaṇita) : Algebra with Arithmetic and Mensuration Translated from the Sanskrit of Brahmagupta and Bhāscara, by H. T. Colebrooke, 1872

11. Bijganitavatamsat—K. S. Shukla, Akhil Bharatiya Sanskrit Parishad, Lucknow.

12. A Concise History of Mathematics—D. J. Struik, Dover Publications, N. Y., 1967

13. An Advanced History of India—Mazumder, Roychowdhuri & Dutta.

14. Cambridge History of India. ed. by E. J. Rapson

15. Cultural Heritage of India—Ramakrishna Mission.

16. Geometry in Ancient and Mediaval India—T. A. Saraswati, Motilal Banarsidass, New Delhi, 1979

17. Golasara of Nilkanta—Ed. K. V. Sharma, Vishvesvarananda Institute, Hoshiarpur, 1970

18. Grahanamandan of Paramesvara—Ed. K. V. Sharma, V. V. Institute, 1965

19. History of Hindu Mathematics—B. B. Dutta & A. N. Singh, Asia Publishing House, Bombay.

20. History of Kerala Astronomy—K. V. Sharma, V. V. Institute, 1972

21. History of Ancient Indian Mathematics—C. N. Srinivasienger, World Press, Calcutta, 1967

22. History of Mathematics (vol. I+II). D. E. Smith, Dover, N. Y., 1958

23. History and Culture of Indian People (vol-I), R. C. Mazumder, C. U.

24. Indian Philosophy (vol. I)—S. Radhakrishnan, London.

25. Indian Culture (Kamala Lecture)—Hirendranath Datta, C. U.

26. Islamic Science—S. H. Nasr, World of Islamic Festival Publishing Company, 1976

27. Khandakhadyaka—Ed. by P. C. Sengupta, C. U., 1941

28. Mahābhāskarīya of Bhāskara I—Ed. by K. S. Shukla, L. U.

29. Mathematics in Western Culture—M. Kline, Penguine.

30. Mathematics from Ancient to Modern Times—M. Kline, Oxford, N. Y.

31. Mathematics and Imagination—Kasner and Newman, G. Bell & sons, London, 1950

32. Men of Mathematics—E. T. Bell, Simon & Schauster, N. Y., 1965
33. Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India—Sylvain Levis, Jean Przyluski V Joles Bloch, translated by P. C. Bagchi, C. U., 1959
34. Patiganita of Sridhara—Ed. by K. S. Shukla, L. U., 1959
35. Rasigolasphutaniti of Acyuta—ed. by K. V. Sharma.
36. Surya Siddhanta—Burgess, translated by P.L. Ganguli, C. U.
37. Siddhantadarpana of Nilkanta—ed. by K. V. Sharma.
38. Siddhanta Sekhara of Sripati—ed. by Babua Misra, C. U.
39. Studies in Antiquities—H. C. Roychowdhuri, C. U.
40. Science and Scientists of Ancient India—O. P. Jaggi, Atmaram & Sons, New Delhi.
41. The Origin of Bengali Script—R. D. Banerji, Nababharat Prakashan, Calcutta.
42. The Indus Civilization—M. Wheeler, London.
43. The Science of Sulba—B. B. Datta, C. U.
44. The Astronomical observatories of Jai Singh—G. R. Kaye, Archaeological Survey of India.
45. Thoughts on the nature of Mathematics—J. N. Kapoor, Atmaram & Sons, New Delhi.
46. Vedic Culture—Mahadevananda Giri, C. U.
47. Vedanga Jautisha—R. Shamshastry

ARTICLES IN JOURNALS

1. A. K. Bag:
   (a) Al-Bīrūnī on Indian Arithmetic, IJHS, Vol-10, 1973

(b) The method of Integral Solution of Indeterminate equations of the type $By = Ax \pm c$ in ancient and medieval India—IJHS, Vol—12, 1977

2. B. B. Datta :

(a) The present mode of expressing numbers—IHQ (III), 1927.

(b) The Scope and development of the Hindu Maths—IHQ, 1929.

(c) Elder Āryabhaṭa's methods rule for the solution of indeterminate equation of the first degree—Bull, Cal. Math. Soc., Vol—24, 1932

(d) Testimony of early Arab writers on the origin of our numerals—BCMS, Vol—24, 1932

(e) The Hindu method of testing Arithmetical operation—JASB, Vol—23, 1927

(f) Hindu value of π—JASB, Vol—22

(g) The Jain School Mathematics—BCMS, Vol—21, 1929

(h) The Bakhshali Mathematics—BCMS, Vol—21

(i) The Hindu solution of the general Pellian equation —BCMS, Vol—19, 1928

(j) Early History of the Arithmetic of Zero and Infinity in India—BCMS, Vol—18.

(k) Two Āryabhaṭas of Albiruni—BCMS, Vol—17, 1926

(l) The Algebra of Nāsāyaṇa—The Jain Atiquary, Vol—19, 1933.

3. B. S. Jain :

On the Ganitasāra Saṁgraha of Mahavira (C. 850 AD) IJHS, Vol—12, 1977

4. B. S. Jain & Ram Behari.

Some Mathematical Contribution of ancient Indian mathematicians as given in the works of Bhāskarācarya—IJHS, Vol—12, 1977.

G. Chakraborty :

(i) On the Hindu treatment of Fractions—JDL, Vol—24, 1934

(ii) Surd in Hindu Mathematics—JDL, Vol—24, 1934

(iii) Growth and development of progressive series in India, JDL, Vol—24, 1934

(iv) The Hindu terms of area—JDL, Vol—24, 1934.

5. G. R. Kaye :

(i) Reference of Indian mathematics in certain Medieval works—JPAS, 1911

(ii) The Bakshali Manscript—JPAS, vol-8, 1912

6. S. K. Ganguli :

(i) Was Aryabhata indebted to the Greeks for his alphabetic system of expressing numbers ? BCMS, Vol—17

(ii) The Source of the Indian solution of the so called Pellian equation—BCMS, Vol—19, 1928

(iii) Did the Babylonians and Mayas of Central Americans posses place value arithmetic notation ? BCMS, Vol—22

7. N. K. Mazumder :

(i) Manava Sulba Sutram—JDL, Vol—8, 1922

(ii) Aryabhata's Rule in relation to Indeterminate equation of the first degree—BCMS, Vol—3, 1911-12

8. S. R. Das :

(i) The origin and development of numerals—IHQ (iii) 1927

9. P. K. Mazumdar :

(i) Ganita Kaumudi and the Continued Fraction—IJHS, Vol—13, 1978

10. N. B. Misra :

(i) Remarks on Kaye's article, Modern Review.

11. R. N. Mukherjee :

(i) Background to the discovery of the symbol for zero—IJHS, Vol—12, 1977

12. P. C. Sengupta :

(i) Aryabhata's lost work—BCMS, Vol—22, 1930

(ii) The Aryabhatiyam—Translation, JDL, Vol—16, 1927

বিঃ দ্রঃ এ ছাড়া আরো বহু প্রবন্ধের সহায়তা গ্রহণে ঋণ স্বীকার করি যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। এজন্য সুধীমণ্ডলীর মার্জনাপ্রার্থী।

নির্ঘণ্ট

॥ খ ॥

॥ গ ॥

॥ ঘ ॥

॥ চ ॥

॥ য ॥

॥ র ॥

॥ ল ॥

॥ শ ॥